সাহিত্য-কল্পদ্রুম।

মাসিক পত্র ও সমালোচন

তৃতীয় বর্ষ—১২৯৯ সাল

সাহিত্য-কল্পদ্রুম কার্য্যালয় হইতে

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রকাশিত

কলিকাতা

২ নং হরিমোহন বসুর লেন, "নূতন কলিকাতা যন্ত্রে"

শ্রীপরমসুখ আঢ্যদ্বারা মুদ্রিত

১২৯৯ সাল

VOLUME MISSING #2

সূচী।

বিষয়		লেখক		পৃষ্ঠা
অতীতের আমি (পদ্য)	...	শ্রীপ্রকাশচন্দ্র ঘোষ	...	১২৬
আচারের আবশ্যকতা কি ?	...	পণ্ডিত শ্রীতেজশ্চন্দ্র বিদ্যানন্দ		৫০
ইংরাজী মনোবিজ্ঞান ও ন্যায়শাস্ত্রের সারসঙ্কলন		শ্রীশরচ্চন্দ্র রায় চৌধুরী বি, এ, বি, এল্		১৬৯, ২২৮, ২৪৩
উন্নতি না অবনতি ?	...	শ্রীসুরনাথ চক্রবর্ত্তী	...	১৭১
উপদেশ (পদ্য)	...	শ্রীগুরুদাস শর্ম্মা	...	২৪৯
ওথেলো (সেক্সপীয়ারের গল্প)	...	শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য	...	৫৮
কবি কালিদাস (বিশ্বকোষহইতে)	...	শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু, (বিশ্বকোষ-সম্পাদক)	...	৪২
কবি টেনিসন (পদ্য)	...	শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি		১৬২
কাশিকাবৃত্তি (বিশ্বকোষহইতে)	...	শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু,	...	১২৭
৺কাশীপ্রসাদ ঘোষ (বিশ্বকোষহইতে)		[সম্পাদক]	...	১২৯
কি করে (পদ্য)	...	শ্রীযশোদাকুমার মজুমদার	...	২৪২
কেন সই ? (পদ্য)		শ্রীসুরনাথ চক্রবর্ত্তী	...	৮২
গঙ্গোত্তরী ও গোমুখী	...	[সম্পাদক]	...	২২
চার্ল্‌স্‌লেনি (জীবনী)	...	শ্রীরাখালচন্দ্র মিত্র	...	৫৫
জ্যোতিষ-শাস্ত্রের স্থূল কথা	...	পণ্ডিত শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী সিদ্ধান্ত বাচস্পতি	...	১২
ঢেউ (পদ্য)	...	শ্রীপ্রকাশচন্দ্র ঘোষ	...	২৪৯
তপস্যা ও তাহার পরিণাম	...	শ্রীচন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	...	৭০
তর্পণ	...	[সম্পাদক]	...	৭৩
তবু তারে চাই (পদ্য)	...	শ্রীসুরনাথ চক্রবর্ত্তী	...	১৭৭
তুলনার সমালোচনা	...	শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু	...	২০৬, ২১৭
দুটী কথা	...	[সম্পাদক]	...	১
পরাশর সংহিতা	...	[সম্পাদককর্ত্তৃক অনুবাদিত] স্বতন্ত্র শাস্ত্র	...	১
পুরোহিত	...	শ্রীদুর্গাচরণ সান্দকী	...	২২৩
প্রতিমা গুঠন (পদ্য)	...	শ্রীসুরেশচন্দ্র রায় বি, এ,	...	২১
প্রহেলিকা	...	শ্রীকালীচরণ মিত্র	...	২৪৫
বর্ষ-আবাহন (পদ্য)	...	শ্রীপ্রকাশচন্দ্র ঘোষ	...	৪
বর্ষা-বিদায় (পদ্য)	...	শ্রীপ্রকাশচন্দ্র ঘোষ	...	৩
বসন্তে (পদ্য)	...	শ্রীপ্রকাশচন্দ্র ঘোষ	...	২৪৮

বিষয়		লেখক		পৃষ্ঠা
বাঙ্গালা বর্ণমালা ও বানান সংস্কার	...	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ এম্. এন্, পি, এস্ (লণ্ডন) ও ফনোগ্রাফীর অধ্যাপক কলিকাতা	...	১০৫
বাঁশরী (পদ্য)		শ্রীপ্রকাশচন্দ্র ঘোষ	...	১৭১
বাঁশীর গান (পদ্য)	...	শ্রীপ্রকাশচন্দ্র ঘোষ	...	১৩৮
বিদ্যাসাগরের জীবনী ও শ্রীযুক্ত বিহারিলাল সরকার		শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু	...	২৪১
বিক্রমোর্ব্বশী (সমালোচনা)	...	শ্রীঅক্ষয়কুমার ঠাকুর এম্, এ		৩, ১৫৪
বিশুখুড়ো	...	[সম্পাদক]	...	৩০
বিষাদ সঙ্গীত (পদ্য)	...	* * *	...	২৯
ভাবনা (পদ্য)	...	শ্রীপ্রকাশচন্দ্র ঘোষ	...	৪০
ভাষা-সংস্কারের ধুয়া	...	শ্রীললিতকৃষ্ণ বসু(সমর্থকোষ-সম্পাদক)		১৯২
মনের প্রতি (পদ্য)	...	শ্রীপ্রকাশচন্দ্র ঘোষ	...	১১৫
মানুষ ও সমাজ	...	শ্রীকালীচরণ মিত্র	...	১৩৯
মোহিনী (পদ্য)	...	[সম্পাদক]	...	১১৬
রম্য সরোবর (পদ্য)	...	শ্রীবরদাকান্ত ঘোষ	...	২৪২
রাজা ভর্ত্তৃহরি	...	শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	...	৪০
রামকৃষ্ণ পরমহংস অবতার কি না	...	শ্রীরামচন্দ্র দত্ত	...	২৩০
রোমিওজুলিয়েট (সেক্সপীয়ারের গল্প)		শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য	...	৯৫
শুধু (পদ্য)	...	শ্রীসুরনাথ চক্রবর্ত্তী	...	১৯৩
সদাশিবরাও	...	শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	...	৯, ১২১
সংক্ষিপ্ত সমালোচনা	...	* * *	...	১৯৩
সন্ধ্যা (পদ্য)	...	শ্রীপ্রকাশচন্দ্র ঘোষ	...	১২
সমালোচনা	...	* * *	...	২৫০
সুধা ও রূপ (পদ্য)	...	শ্রীললিতকৃষ্ণ বসু (সমর্থকোষ সম্পাদক)		২১৬
সুলভ ব্রহ্মজ্ঞান	...	শ্রীনীলমণি মুখোপাধ্যায়	...	১৯৫
হরিদাস	...	[সম্পাদক]	...	১৭৮
হরিদাস স্বামী	...	শ্রীকালীচরণ মিত্র	...	৭৮
হাকিম সাহেব	...	শ্রীকালীচরণ মিত্র	...	৮৪
হাতিঘোড়া (পদ্য)	...	শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়		১৬৪

সাহিত্যকল্পদ্রুম।

মাসিক পত্র ও সমালোচন

তৃতীয় বর্ষ—১২৯৯ সাল

ত্রুটি-কথা।

একটা প্রথা হইয়া গিয়াছে যে, বৎসর পূর্ণ হইলেই সূচনা, ভূমিকা, মুখবন্ধ, অবতরণিকা বা ঐ হিসাবে একটা কিছু লিখিতে হয়। গতবর্ষ-সমালোচনা বা নববর্ষ-আবাহন লইয়া, সম্পাদকেরা কিছু-না-কিছু লিখিতে যেন বাধ্য! আজ আমাদেরও সেইরূপ একটা কিছু-না-কিছু বলিবার সময় আসিয়াছে; কিন্তু আমরা সে সম্বন্ধে কিছু বলিব না; কারণ, গতবর্ষ—যাহা গিয়াছে; তাহা গিয়াছে, তাহার আলোচনায় আর ফল কি? জমা-খরচ-বাকী মিলাইয়া দেখিলে, একটু ফল হয় বটে; কিন্তু যখন বাকীটা চক্ষুর সম্মুখে জাজ্বল্যমান রহিয়াছে, তখন আর পুরাণ খাতা উল্টাইয়া ফল কি? নববর্ষ—যাহা সবে আজ আসিল, তাহার সম্বন্ধে কল্পনায় একটা কিম্ভূত-কিমাকার ধারণা করায় ফল কি? ভবিষ্যতে কি উপায়ে কার্য্য করিলে, সিদ্ধ হইবার আশা থাকে; সে সম্বন্ধে একটু পূর্ব্ব হইতে বিবেচনা করায়, কিছু ফল আছে বটে, কিন্তু যখন জানি, "নিয়তি কেন বাধ্যতে", তখন, এখন হইতে সে বিষয়ে বৃথা মাথা ঘামাইবার আবশ্যক দেখি না।

নিয়তির কথায় দুটী কথা বলা আবশ্যক। পুরুষকার বা চেষ্টা আর নিয়তি—দুইটিই বিধিসৃষ্ট অপূর্ব্ব বিধি। একটি অপরটীর প্রতিষেধক। নিয়তিতে আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্ত সমস্ত জগৎ আবদ্ধ আর চেষ্টায় সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড উন্মত্ত। নিয়তির বিধানে যে ফল ফলে, তাহা চক্ষুর অগোচর,—বুদ্ধির অগম্য, চেষ্টার ফল সহজেই দেখা যায়, সহজেই বুঝা যায়; তাই মানুষে অতি দৃঢ়তার সহিত চেষ্টার উপর নির্ভর করিয়া থাকে। চেষ্টায় নির্ভর করিলে, নিয়তি বা নিয়তির পশ্চাতে নিয়ন্তাকে দেখা যায় না; কাজেই নির্ভরকারীদিগের মনে আত্মকৃত বিবেচনার প্রাধান্য ও অভ্রান্ততা উপলব্ধি হয়, আর কর্ম্মের অসিদ্ধিতে বা অভিপ্রেতের বিরুদ্ধ ফলে, তাহাদের মনে নির্ব্বেদ, বিরাগ, শোক ইত্যাদি জন্মে। চেষ্টায় যদি ফল হইত, যদি নিয়তি বলিয়া কিছু না থাকিত, তাহা হইলে বোধ হয়, বিশ্বসংসারে কোন অভাব থাকিত না। মানুষ প্রতি কর্ম্মে চেষ্টা করে, আর প্রতিপদে অসিদ্ধি দেখিতে পায়, ত্রুটি বুঝিতে পারে, তবুও চেষ্টার উপর নির্ভরতা

ছাড়িতে পারে না। যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ—বলিয়া সকলেই যত্নের বা চেষ্টার অক্ষমতা স্বীকার করে, তবু যে অক্ষমতার কারণ অনুসন্ধান করিতে চায় না। নিয়তির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বতন্ত্র প্রমাণ আবশ্যক করে না, প্রতিপদে অসিদ্ধি, ত্রুটী, পদস্খলনই তাহার প্রমাণ। চেষ্টা-বাদীরা এইগুলির কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া বলেন—অমনযোগীতা ও অদূরদর্শীতা। তাঁহারা আরও বলেন, চেষ্টা করিলে এ দুটী দোষও পরিহার করা যাইতে পারে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোথাও তাহা দেখা যায় নাই। নেপোলিয়ন বোনাপার্টি—যিনি স্বীয় অভিধান হইতে "অসম্ভব" "অসাধ্য" প্রভৃতি কথাগুলি উঠাইয়া দিতে চাহিয়াছিলেন, তাঁহারও ভ্রম ঘটিয়াছিল; তাই ভিক্টর হুগো "লে মিজারেব্‌লে"নামক গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন—"The St.Helena was written in the Book of Destiny."কেহ কেহ নিয়তিতে দোষ দিবার জন্য বলেন,নিয়তি ধেয়াইয়া,হাত দুটি কোলে করিয়া বসিয়া থাকিলে, সম্মুখস্থ অন্ন ব্যঞ্জন মুখে উঠিবে না কি?—এস্থলে তাঁহারা বিবেচনা করেন না যে, যদি নিয়তিতে কোন দিন "বাড়া ভাতে ছাই"পড়িবার কথা থাকে,তবে (দুই হাত দূরে থাক!) চারি হাত দিয়া চেষ্টা করিলেও, সে ভাত মুখে তুলিতে বা মুখের ভাত গলাধঃকরণ ক'রতে পারিবে না, আবার যদি শুষ্ক পর্য্যুসিত অন্নভোজনই অদৃষ্টে থাকে,তবে সহস্র চেষ্টা করিয়াও হাত কোলে করিয়া বসিয়া থাকা দুঃসাধ্য হইবে, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, চেষ্টা করিয়া সেই অন্নই খাইতে হইবে। ফল কথা নিয়তির বাহিরে কিছু নাই। লোকে চেষ্টা করে নিয়তির বশে, অসিদ্ধও হয় নিয়তির বশে,আবার নিয়তির বশেই অলস হইয়া বসিয়া থাকে। নিয়তির বশেই লোকে "আমি করিবই" বলিয়া অহঙ্কার করে,'চেষ্টায় কি না হয়'বলিয়া ভরসায় বুক বাঁধে,আর তাহারই বশে শেষে অসিদ্ধ হইয়া শোকে অভিভূত হয়। নিয়তি আছে বলিয়া বিশ্বাস করিলেই যে, হাতকোলে করিয়া বসিয়া থাকিতে পাইবে, আর সব কাজ আপন হইতে হইয়া যাইবে, তাহা নহে;—নিয়তিবশেই বৃথা চেষ্টায় মোহিত হইতে হইবে, নিয়তির বশেই সুখদুঃখ, শোকহর্ষ, পাপপুণ্য ভুগিতে হইবে। ঈশ্বর-পরায়ণের সুমতি ও নরহন্তার কুমতি এই উভয়ই নিয়তি-সাপেক্ষ, বিধি নিয়োজিত।

কথায় কথায় অনেক বাহিরে গিয়া পড়িতে হইয়াছে। ফলকথা, নিয়তি যদি না থাকিত, তাহা হইলে বঙ্গদর্শন, আর্য্যদর্শন, নবজীবন, প্রচার উঠিত না। সম্ভবতঃ এগুলির গ্রাহকাভাব, সহানুভূতির অভাব, অর্থাভাব ঘটে নাই, অথচ এরূপ অচিন্তনীয় ঘটনার সমাবেশ হইল যে, না উঠিয়া থাকিতে পারিল না। লেখকের অভাব উহাদের কোন দিন ঘটে নাই, ঘটিতও না। নিয়তির বশেই, ভারতী পূর্ব্ব গৌরব হারাইয়াছে; প্রাচীন লেখকেরা প্রায় আর কেহ ইহাতে লিখিতেছেন না। আর নিয়তির বশেই আমাদের "সাহিত্য-কল্পদ্রুমের" অঙ্কুরটী জীবন-মাত্রাবশিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। সাহিত্য-কল্পদ্রুম যখন দ্বিতীয় বৎসরে পদার্পণ করে, তখন সাধারণের সহানুভূতি পাইবার জন্য ভগবানের জয়দ নাম স্মরণ-পূর্ব্বক মনুসংহিতা উপহার লইয়া সাধারণে উপস্থিত হইল; কিন্তু কেহ ফিরিয়া চাহিল না; তবে বিঘ্ন-বিনাশনের বিঘ্নহারী নাম লইয়া যাত্রা করিয়াছিল বলিয়া, আজ সকল বিঘ্ন কাটাইয়া প্রাণটা লইয়া দাঁড়াইয়াছে, ইহাই যথেষ্ট! এ সকলের কারণ—নিয়তি ভিন্ন আর কি বলিব? সর্ব্ব-নিয়ন্তা হরির ইচ্ছা ব্যতীত আর কি বলিব?

যাহা হউক, এখন ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় নির্ভর করিয়া, তাঁহার মঙ্গলময় চরণে প্রণিপাত-পূর্ব্বক এ বৎসর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম। "সর্ব্বকার্য্যেষু মাধব"—ভগবানের মাধবনামের মহিমা বৃদ্ধি হউক, এ বৎসর যেন সাহিত্য-কল্পদ্রুম তাঁহার কৃপায় সদুদ্দেশ্য পালন করিতে পারে!—ইহা প্রার্থনামাত্র; কিন্তু ভগবানের মনে যাহা আছে—নিয়তির গর্ভে যাহা আছে, তাহাই ঘটিবে।

বর্ষ-বিদায়

—*—

(১)

কিরণ-মণ্ডল বিস্তারিয়া,
ফুল্লপুষ্ট বপুখানি লয়ে,
চমকিয়া পিকবধূ বনে
অনুমানি নিদাঘের পটে
যেই, বেলা অধীরা সৌরভে
বুঝি ভাবে, আজও বুঝি সেই

নব নিদাঘের উষারাণী,
উল্লাসে হাসিয়া দিল দেখা;
ঝঙ্কারিয়া উঠিল বাখানি,
গত বসন্তের ক্ষীণ রেখা;
ঢ'লে পড়ে আলিঙ্গন-আশে,—
বসন্ত-সমীর ছুটে আসে!

গরবেতে উষারাণী চায়
জগত-সম্মুখে ধরে তুলি
পলকে পুলকে ভরে ধরা
দেখে না, কে কেঁদে চলে যায়—
জীর্ণ শীর্ণ কলেবর তার,
দীর্ঘশ্বাস শুনিতে কি পাও,
একদিন সেও এসেছিল,
কত গর্ব্ব, কি যে হাসি লয়ে;—

বিকশিয়া দেহ আপনার,
নব বরষের ছবিখানি;
বিস্ময়ে চাহিয়া রহে প্রাণী;—
দূরে কেবা খুঁজিছে আঁধার?
আনত বিষণ্ণ মুখখানি।
দেখ কি, সে দেখে কতবার?
কত আশা জাগায়ে না জানি,
আজ আর কিছু নাই তার!

(২)

আজ আর কিছু নাই তার—
কাঁদিয়া যে ফিরে চলে যায়,
ফুটিয়া উঠিলে ফুলবালা,
আজ যদি ঝরিয়া সে পড়ে,
এই যদি জগতের রীতি,
আঁধারে মিলাও, শোকছবি,

তাই তারে এত অবহেলা?
তার পানে চাহিতে কি নাই?
মুগ্ধমনে কত হাসিখেলা;—
কাল তারে পায়ে দলে যাই?
কেহ কারো মুখ নাহি চায়,
গতবর্ষ, বিদায়—বিদায়!

যাও তুমি নিয়ে যাও সাথে
সুখ-দুখ-বিজড়িত ছায়া,
নূতন জীবন আজি চাই,
কাঁদিয়াছি, আর সাধ নাই,—
অনন্ত বিস্মৃতি-সিন্ধু-নীরে
অতীতের ব্যথা যেন আর
জগতেরে অরি মানি মনে
হোত আজি, নূতন জীবনে,

অতীতের স্বপ্ন সুমধুর,
আশা-নিরাশার মোহমেলা!
আজি এই প্রভাতের বেলা;—
ভুলিয়াছি, ভুল হবে দূর!
কর সাঙ্গ নিজ লীলাখেলা;—
না জ্বালায় নিবান' অনল,
জগতের প্রতি অবহেলা
সুখ-শান্তি-জলে সুশীতল!

বর্ষ-আবাহন

—*—

আর তুমি, তুমি হে নূতন,
সযতনে আজিকার দিনে
সুখে হোক দুখে হোক রবে
ভুলেও খুঁজিতে চাহি যদি,
তোমার শাসন-পাশে যেন
উপহাস-অনল বর্ষণে

এস সখা হৃদয়ে আমার!
বেঁধে দিই জীবনে জীবন,
অটুট এ নিয়তি-বন্ধন ;—
অভিমানে ফেলি অশ্রুধার,
হয়, কর-চুরণ অবশ,
করো শুষ্ক নয়ন সরস !

পূরবেতে মেঘের আড়ালে
ম্লানমুখে সম্ভাষণ তার
ঊষার দেবতা মৃদু হাসি—
অতি ধীরে প্রসারিত কর
কে জানে কেমন হাসি তার—
কে জানে, সে প্রসারিত করে
হাসিমুখে ডাক গো নূতনে,—
দেবদান লও শিরঃ পাতি,

নূতনের ছবি মোহকরী,
সাজে কি, সাজে কি আজি আর ?
কে জানে কেমন হাসি তার—
ধরিল ধরণী শিরোপরি।
স্নেহ কি সে বিদ্রূপ বিকার ?
আশীর্ব্বাদ কিম্বা অভিশাপ !
নূতন সে নাহি দোষ আর ;
হয় সে হউক শোকতাপ !

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র ঘোষ

বিক্রমোর্ব্বশী

—*—

বিক্রমোর্ব্বশী কালিদাসের একখানি উৎকৃষ্ট নাটক। আলঙ্কারিকেরা এই নাটককে ত্রোটক পর্য্যায়ে ফেলিয়াছেন। ত্রোটকের বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে অমানুষ নায়ক নায়িকা অবলম্বন করিয়া আখ্যায়িকা লেখা হইয়া থাকে। বিক্রমোর্ব্বশীতে নায়িকা উর্ব্বশী অপ্সরোজাতীয়া, চিত্ররথ গন্ধর্ব্ব, মনুষ্য নহেন ; এই নিমিত্ত বিক্রমোর্ব্বশী ত্রোটকপদবাচ্য। কবি চন্দ্রবংশীয় রাজা পুরুরবার পৌরাণিক ইতিবৃত্ত অবলম্বন করিয়া গ্রন্থ লিখিয়াছেন ; কিন্তু স্বীয় কবিত্ব শক্তি ও রচনাবৈচিত্র্যগুণে পুরাণে লিখিত ঘটনাগুলির আপন সুবিধানুসারে সংযোগ মিলন সংঘটন করিয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থাংশের ষষ্ঠ অধ্যায়ে রাজা পুরুরবার আখ্যায়িকা বর্ণিত হইয়াছে। তথায় দেখা যায় যে, উর্ব্বশী ভগবান্ মিত্রাবরুণের শাপে পড়িয়া, মানুষী হইয়া, ধরালোকে অবতরণ করেন। রাজা পুরুরবা সেই সময়ে দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে পুণ্যভূমি গঙ্গাযমুনার সঙ্গমস্থল প্রয়াগধামের অনতিদূরে প্রতিষ্ঠান নামক নগরে রাজত্ব করিতেছিলেন। রাজা যেমন অমিতৌজাঃ, তেমনি দেহলক্ষ্মীসম্পন্ন। উর্ব্বশী মানুষী হইলেও স্বজাতিধর্ম্ম বিস্মৃত হয়েন নাই। কবিগণ চিরকালই অপ্সরোজাতীয়া নারীদিগকে সুরূপপ্রিয়া বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। রাজা রূপবান্ তাই উর্ব্বশী তাঁহাকে দেখিয়া মুগ্ধা হইয়া, তাঁহার প্রেমে

পড়েন। পাঠকগণ এরূপ প্রেমকে যথার্থ প্রেম মনে না করিতে পারেন ; কিন্তু সকল দেশের কবিই এই প্রকার প্রেম বর্ণনা করিতে ভাল বাসেন। সেক্ষপীয়রের Fairyগণ এরূপ প্রেমের প্রেমিক। যাহাহউক, রাজা পুরুরবাও উর্ব্বশীর প্রেমে পড়েন। উভয়ের মহাসুখে দিনাতিপাত হইতে লাগিল। উর্ব্বশী একবারে স্বর্গভবনের সমস্ত সুখাভিলাষ ত্যাগ করিয়া, মানুষীর ন্যায় রাজার সহিত বাস করিতে লাগিলেন ; কিন্তু সুখ চিরকালের নহে। এদিকে উর্ব্বশীবিহনে স্বর্গরাজ্য শূন্যপ্রায় হইয়াছিল। ইন্দ্রের সভায় উর্ব্বশীর প্রয়োজন প্রায়ই হইত। উর্ব্বশী স্বর্গের রমণীরত্ন ; কবে কোন মহাপুরুষ তপস্যায় নিযুক্ত আছেন—ইন্দ্র ভয়ে অস্থির, পাছে তপোবলে তাঁহার ইন্দ্রত্ব ঘুচাইয়া দেয়—সেস্থলে উর্ব্বশীর প্রয়োজন ; স্বীয় রূপমাধুরী প্রভাবে তপস্যা ভঙ্গ করা তাহার কর্ম্ম ; সেই জন্য স্বর্লোকে উর্ব্বশীর অভাব বড়ই অনুভূত হইতে লাগিল। দেবরাজের আদেশে গন্ধর্ব্ব বিশ্বাবসু উর্ব্বশীকে স্বর্গে প্রত্যানয়ন করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। উর্ব্বশী রাজাকে তিনটী প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ করিয়াছিলেন। একটীর ব্যত্যয় হইলে, তিনি রাজাকে ত্যাগ করিয়া স্বর্গলোকে গমন করিবেন, এরূপ বন্দোবস্ত ছিল। তাহার প্রথমটি এই যে, উর্ব্বশীর মেষশাবকের একতর অপহৃত হইলে, তিনি আর রাজার নিকট অবস্থান করিবেন না। অপরটী এই যে, তিনি কখন রাজাকে অসংযতাবস্থায় দেখিবেন না। তৃতীয়টী এই যে, তিনি ঘৃত ব্যতীত আর কিছুই আহার করিবেন না। গন্ধর্ব্ব বিশ্বাবসু এই সকল জানিতেন এবং এক দিবস রজনীযোগে রাজার কক্ষে প্রবেশ করিবার ছলে, একটী মেষশাবককে অপহরণ করিয়া, বিমানমার্গে চলিয়া গেলেন। তাহার সকরুণ আর্ত্তনাদ শ্রবণে উর্ব্বশীর নিদ্রাভঙ্গ হয়। উর্ব্বশী তখনই রাজাকে মেষাপহারককে সমুচিত শাস্তি দিতে বলেন। ইত্যবসরে দ্বিতীয় মেষশাবকও অপহৃত হইল। তখন রাজা অসংযতাবস্থ থাকিয়াও অপরাধী গন্ধর্ব্বের পশ্চাৎ পশ্চাৎ কৃপাণপাণি ধাবমান হইলেন। সময় বুঝিয়া গন্ধর্ব্ব স্বপ্রভাবে বিদ্যুৎ সৃজন করিল, রাজাও উর্ব্বশীর নয়নগোচর হইলেন। প্রতিজ্ঞাভঙ্গ হইল বলিয়া, উর্ব্বশী রাজভবন পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। এদিকে রাজা ফিরিয়া আসিয়া, উর্ব্বশীকে দেখিতে পাইলেন না। ধরাধাম তাঁহার পক্ষে ঘোর অন্ধতমসে আবৃত হইল। তিনি রাজ্যত্যাগ করিয়া ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া, ইতঃস্ততঃ ভ্রমণ করেন, কোথাও উর্ব্বশীর দর্শন লাভ হয় না ; অবশেষে এক দিবস ভ্রমণ করিতে করিতে কুরুক্ষেত্রস্থিত অম্ভোজ সরোবরে উপনীত হন। তথায় সখীজনসমাগতা উর্ব্বশীকে জলক্রীড়ায় নিরত দেখিয়া, অনেক পরিদেবিত বচনে তাঁহাকে সন্তুষ্ট করেন। রাজার উর্ব্বশীপ্রতি প্রেমে গন্ধর্ব্বেরা সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে উর্ব্বশীর সহিত সালোক্যবাসের বরপ্রদান করেন। ইহাই বিষ্ণুপুরাণের আখ্যায়িকা। কবি ইহাকে বিপর্য্যস্ত করিয়া স্বীয় নাটকের উপযোগী করিয়া লইয়াছেন।

প্রথম অঙ্কে রাজা পুরুরবা সূর্য্যোপস্থান হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবার সময়ে, কামিনীর আর্ত্তনাদ শব্দ শ্রবণ করিয়া, তদনুসরণে প্রবৃত্ত হন। যাইয়া উর্ব্বশীর তিনজন সহচরীর মুখে শুনেন যে, তাঁহাদিগের সখী আকাশমার্গে গমনকালে, দস্যুকর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছেন। রাজা তৎক্ষণাৎ দস্যুর পশ্চাদনুসরণে প্রবৃত্ত হন। কবি কল্পনায় বিমানমার্গে তাঁহার রথের গতি অপ্রতিহত ছিল। রাজা দিব্যরথে আরোহণ করিয়া, বিমান পথে দৈত্যানুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। সম্মুখস্থ মেঘরাজি রথবেগে পশ্চাদ্দেশে নিক্ষিপ্ত হইয়া, ধূলির ন্যায় পরিদৃশ্যমান হইতে লাগিল। রথকেতন রথের বেগাতিশয় বশতঃ স্থির ও নিশ্চলভাব ধারণ করিল। এইরূপে কিয়ৎকাল গিয়া, অবশেষে দৈত্যহস্ত হইতে উর্ব্বশী ও তদীয় সখী চিত্রলেখাকে উদ্ধার করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। এদিকে উর্ব্বশীর অপর তিনটী সখী হেমকূট-শিখরে রাজার প্রত্যাবর্ত্তন প্রতীক্ষা করিতেছিল। রম্ভানাম্নী সখী নিতান্তই উতলা হইয়াছিলেন, তাঁহার উর্ব্বশী-প্রেম এত অধিক ও পুনরায় সখী পাইবার

আশা এত অল্প বলিয়া বোধ হইতেছিল যে, তিনি প্রবল পরাক্রম রাজা পুরুরবার ভুজবলেও সন্দিহানা হইয়াছিলেন।

"অবিনাম সো রাঅসো উদ্দরণোহিতঅসল্লং" রম্ভা এই কথা বলিলে, অপর সখী মেনকা বলিলেন "মাদেসং শও ভোদু"—সখি, সে বিষয়ে সংশয় করিও না। রম্ভা উতলা, উর্ব্বশীর শোকে অধীরা; সহজন্যা ও মেনকা ধীরা ও প্রশান্তচিত্তবতী; উর্ব্বশী রমণীরত্ন, তাঁহার কুসুম-পেলবহৃদয় দৈত্য সন্ত্রাসভয়ে কাতর। নারীস্বভাবসুলভ মূর্চ্ছা ক্রমে তাঁহাকে অধিকার করিয়াছে। ভয়ের কারণ ব্যপগত হইলেও সংজ্ঞা হইল না। ক্রমে চিত্রলেখার আশ্বাস বচনে সংজ্ঞালাভ হইল। কালিদাসের উপমাবৈচিত্র্য জগদ্বিখ্যাত। প্রাঞ্জল ও সুখবোধ্য উপমায় বোধ হয়, জগতের অনেক কবি তাঁহার নিকট পরাস্ত হন। উর্ব্বশীর ক্রমে ক্রমে মোহত্যাগ, তিনি সুন্দররূপে উপমার দ্বারা দেখাইয়াছেন;—

'আবির্ভূতে শশিনি তমসা রিচ্যমানেব রাত্রি-
র্নৈশস্যাচ্ছিন্নভুজইব চ্ছিন্নভূয়িষ্ঠ ধূমা।
মোহেনান্তর্বরতনুরিয়ং লক্ষ্যতে মুচ্যমানা
গঙ্গারোধঃ-পতন কলুষা গচ্ছতীব প্রসাদম্॥"

(বিক্রমোর্ব্বশী, প্রথম অঙ্ক)

যেমন সন্ধ্যাকালের ক্রমশঃ ঘনীভূত অন্ধকার কৌমুদীপ্রকাশে অল্পে অল্পে তিরোহিত হয় কিম্বা রজনীকালে প্রজ্জ্বলিত অনলশিখা বিনিঃসৃত ধূমরাশি ক্রমশঃ দিগন্তব্যাপী অন্ধকারে নিলীন হইয়া যায়, অথবা যেমন প্রাবৃট্‌কালে তীরভূমি-পতন-নিবন্ধন কলুষসলিলা গঙ্গা বর্ষাপগমে অল্পে অল্পে প্রসন্ন-সলিলা হইয়া উঠে উর্ব্বশী তখনও সেইরূপ ক্রমে ক্রমে মোহমুক্ত হইয়া স্বস্থ হইলেন।

সংজ্ঞালাভ করিয়াই উর্ব্বশীর নয়ন রাজার রূপে মুগ্ধ হইল। রাজার শোভন বাক্যবিন্যাস শুনিয়া উর্ব্বশীর প্রীতি রাজার উপর আরও বাড়িয়া গেল।

"অমিয়ং কৃখুদে বঅনং।"

অপ্সরোজাতীয়া উর্ব্বশী ও তদীয়া সখী চিত্রলেখার কথোপকথনে, কালিদাস স্বকীয় রসজ্ঞতা (Humour) বেশ ভালরূপ দেখাইয়াছেন। সংস্কৃত সাহিত্যে হাস্য-পরিহাস রস প্রায়ই তত খুলে না। হিন্দুজাতি ভালরূপ হাসিতে জানিত না, যদি হাসিবার সেরূপ ক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলে কাব্য নাটকে তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইত। গভীর ঐশ্বরিক ও দার্শনিক তত্ত্বান্বেষণে এ জাতির অন্তরে হাসি লুকাইয়া গিয়াছিল, কখনও ভালরূপ বিকাশ পায় নাই। তবে যে, কোথায় কদাচিৎ হাস্যরসের যথার্থ বিকাশ দেখা যায়, তাহার কারণ এই যে, পৃথিবী হইতে কেহ হাস্যরসকে একেবারে বিদূরিত করিতে পারিবে না; প্রকৃতির যাহা স্বভাব সিদ্ধ ধর্ম্ম তাহা থাকিবেই থাকিবে। বাহ্য আড়ম্বরে বা আপন স্বেচ্ছানুসারে কেহ প্রকৃতি-ধর্ম্মকে লোপ করিয়া দিতে পারে না। সখী চিত্রলেখা রাজার প্রতি উর্ব্বশীর প্রণয় ভাব বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন; তাই তিনি উর্ব্বশীকে সোলুণ্ঠন বচনে এরূপ বলিয়াছেন। উর্ব্বশী রাজাকে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, চিত্রলেখা বলিল—

"হলা কিং পেক্খসি," সখি কি দেখিতেছ? উর্ব্বশী উত্তর করিল "সমদুঃখ সুহো জীবী অদি লো অণেহিং, সমদুঃখসুখ হইয়া নয়নদ্বারা সতৃষ্ণভাবে দেখিতেছি (বা দেখিতেছে) চিত্রলেখা বলিল,—"অয়ি কো," সখি কে? উর্ব্বশী বলিল "ণং পণইঅণা" কে আবার দেখিতেছে, আমার প্রণয়িজন (সখীগণ বা রাজা) দেখিতেছে বা দেখিতেছি।

ক্রমে বিমানমার্গ হইতে রথ ভূমিতলে অবতরণ করিল। উর্ব্বশী সখিগণের সহিত মিলিতা হইলেন। বসন্ত-লক্ষ্মী সমাগমে উপবনলতা সমূহের যেরূপ শোভা হয়, উর্ব্বশী সমাগমে সখিগণ সেইরূপ শোভা পাইতে লাগিল। ইত্যবসরে চিত্ররথ গন্ধর্ব্ব উর্ব্বশীর অন্বেষণে হেমকূট-শিখরে আগমন করিল। উর্ব্বশী রাজার নিকট বিদায় লইয়া গমন করিলেন। যাইলেন বটে, কিন্তু আপন মন রাজার নিকট রাখিয়া ও রাজার মন আপনি লইয়া চলিয়া গেলেন।

এদিকে রাজা উর্ব্বশী দর্শনাবধি নিতান্ত বিমনাঃ হইয়া পড়িলেন, এ সকলস্থলে সংস্কৃত কবিগণ বিদূষকের অবতারণা করিয়া থাকেন। বিদূষকের ন্যায় বৈচিত্র্যবিহীন ব্যক্তি দুইটী পাওয়া ভার। যতই নাটক দেখা যাউক না কেন, বিদূষকের চরিত্র-বৈচিত্র্য কোথাও পরিলক্ষিত হইবে না। সকল নাটকের বিদূষক এক ব্যক্তি বলিয়া বোধ হয়। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, এ দেশের কবিগণ হাসিতে বা হাসাইতে তত ভাল জানিতেন না, সেই জন্যই ভিন্ন ভিন্ন নাটকে বিদূষক-চরিত্রের বিশেষ বিভিন্নতা পরিদৃষ্ট হয় না; আরও এক কারণ এই যে, এখানকার কবিগণ আবদ্ধ হইয়া চলিতেন। আলঙ্কারিকেরা যেখানে যেটী উপযোগী বলিয়া, সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন, সেখানে সেইটী বসাইতে হইবেই হইবে। এইরূপ দৃঢ় (Rigid), নিয়মে আবদ্ধ থাকায় এতদ্দেশীয় কবিগণের হৃদয়ের ভাব সম্যক্ স্ফূর্ত্তি পায় নাই। আলঙ্কারিকেরা বলিয়াছেন;—

"কুসুমবসন্তাদ্যাবিধঃ কর্ম্মবপুর্বেশভাষাদ্যৈঃ।
হাস্যকরঃ কলহরতির্বিদূষকঃ স্যাৎ স্বকর্ম্মজ্ঞঃ॥"

অর্থাৎ বিদূষক আকার, বেশ ও বাক্যদ্বারা আপনাকে হাস্যজনক করিবে এবং সময়ে সময়ে কলহ করিবে;—তবে আর বিদূষকের অন্য কার্য্য করিবার যো নাই!

বিদূষক ব্রাহ্মণজাতীয়। জাতির গুণে রাজসখা, কিন্তু ব্রহ্মণ্যহীন বলিয়া, সামান্য চেটীগণও তাহাদিগকে গ্রাহ্য করে না। নাগানন্দ নাটকে চতুরা চেটী নবমালিকা, বিদূষককে আপনার পদরেণু শিরোধার্য্য করাইয়াছে। যাহা হউক, বিক্রমোর্ব্বশীর বিদূষকের বেশ রসিকতা আছে। রাজা বিদূষকের নিকট আপনার উর্ব্বশীর প্রেম ব্যক্ত করিয়াছেন ও এই বিষয় তাহাকে গুপ্ত রাখিতে বলিয়াছেন; কিন্তু বিদূষক এ সকল কথা লুকাইয়া রাখিবার লোক নহে। মহিষী ঔশীনরীর পরিচারিকা নিপুণিকা বেশ কৌশলে রাজার উর্ব্বশীপ্রেম বিদূষকের মুখ হইতে আদায় করিয়া লইয়াছে।

রাজা বিদূষকের সহিত সঙ্গত হইয়া, আপনার হৃদয় বেদনা জ্ঞাপন করিলেন। বিদূষক বলিল যে, মহিষী তাঁহার উন্মনাভাব দেখিয়া বড়ই কাতরা হইয়াছেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, তবে কি তুমি রহস্য উদ্ভেদ করিয়া দিয়াছ? বিদূষক অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিল, আমি আবার রহস্য উদ্ভেদ করিব?—এতদূর গোপন রাখিয়াছি যে, আপনার প্রশ্নে বড় উত্তর দিতেছি না।

"ভো এব্বং ম জিব্বা সংজত্তিদা জেন ভবদোবিণত্তি পড়িব অণং।" যাহা হউক রাজা বিদূষককে জিজ্ঞাসা করিলেন "অথ কেনেদানীমাত্মানং বিনোদয়ামি।" বিদূষক রাজার ব্যথার ব্যথী নহে, তাই উত্তর করিল "মহাণসং গচ্ছস্ম" আসুন রন্ধনশালায় যাইয়া চিত্ত-বিনোদন করি।

রাজার গভীর হৃদয়-বেদনা বিদূষক দেখিয়াও দেখে না। জীবনের গভীরতা ও সত্যতার ভাব বিদূষকের হৃদয়ে নাই বলিলেই হয়। জগতে আসিয়া হাস্য পরিহাস ও ভোজনামোদ করিয়া কাল কাটান, বিদূষকের উৎকৃষ্ট ও চরম আদর্শ। বিদূষক পুত্রকলত্রবান্ নহে যে তাঁহাদের সংযোগে বা বিয়োগে হর্ষিত বা দুঃখিত হইবে। বিদূষক চেটিকাকে লইয়া প্রেমালাপ করে বটে, কিন্তু সেই প্রেমে গভীরতা নাই, সুতরাং প্রিয়জন বিরহে যাতনার সহিত তাহার

সহানুভূতি বড়ই অল্প; কিন্তু তাই বলিয়া রাজার কষ্টে একেবারে উদাসীন নহে; অনেক সময়ে উপদেশ কৌশলে রাজার চিত্ত বিনোদন করিয়া থাকে।

যাহাহউক রাজা ও বিদূষক প্রমোদবনের লতামণ্ডপে বসিয়া সংলাপ আরম্ভ করিলেন। বিদূষক ব্রাহ্মণত্ব ফলাইয়া আশীর্ব্বাদচ্ছলে কথায় কথায় বলিল—"অলং ভবদো পরিদেবিদেণ, ণিরেণ ইচ্ছিদ সম্পাদনে অনস্তো দে সহাও হবিস্সদিত্তি" অর্থাৎ শীঘ্রই মদন আপনার অনুকূল হইয়া ইষ্ট বস্তুর মিলন করিয়া দিবেন।

এদিকে রাজার বিরহে উর্ব্বশী নিতান্ত কাতরা হইয়া সখী চিত্রলেখার সহিত সেই প্রমোদবনে আসিয়া পড়েন, লতামণ্ডপের অন্তরালে থাকিয়া, রাজাও বিদূষকের কথোপকথন শ্রবণ করেন, রাজা যে উর্ব্বশীর প্রেমে নিতান্ত অধীর, তাহা উর্ব্বশী জানিতেন না। পরে যখন দেখিলেন যে, সত্য সত্যই তাঁহার জন্য রাজার হৃদয়ের আবেগ হইয়াছে, তখন সখী চিত্রলেখার সহিত পরামর্শ করিয়া, ভূর্জ্জপত্রে আপনার প্রেমসূচক অক্ষর সন্নিবদ্ধ করিয়া রাজার সমক্ষে ফেলিয়া দিলেন। রাজাও তাহা পাঠ করিয়া উর্ব্বশী প্রাপ্তি বিষয়ে কথঞ্চিৎ দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া আছেন, এমন সময়ে সখী চিত্রলেখা রাজার নিকট আবির্ভূত হইয়া উর্ব্বশীর মনোভিপ্রায় ব্যক্ত করিল। অবশেষে উর্ব্বশী স্বয়ং আসিয়া রাজার সহিত মিলিত হইলেন; কিন্তু মিলন বহুকালব্যাপী হইল না। দেবদূত আসিয়া বলিল যে, নাট্যাচার্য্য মহামুনি ভরত প্রণীত প্রয়োগ শীঘ্রই অভিনীত হইবে; অতএব উর্ব্বশী ত্বরায় স্বর্গলোক গমন করুন। দেবাজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া উর্ব্বশী তখনি চলিয়া গেলেন।

এদিকে মহিষী ঔশীনরী সখিগণ সমভিব্যাহারে রাজার হৃদয়াবেগের কারণ অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত সেই প্রমদবনস্থ লতামণ্ডপের অন্তরালে থাকিয়া বিদূষকও রাজার কথোপকথন শ্রবণ করিতে লাগিলেন। উর্ব্বশী চলিয়া যাইবার পর চিত্ত বিনোদন নিমিত্ত রাজা সেই ভূর্জ্জপত্র রাজ্ঞী ঔশীনরীর চরণতলে লগ্ন হইল। তিনি উহা পাঠ করিয়া দেখেন—যে নিপুণিকা তাঁহাকে রাজার প্রেম সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিল, তাহা যথার্থ। ভূর্জ্জপত্র না পাইয়া রাজার ব্যাকুলতা দেখিয়া, রাজ্ঞী স্বয়ং সেই ভূর্জ্জপত্র হস্তে করিয়া, রাজাকে দেন। রাজা অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন যে তিনি একটা অভ্রলিখিত ভূর্জ্জপত্র খুঁজিতেছিলেন, তাহা না পাইয়া ব্যাকুল হইয়াছেন। যাহাহউক রাজ্ঞীর জানিতে কিছু বাকি রহিল না। রাজ্ঞীকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত রাজা তাঁহার চরণধারণ পর্য্যন্ত করিলেন, কিন্তু রাজ্ঞী কোন কথা না শুনিয়া সদর্পে চলিয়া গেলেন। রাজার এ বিনয় প্রকৃত বিনয় নহে; চরণধারণ করিলেন বটে, কিন্তু মনে মনে অভিমান হইল যে, তাঁহার চরণধারণ জন্য বিনয় দেখিয়াও রাজ্ঞী তুষ্টা হইলেন না। রাজা যথার্থই বুঝিলেন যে, বিনা প্রেম প্রদর্শনে রমণীর হৃদয় বাহু বিনয়ে বশীভূত হইবার নহে।

"প্রিয়বচনকৃতোঽপি যোষিতং চ,
দয়িতানুনয়োরসাহতে।
প্রবিশতি হৃদয়ে নতদ্বিদাং
মণিরিবকৃত্রিমরাগ যোজিতঃ॥ (বি। ২অ)

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅক্ষয়কুমার ঠাকুর এম্, এ

সদাশিব রাও

পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধে পরাজিত না হইলে, মহারাষ্ট্রীয়েরা সমগ্র ভারতবর্ষে আপনাদের ক্ষমতা দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিত। হিমালয় হইতে কন্যাকুমারী ও পূর্ব্ব সাগর হইতে পশ্চিম সাগর পর্য্যন্ত হিন্দু আধিপত্য সংস্থাপিত হইত। বাবরের বংশধরগণের নামমাত্র প্রভুতার ক্ষীণালোক একবারে নির্ব্বাপিত হইয়া, তাহার স্থানে হিন্দু স্বাধীনতা-সূর্য্য পুনরুদিত হইত। পেশবা বলজীর জ্যেষ্ঠপুত্র বিশ্বাসরাও সসাগরা ভারতের অদ্বিতীয় অধীশ্বর বলিয়া সর্ব্বত্রই স্বীকৃত হইতেন এবং ইংরাজেরা এত শীঘ্র ভারত সাম্রাজ্য করায়ত্ত করিতে পারিতেন কি না সন্দেহ।

সাধারণতঃ সকলেরই বিশ্বাস, মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি সদাশিব রাও এই পরাজয়ের প্রধান কারণ। ইতিহাস পাঠক-মাত্রেই সদাশিবের হঠকারিতা, অবিমৃষ্যকারিতা ও সুহৃদ্বাক্য অবহেলনের দোষ দিয়া থাকেন। এই প্রবন্ধে আমরা দেখিতে চেষ্টা করিব যে, এই যুদ্ধে সদাশিবের কি পরিমাণ দোষ ছিল ও অন্যান্য কারণ এই পরাজয়ের সহায়তা করিয়াছিল কি না।

এ বিষয়ে বিশেষরূপে বুঝিতে হইলে, তাৎকালিক মারহাটা ইতিহাসে কিয়ৎপরিমাণে পরিচিত হওয়ার প্রয়োজন। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে পাণিপথের যুদ্ধকালে পেশবা বলজী রাও দক্ষিণাপথের সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন। তাঁহার দক্ষতা ও বিচক্ষণতা সর্ব্বজন প্রশংসনীয় ছিল। যদিও তিনি তৎপিতা বাজীরাওয়ের ন্যায় যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ ছিলেন না, তবুও ভারতীয় রাজন্যমাত্রেই তাঁহাকে ভয় ও ভক্তি করিত। তিনি একটু বিলাসী ছিলেন। তাঁহার জ্ঞাতি ভ্রাতা সদাশিব রাও তাঁহার মন্ত্রী ছিলেন। সদাশিব বুদ্ধিমান্, বিদ্বান্ ও কার্য্যকুশল ছিলেন। রাজনীতি ও সমরনীতিতে তাঁহার অসাধারণ অভিজ্ঞতা ছিল। তিনি একাকী রাজস্ব, পররাষ্ট্র প্রভৃতি গুরুতর বিষয়ের সচিবত্ব করিতেন; আবশ্যক হইলে, যুদ্ধযাত্রাও করিতেন। দক্ষিণাপথে নিজাম প্রভৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া, তিনি বিশেষ সুখ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন; এজন্য পেশবা তাঁহাকে সর্ব্বেসর্ব্বা করিয়া রাখিয়াছিলেন। সদাশিবের কৃতকার্য্যে বলজীরাও প্রায় হস্তার্পণ করিতেন না। এই সময়ে মহারাষ্ট্রীয়েরা ভারতবর্ষ মধ্যে সকল বিষয়েই প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছিল। হিন্দুস্থান তাহাদের করায়ত্ত হইয়াছিল। ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে পেশবার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাঘব পঞ্জাবও অধিকার করিয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে আব্দদসাহা দুরাণী পঞ্জাবকে কাবুল রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। এক্ষণে মহারাষ্ট্রীয়েরা তাহা অধিকার করায় তিনি যুদ্ধার্থে আগমন করিলেন। তাঁহার আগমনে উত্তর ভারতের তাবৎ মুসলমানই মহারাষ্ট্রীয়দের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিল। রোহিলখণ্ডের সর্দারগণ, অযোধ্যার নবাব প্রভৃতি প্রধান ব্যক্তি ও অপরাপর মুসলমানেরা আবদালির পক্ষ গ্রহণ করিলেন। আবদালি ভারতে প্রবেশ করিয়া, দিল্লী প্রভৃতি স্থান সহজেই হস্তগত করিলেন; যেহেতু মহারাষ্ট্রীয় সেনা ইতিপূর্ব্বেই স্বদেশ যাত্রা করিয়াছিল। সিন্ধিয়া বা হোলকারের অধীনে যে সকল প্রহরীসৈন্য ছিল, তাহারা সাধ্যমত যুদ্ধ করিয়া হটিয়া গেল।

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে, ইতিপূর্ব্বেই সসৈন্য রাঘব পুনায় প্রত্যাগত হইয়াছিলেন। সদাশিব তাঁহার কাগজপত্র বুঝিয়া লইতে গিয়া দেখিলেন, রাঘব অশীতি লক্ষেরও অধিক ঋণগ্রস্ত হইয়াছেন; এজন্য তিনি রাঘবের প্রতি বিলক্ষণ বিরক্তি প্রকাশ করিলেন। পেশবা স্বয়ং

মধ্যস্থ হইয়া, কনিষ্ঠের দোষ মানিয়া লইলেন। তাঁহার মধ্যস্থতায় রাঘব ও সদাশিবের পদ বিনিময় হইল; অর্থাৎ রাঘব গৃহে থাকিয়া রাজকার্য্য দেখিবেন, সদাশিব হিন্দুস্থানে যুদ্ধার্থে বহির্গত হইবেন।

এমন সময়ে সংবাদ আসিল, আমেদসাহ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছেন এবং সিন্ধিয়া ও হোল-কারকে পরাজিত করিয়া হটাইয়া দিয়াছেন। সংবাদ-প্রাপ্তিমাত্র বলজীরাও যুদ্ধের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। সদাশিবের হস্তে উৎকৃষ্ট সৈন্য সকল সমর্পণ করিলেন ও শত্রু এবং হিন্দুস্থানের সর্দারগণের সহিত আবশ্যকমত সন্ধি প্রভৃতি করিবার অসীম ক্ষমতা ন্যস্ত করি-লেন। হিন্দুদিগের চিরপ্রথা-অনুসারে সদাশিব রাও স্বয়ং সৈন্যাপত্য গ্রহণ করিলেন না। পেশবার জ্যেষ্ঠপুত্র অষ্টাদশ বর্ষীয় বিশ্বাস রাওকে সেনাপতি করিয়া যুদ্ধার্থ বহির্গত হইলেন।

এই সময়ে মহারাষ্ট্রীয় পদাতি সৈন্যেরা উৎকৃষ্ট ইউরোপীয় প্রণালীতে শিক্ষিত হইয়া-ছিল এবং তজ্জন্য ভারতমধ্যে তাহারা দুর্দ্ধর্ষ হইয়া পড়িয়াছিল; কিন্তু সুশিক্ষিত সৈন্য তাহাদের অধিক ছিল না, পনর হাজারমাত্র। ইব্রাহিম খাঁ গার্দ্দি নামক জনৈক আরব এই সৈন্যের অধিনায়ক ছিল; এতদ্ভিন্ন অশ্বারোহী সৈন্য সংখ্যাও পঁয়ত্রিশ হাজার হইবে। ইহার মধ্যে সুশিক্ষিত মহারাষ্ট্রীয় সৈন্য বার হাজারমাত্র; যে অশ্ব-সৈন্যের নিকট পূর্ব্বে আরঙ্গীবের সুশিক্ষিত সৈন্যগণ পরাজিত হইয়াছিল, ক্ষিপ্রকারিতায় যাহাদের সমকক্ষ সৈন্য ভারতে দৃষ্টিগোচর হয় নাই, তাহারা এক্ষণে আফগানদিগের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইতে প্রস্তুত হইল। ভূরি পরিমাণ কামান ও বিস্তর লুণ্ঠনপ্রিয় রেশালা লইয়া সৈন্যদল অগ্রসর হইল।

সসৈন্য সদাশিব ক্রমে নর্ম্মদা পার হইলেন। এক্ষণে তাঁহার একটু ভাব পরিবর্ত্তন হইল। যাহারা পূর্ব্ব হইতে সদাশিবের অমায়িকতায় পরিতুষ্ট ছিল, তাহারা হঠাৎ তাঁহাকে গম্ভীর-ভাব অবলম্বন করিতে দেখিয়া বিরক্ত হইল। এক্ষণে সদাশিবের কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞা বিশেষ বৃদ্ধি পাইল। সদাশিব এতদিন মনে করিতেছিলেন, কি প্রণালীতে উত্তরাপথের যুদ্ধ চলাইবেন ও পরাজয়ের পর কিরূপ ভাবে চলিবেন! মনে মনে সে বিষয়ের মীমাংসা করিয়া তিনি আশ্বস্ত হইলেন এবং প্রত্যেক কার্য্যেই দৃঢ়তার পরিচয় দিতে লাগিলেন।

অনেকে এই জন্য সদাশিবকে দোষ দিয়া থাকে; কিন্তু বাস্তবিক বলিতে হইলে, এ বিষয়ে সদাশিবকে প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। সদাশিব মনে করিয়াছিলেন, যবনদিগকে একবারে ভারতবর্ষ হইতে দূরীভূত করিবেন ও তৎপরিবর্ত্তে হিন্দুসাম্রাজ্য স্থাপন করিবেন। রাণা সংগ্রাম সিংহ ভিন্ন অপর কোন হিন্দুবীরই একথা ভাবেন নাই। প্রতাপসিংহ বা শিবজী এ বিষয় ভাবিবারও অবকাশ পাইয়াছিলেন কি না সন্দেহ। তাঁহারা নিজত্ব রক্ষা করিতেই এত ব্যস্ত ছিলেন ও তাঁহাদের ক্ষমতাও এত অল্প ছিল যে, আকবর বা আরঙ্গীবকে সিংহাসনচ্যুত করা, তাঁহাদের পক্ষে ক্ষেপার খেয়ালমাত্র। এই জন্য সংগ্রাম সিংহের অব্যবহিত পরেই সদা-শিব রাওয়ের নামোল্লেখ করিতে হয়। সংগ্রামসিংহের সময়ে যেমন কাল ও দেশ এরূপ চেষ্টার অনুকূল ছিল, সদাশিবের সময়েও সেইরূপ কাল ও দেশ অনুকূল হইয়া ছিল। সত্য বটে, পেশবা বাজীরাও চেষ্টা করিলে, হিন্দুস্থান অধিকার করিতে পারিতেন, কিন্তু উত্তর ভারত-বর্ষ জয় করিয়া বশীভূত করা, তাঁহার পক্ষে সুসাধ্য ছিল না। বলজী রাওয়ের সময়ে পেশ-বাদের ক্ষমতা যতদূর বদ্ধমূল হইয়াছিল, বাজীরাওয়ের সময়ে সেরূপ ছিল না। গৃহশত্রুর ভয়ে বাজীরাওকে সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকিতে হইত। তাঁহার সৈন্যবল এবং আর্থিক বলও সেরূপ ছিল না। বাদসাহেরাও তখন এতদূর প্রভুশক্তিশূন্য হইয়া পড়েন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর ক্রমিক দ্বাদশ বৎসর কাল মহারাষ্ট্রীয় বল বর্দ্ধিত হইতে থাকে। দক্ষিণাপথে ও হিন্দুস্থানে

ক্রমে পদবিক্ষেপে মহারাষ্ট্রীয়েরা আধিপত্য স্থাপনে কৃতকার্য্য হয়; সুতরাং বাজীরাওয়ের পক্ষে যাহা দুঃসাধ্য ছিল, সদাশিবের সময়ে তাহা সুসাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল। সদাশিব নিজে সাহস, বীরত্ব ও দক্ষতায় তাৎকালিক হিন্দুদিগের অগ্রণী ছিলেন; সুতরাং স্বাধীন হিন্দু সাম্রাজ্য স্থাপনের আশা তাঁহার পক্ষে দুরাশা হয় নাই। ইহাতে সদাশিবের স্বার্থ কিছু ছিল না। পেশবার পুত্রকে সম্রাট করিবেন, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা; কাজেই এরূপ গুরুতর কার্য্যের জন্য যেরূপ ভাবে চলা আবশ্যক, তিনি সেইরূপই কার্য্য করিতে সংকল্প করিলেন। যাহাতে অধীনস্থ সৈন্য ও সামন্তদিগকে শাসনাধীন রাখিতে পারেন, সেদিকে দৃষ্টি রাখিলেন। এতকাল মহা-রাষ্ট্রীয়েরা লুণ্ঠন-ব্যবসায়ী ছিল, কিন্তু সদাশিবের আর সেরূপে কার্য্য চালাইতে ইচ্ছা হইল না। সমগ্র ভারতের প্রভুত্ব-প্রার্থীর লুণ্ঠন কার্য্যও ভাল দেখায় না বলিয়া, সেই জন্য তিনি আরও সৈন্যমধ্যে সুশৃঙ্খলা ও শাসন সংস্থাপন করিলেন।

এই জন্য স্বপক্ষের কিয়দংশ লোক সদাশিবের উপরে বড়ই বিরক্ত হইয়া উঠিল; কিন্তু ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। যাহারা কখন বাঁধাবাঁধির ভিতর পড়ে নাই, যাহারা চিরকালই যুদ্ধ কার্য্যে ইচ্ছানুসারে চলিয়া আসিয়াছে, তাহারা যে ইহাতে বিরক্ত হইবে, ইহা স্বাভাবিক। যাহারা শাসন ভালবাসে না; তাহারা ততো সদাশিবকে দোষী করিতেই পারে। এই সকল লোকই আবার সদাশিবের পরাজয়ের পরে তাঁহাকে দোষ দিয়াছে। চিরাভ্যস্ত নীতি ও নিজের স্বার্থ পরিত্যাগ করিতে সকলেই পারে না; বিশেষতঃ বাজীরাওয়ের সময়ে যাহারা পূর্ব্বোক্তরূপে কার্য্য করিয়াছে. যাহারা আপনার স্বার্থ অনুসন্ধানে ব্যস্ত থাকিয়া অধীনতা স্বীকার করিতে ছিল, তাহারা সাধারণতঃ নূতন পথে চলিতে বিরক্ত হইবেই। যাহাদের অহমিকা অত্যন্ত অধিক, যাহারা সামান্য একটী গৃহকার্য্য করিয়া, মনে করে, যে আমি অতি প্রয়োজনীয়, আমি ব্যতীত একার্য্য হইতেই পারে না, তাহারা অপরকে অধিক প্রয়োজনীয় কার্য্য বিশেষ দক্ষতার সহিত করিতে দেখিলে, ঈর্ষান্বিত হইয়াই থাকে। এরূপ স্থলে তাহাদের কথানুসারে একজনকে দোষী সাব্যস্ত করা একদেশদর্শিতামাত্র। লোকের উদ্দেশ্য ও তাহার সাধনপ্রণালী দেখিয়াই দোষ গুণের বিচার হইয়া থাকে; সুতরাং সদাশিব রাওয়ের সুমহৎ উদ্দেশ্য ও তৎসাধনোদ্দেশে সৈন্যমধ্যে শৃঙ্খলা-স্থাপন ও শাসন-প্রবর্ত্তনে তাঁহার হঠকারিতা দেখিতে পাইলাম না; বরং এতদ্বারা তাঁহাকে আমরা দৃঢ়ব্রত ও স্বাধীনচেতা বলিয়াই বুঝিতে পারিতেছি।

(ক্রমশঃ)

শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি, এ.

সন্ধ্যা

দিক্‌বালা আঁধার অম্বরে ধীরে ধীরে
আবরিল কম তনুখানি,
দূরে মিলাইয়া যায় কানন প্রান্তর
ছায়ার মতন অনুমানি।
ভেঙ্গে গেছে পাখীর কূজন,
ডুবিয়াছে ভ্রমর গুঞ্জন,
জগতের কোলাহল সাগরে মিলায়ে গেছে,
ধরা যেন বিশাল বিজন,—
পড়ে আছে বাহু পসারিয়া
আধারেরে আলিঙ্গন দিয়া।
সমীরের মৃদু হাসিটুকু
ফুল হয়ে যেন কত ফুটে;
অন্তরের আকুল আগ্রহ
তটিনীর কলকলে উঠে;
এক একটি চুম্বন তাহার—
আকাশের এক একটি তারা।
মৃদু প্রেমভাষ, প্রেমগান,
বাতাস বহিয়ে হল সারা।

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র ঘোষ

জ্যোতিষ শাস্ত্রের স্থূল কথা

রাশিচক্র। আকাশস্থ নাক্ষত্রিক চক্র বিশেষের নাম রাশিচক্র। উহা ১৪ অংশ প্রশস্ত। সময়ে সময়ে উহা দ্বিগুণ পরিমাণে দৃষ্ট হয় বলিয়া, কেহ কেহ উহাকে প্রকৃত পক্ষে ২৮ অংশ প্রশস্ত বলিয়া থাকেন। সূর্য্যের পথ ঠিক উহার মধ্যস্থল দিয়া গমন করিয়াছে। জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতগণ পৃথিবীর উভয় মেরুর সমদূরে পূর্ব্বপশ্চিমে পরিধির ন্যায় বিষুবরেখা নামক যেমত একটি রেখা কল্পনা করেন, ঐ রেখার ঠিক উপরে আকাশমণ্ডলেও তদনুরূপ একটি রেখা কল্পনা করেন। ঐ রেখাও আকাশবৃত্তের মেরুদ্বয় হইতে সমদূরবর্ত্তী। গ্রহমার্গ ঐ রেখাকে দুই স্থানে ছেদন করিয়া থাকে। ঐ গ্রহমার্গ পূর্ব্বোক্ত নভোমণ্ডলস্থ বিষুবরেখাকে ছেদন করাতে যে কোণ উৎপন্ন হয়, তাহার পরিমাণ ২৩ অংশ ২৭ কলা ২৩ বিকলা। আমরা বৎসরের কোন সময়ে সূর্য্যকে উত্তর দিকে ও কোন সময়ে দক্ষিণদিকে গমন করিতে দেখি; কিন্তু উহা সূর্য্যের গতি-

বশতঃ নহে। সচল বস্তুর উপর আরোহণ করিয়া, যেরূপ ঐ বস্তুকে অচল ও পার্শ্বস্থ বস্তুকে সচল বলিয়া প্রতীতি হয়, তদ্রূপ আমরা সচল পৃথিবীর উপর অবস্থিত হইয়া, সূর্য্যের গতি অনুভব করিয়া থাকি। বস্তুতঃ পৃথিবী আপন মেরুদণ্ডের উপর পরিভ্রমণ করিতে করিতে, যখন উহার মেরুপ্রদেশ-সন্নিহিত প্রান্তদ্বয় সূর্য্যাভিমুখে কিঞ্চিৎ উন্নত হয়, তৎকালে পৃথিবীর উত্তরাংশ সূর্য্যের ঠিক সম্মুখে পড়ে। এই সময়কে আমরা উত্তরায়ণ বলি। অনন্তর যখন পৃথিবীর দক্ষিণ মেরুর সন্নিহিত প্রদেশ ঐরূপে সূর্য্যাভিমুখে উন্নত হয়, সেই সময়ে উহার দক্ষিণাংশ সূর্য্যের ঠিক সম্মুখে পড়ে এবং তাহাকেই আমরা দক্ষিণায়ণ বলিয়া থাকি। প্রতি বৎসর সূর্য্যকে এইরূপে উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ণের সময় যতদূর উত্তর বা দক্ষিণে যাইতে দেখা যায়, ঐ সীমাকে চিহ্নিত করিবার নিমিত্ত জ্যোতির্ব্বিদেরা ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগে দুইটি রেখা কল্পনা করিয়া থাকেন। ঐ রেখাদ্বয়ের নাম যথাক্রমে উত্তর অয়নান্ত রেখা বা উত্তর ক্রান্তিরেখা এবং দক্ষিণ অয়নান্ত রেখা বা দক্ষিণ ক্রান্তিরেখা। ঐ রেখার মধ্যবর্ত্তী স্থানের পরিমাণ ও পূর্ব্বোক্ত কোণ-পরিমাণের তুল্য। ঐ রেখাদ্বয়ের মধ্যে পৃথিবীর যে অংশ থাকে, সেই অংশের ঠিক সম্মুখে গগণমণ্ডলে মেষাদিক্রমে দ্বাদশ রাশি অবস্থিত আছে। ঐ কারণেই গগণমণ্ডলের ঐ অংশের নাম রাশিচক্র। ঐ রাশি চক্রের যে দুই অংশ আকাশস্থ নিরক্ষবৃত্তদ্বারা ছিন্ন হইয়াছে, তাহাদের নাম যথাক্রমে বাসন্তিক বা উত্তর অয়নান্ত বিন্দু এবং শারদ বা দক্ষিণ অয়নান্ত বিন্দু বলে। সূর্য্যোত্তর ক্রান্তিরেখাদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানের নাম অয়নমণ্ডল। ঐ মণ্ডলের ঠিক সম্মুখে উত্তর দক্ষিণে গগণমণ্ডলের কিয়দ্দূর ব্যাপিয়া যে একটি কল্পিত রেখা ঐ ভূকক্ষকে পরিবেষ্টন করে, তাহারই নাম রাশিচক্র। ঐ রাশিচক্র এবং অয়নমণ্ডল উভয়েই দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত প্রত্যেক ভাগকে রাশি কহে। প্রত্যেক রাশির পরিমাণ ৩০ অংশ, প্রতি অংশে ৬০ কলা এবং প্রতি কলাতে ৬০ বিকলা ইত্যাদি ভাগ হইয়া থাকে।

খগোল বিদ্যার প্রথমাবস্থায় মেষাদি দ্বাদশ নক্ষত্রপুঞ্জের নামানুসারে দ্বাদশ রাশির নাম যথাক্রমে মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ ও মীন হইয়াছে। ৬৬টি তারকাযুক্ত যে একটি মেষাকার-সদৃশ নক্ষত্রপুঞ্জ নভোমণ্ডলে দৃষ্ট হয়, তাহার নাম মেষ নক্ষত্রপুঞ্জ। ঐ নক্ষত্রপুঞ্জ রাশিচক্রের যে ভাগে অবস্থিত, খগোলবেত্তারা তাহাকে মেষরাশি কহেন। ঐরূপ বৃষাকার ১৪১ তারকাসংযুক্ত নক্ষত্রপুঞ্জাধিষ্ঠিত রাশিচক্রাংশই বৃষরাশি। মিথুনাকার ৮৫ তারকাসংযুক্ত নক্ষত্রপুঞ্জাধিষ্ঠিত রাশিচক্রাংশই মিথুনরাশি। এইরূপ কর্কটাকার ৮৩ তারকাসংযুক্ত, সিংহাকার ৯৫ তারকাসংযুক্ত, কন্যাকার ১১০ তারকাসংযুক্ত, তুলাকার ৫১ তারকাসংযুক্ত, বৃশ্চিকাকার ৪৪ তারকাসংযুক্ত, ধনু আকার ৬৯ তারকাসংযুক্ত, মকরাকার ৫১ তারকাসংযুক্ত, কুম্ভাকার ১০৮ তারকাসংযুক্ত, মীনাকার ১১৩ তারকাসংযুক্ত নক্ষত্রপুঞ্জাধিষ্ঠিত রাশিচক্রাংশই যথাক্রমে সিংহাদি সংজ্ঞায় ব্যক্ত হইয়া থাকে।

উক্ত দ্বাদশ নক্ষত্রপুঞ্জ সাধারণে অচল বলিয়া প্রসিদ্ধ বটে, কিন্তু উহাদের কলা, বিকলা করিয়া একটি বার্ষিক গতি দৃষ্ট হয়। আকাশমণ্ডলের মধ্যখণ্ডে ঐ রাশিচক্র অবস্থিত। ঐ চক্রের উত্তর ও দক্ষিণে অসংখ্য তারকা আছে; কিন্তু প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণ, সপ্তর্ষিমণ্ডল ও ধ্রুবতারা প্রভৃতি কয়েকটী সুপ্রসিদ্ধ নক্ষত্র ভিন্ন অন্য নক্ষত্রের বিশেষ কোন উল্লেখ করেন নাই। তাহার কারণ বোধ হয়, ঐ সকল নক্ষত্রের অনুভবনীয় দূরত্ব। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ঐ নক্ষত্র সকল পৃথিবী হইতে এতাদৃশ দূরে অবস্থিত যে, উহাদিগের কিরণ চারি বৎসরের ন্যূনে পৃথিবীতে আইসে না।* ধ্রুবতারা সমুদ্রে নাবিকগণের পথদর্শনের এবং সপ্তর্ষিমণ্ডল

* ১ম বর্ষের সাহিত্য-কল্পদ্রুম দ্রষ্টব্য।

সৃষ্টি কার্য্যের সহায়রূপে উক্ত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত আর্য্যঋষিগণ আপনাদিগের অসামান্য বুদ্ধিকৌশল-সহকারে ২৭টি নক্ষত্র বা নক্ষত্রপুঞ্জদ্বারা রাশিচক্রকে আরও সূক্ষ্মরূপে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রত্যেক নক্ষত্রের পরিমাণ ১৩ অংশ ২০ কলা; সুতরাং ২২৫ নক্ষত্রে এক একটি রাশি গণিত হইয়া থাকে।

অতি প্রাচীন কালে সতী বা অভিজিৎ নক্ষত্র লইয়া অষ্টাবিংশতি নক্ষত্র উক্ত হইত; কিন্তু তাহাতে অধিক ভগ্নাংশ হওয়াতে গণনার অসুবিধা বোধে ঐ নক্ষত্র দক্ষরূপ মকররাশি হইতে পরিত্যক্ত হয়। তদবধি সপ্তবিংশতি নক্ষত্র লইয়াই জ্যোতিঃশাস্ত্রের গণনা চলিয়া আসিতেছে।

কোন চক্রের আদি অন্ত নাই, তবে কোন বিশেষ নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে, উহার আদি ও অন্ত নিরূপিত পারে। রাশিচক্র বা অয়নমণ্ডলেরও সেইরূপে আদ্যন্ত নিরূপিত হইয়া থাকে, ইয়ুরোপ ও আমেরিকাতে বাসন্তিক ক্রান্তিপাত হইতে এবং অস্মদ্দেশে অশ্বিনীনক্ষত্রের প্রথম পাদ হইতে রাশিচক্রের আরম্ভ নিরূপিত হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, পৃথিবীর নিরক্ষবৃত্তের ন্যায় ঐ চক্রের মধ্যভাগে পূর্ব্বপশ্চিমে ব্যাপ্ত যে একটি সরল রেখা লক্ষিত হয়, তাহাকেই নভোমণ্ডলের নিরক্ষ বৃত্ত বা বিষুবরেখা কহে। প্রতি বৎসর অয়নমণ্ডলের যে দুই স্থলে ঐ বিষুব রেখা মিলিত হয়, তাহারই নাম ক্রান্তিপাত। ঐ সময়ে ঐ অংশে সূর্য্যের সমসূত্রপাতে অর্থাৎ বিষুবরেখার উপর সূর্য্যরশ্মির সমভাবে পতনে পৃথিবীর সকল স্থানের দিবারাত্রি সমান হয়। অধুনা ৯ই চৈত্র বা ১০ই চৈত্র একবার এবং ৯ই কিম্বা ১০ই আশ্বিন আর একবার ক্রান্তিপাত হইয়া থাকে। চৈত্রমাসের ক্রান্তিপাতকে বাসন্তিক ও আশ্বিন মাসের ক্রান্তিপাতকে শারদীয় ক্রান্তিপাত কহে। ১৩৮১ বৎসর পূর্ব্বে চৈত্র ও আশ্বিন মাসের ৩০ বা ৩১ দিবসে আশ্বিনীর প্রথমাংশে ও চিত্রার ৬ অংশ ৪০ কলায় ঐ ক্রান্তিপাত হইত তর্থাৎ ঐ দুই নক্ষত্রের ঐ দুই অংশের মধ্যে বিষুবরেখা অবস্থিতি করিত এবং ঐ দুই স্থলে অয়নমণ্ডলের সংযোগ হইত। ভারতের জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ, অশ্বিনীর প্রথমাংশে যে ক্রান্তিপাত হইত, তথায় সূর্য্যের আগমন হইলে, মহাবিষুব সংক্রান্তি ও চিত্রানক্ষত্রের উল্লিখিত অংশে যে ক্রান্তিপাত হইত তথায় সূর্য্যের আগমনে জলবিবুব সংক্রান্তি বলিতেন। এক্ষণে ঐ দুই স্থলে বিষুবরেখার সহিত অয়নমণ্ডলের সম্মিলন হয় না। ঐ সংযোগ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে ৫০ বিকলা ১৫ অনুকলা এবং প্রাচ্য পণ্ডিতগণের মতে ৫৪ বিকলা অয়নমণ্ডলের পশ্চিমাংশে সরিয়া হয়, অর্থাৎ ঐ পরিমাণে প্রতিবৎসর রাশিচক্র বা বিষুবরেখার সঞ্চালন কল্পিত হয়। উভয় মতের ঐ প্রভেদ ও অশ্বিনী নক্ষত্রের ৩ বিকলা * গতির কল্পনা হইতে হইয়া থাকে।

এক্ষণে উক্ত ক্রান্তিপাত ২৩ অংশ অন্তরে অর্থাৎ যে স্থান মীনরাশির ৭ অংশ ভুক্ত বলিয়া পরিগণিত, সেই স্থলে ক্রান্তিপাত হইতেছে এবং ঐ দিবস উক্ত ক্রান্তিপাত উপস্থিত হইলে দিবারাত্রি সমান হইয়া থকে। এই কারণে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ঐ দিবসই রবির মেষ-সংক্রমণ এবং তথা হইতে মেষ রাশির আরম্ভ গণনা করেন। এই গণনার নামই সায়ন গণনা; এবং যাঁহারা ঐ অয়নগতি অস্বীকার করেন না। তাঁহাদিগের গণনার নাম নিরয়ণ গণনা। আর্য্যশাস্ত্রে উক্ত উভয়বিধ গণনাই প্রচলিত আছে। †

* কোন কোন কোন জ্যোতির্ব্বিদের মতে অশ্বিনীর ৩ বিপলেরও কিঞ্চিদধিক পরিমাণে বার্ষিক গতি হয়।

† যাঁহারা রাশিনক্ষত্রের অয়ন-গতি স্বীকার করেন না, তাঁহারা যে প্রণালীতে গণনা করেন, তাহাই নিরয়ণ-প্রণালীর গণনা। এই প্রণালীতে অচলা অশ্বিনী নক্ষত্রের প্রথমপাদে মেষের সঞ্চার হইতে গণনা আরম্ভ হয়।

পাশ্চাত্য জ্যোতিঃশাস্ত্রে রাশিচক্রস্থ প্রধান প্রধান যে কয়েক নক্ষত্রের উল্লেখ আছে, তাহাদের নাম যথা—এরিটস্, সেলারটান, এনভিচেরাস, হায়েডেস্, প্লীডেস্, ক্যাস্টর, পোলক্স, এসিনাই প্রেসিপি, রেগুলস্, ডেনবোলা, স্পাইকা, ভারজিনস্, ফোরষ্টার্স, এনটেয়ার্স, সেগিটেরিয়স্ ও নিটল্‌ষ্টার্স।

সৌরজগৎ। আমরা যাহাকে আপাততঃ অতি প্রকাণ্ড বোধ করিয়া থাকি, সেই সৌরজগৎ বস্তুতঃ পরিদৃশ্যমান বিশ্বের একটি অতি ক্ষুদ্র অংশমাত্র। সূর্য্য যদিও একটি সামান্য নক্ষত্র বটে; কিন্তু বিশেষ এই যে, উহা স্বতন্ত্র একটি জগতের কেন্দ্রস্বরূপ। উহার চতুর্দ্দিকে কতকগুলি গ্রহ ও উপগ্রহ প্রবহমান বায়ু কর্ত্তৃক চালিত হইয়া, পশ্চিম হইতে পূর্ব্বাভিমুখে নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে; এবং স্বভাবতঃ অনুজ্জ্বল ঐ সকল গ্রহ ও উপগ্রহ সূর্য্যমণ্ডল হইতেই তেজ ও দীপ্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। উহারা স্বকীয় তেজে দীপ্তিমন্ত নহে। ঐ সকল গ্রহ আকারগত বৈষম্য প্রযুক্ত আপেক্ষিক ক্ষুদ্র ও বৃহৎ এই ভাগদ্বয়ে বিভক্ত। প্রথম ভাগে বুধ, শুক্র, পৃথিবী ও মঙ্গল এবং অপর ভাগে বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনস বা হর্ষেল ও নেপ্‌চুন। * এতদ্ব্যতীত ১০৯ টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নক্ষত্র এই সৌরজগতের মধ্যে মধ্যে দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঐ সকল নক্ষত্র এত ক্ষুদ্র যে, কতক গুলির ব্যাস ৮০০ মাইল বা তদপেক্ষাও অল্প; তদ্ভিন্ন আর কতকগুলি নক্ষত্র বা গ্রহগণের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে করিতে তৎসঙ্গেই সূর্য্যমণ্ডলকে প্রদক্ষিণ করিতেছে; উহাদিগকে উপগ্রহ কহে। উহাদিগের সংখ্যা যথা,—পৃথিবীর ১টি, বৃহস্পতির ৪টি, শনির ৮টি ইউরেনসের ৪টি ও নেপচুনের ২টি। গ্রহগণের মধ্য বুধ সর্ব্বাপেক্ষা সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী এবং নেপচুন সর্ব্বাপেক্ষা সূর্য্য হইতে দূরবর্ত্তী। উহারা সকলেই স্ব স্ব নিয়মিত পথে সূর্য্যমণ্ডলকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। উহাদিগের গতি একরূপ নহে। নৈকট্য-দূরত্বাদি অনুসারে ঐ গতির তারতম্য হয়।

এই বিশ্বমধ্যে সূর্য্য জগদীশ্বরের আশ্চর্য্য সৃষ্টি। সূর্য্যের বিষয় আমরা যতই চিন্তা করি, আমাদিগের মনে ততই বিস্ময় রসের আবির্ভাব হইয়া, সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরের মহিমা পরিব্যক্ত করে। যদি একবার এই সূর্য্যের অনুদয় কল্পনা করা যায়, তাহা হইলে অতীব বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইতে হয়। ইহার অভাবে এই হাস্যময়ী পৃথিবী আলোক ও উত্তাপ

আর যাঁহারা অয়ন-গতি স্বীকার করেন, তাহাকেই সায়ন গণনা বলে। এই প্রণালীতে বিষুবরেখা ও অয়নমণ্ডলের মিলনস্থানে অর্থাৎ ক্রান্তিপাতে যেখানে সূর্য্যের সম্পাতে দিবারাত্রির পরিমাণ সমান হয়, সেইস্থানেই মেষের সংক্রমণের আরম্ভ ধরিয়া গণনা করা হয়।

অয়ন গতি—গ্রহগণ রাশিচক্রে বামাবর্ত্তে যে ভ্রমণ করিয়া থাকে, তাহাই অয়ন গতি। সমস্ত গ্রহই বামাবর্ত্তে রাশিচক্রে অতিক্রম করে, কেবল রাহু ও কেতু দক্ষিণাবর্ত্তে অর্থাৎ মেষের পর মীন, মীনের পর কুম্ভ—এইরূপে এক রাশি হইতে দক্ষিণাবর্ত্তে রাশি চক্রে ভ্রমণ করে। রাহু কেতু আর্য্যশাস্ত্র মতে গ্রহ বলিয়া গণ্য, কিন্তু পাশ্চাত্য শাস্ত্রে ইহারা পৃথিবী ও চন্দ্রের কক্ষপথের মিলনস্থান বলিয়া উক্ত হয়।

* এই দুইটি গ্রহ হিন্দুশাস্ত্রে নাই। পাশ্চাত্যজ্যোতির্ব্বেত্তাগণের অধ্যবসায় ও খগোল পরিদর্শন গুণে ৮শ শতাব্দীতে প্রকাশিত হইয়াছে, সুতরাং ইহাদের সম্বন্ধে আর্য্য জ্যোতিষিক সিদ্ধান্ত গ্রন্থগুলিতে একটি কথাও নাই। আবার পাশ্চাত্য আধুনিক জ্যোতিষ শাস্ত্রে চন্দ্রকে গ্রহ বলিয়া গণ্য করা হয় না; প্রত্যুত উহা পৃথিবী-গ্রহের উপগ্রহ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে; সুতরাং পাশ্চাত্যশাস্ত্রের সহিত আর্য্যশাস্ত্রে চন্দ্রসম্বন্ধে অনেক গোলমাল আছে। বাস্তবিক গণনায় গোলমাল কিছুই নাই; কিন্তু বর্ণনায় অনেক পার্থক্য আছে।

বিহীনা হইয়া, ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া যায়; চিরস্থায়ী হিমের সমাগমে গ্রীষ্মাদি ঋতু সকল বিলুপ্ত হইয়া যায়; বেগবতী নদী সকলের বেগ অবরুদ্ধ হইয়া যায়; পৃথ্বী বৃক্ষলতাদি পরিশূন্য হইয়া, মরুর আকার ধারণ করে; ধরাধামের সৌন্দর্য্য এককালে অন্তর্হিত হয়; নিরন্তর তুষার বর্ষণে পৃথিবী শ্মশান সমান হইয়া উঠেন; কিন্তু ঈশ্বরের আশ্চর্য্য কৌশলে ঐ সূর্য্যের সৃষ্টি ও তাহার যথাবিধানে অবস্থিতিতে সর্ব্ববিষয়ে সামঞ্জস্য রক্ষিত হইয়াছে এবং তদ্দ্বারা ভূমণ্ডলবাসী জীবগণের জীবনোপযোগী বস্তু সকল সংরক্ষিত হইয়াছে। এই সৌরজগতে যে সকল জ্যোতিষ্ক অবস্থিতি করিতেছে, তন্মধ্যে সূর্য্যই মহান্ ও বৃহৎ। যাবদীয় গ্রহকে একত্র করিলেও সূর্য্যমণ্ডলের ৫০০ অংশের একাংশের অধিক হইবে না। সূর্য্যের ব্যাস পরিমাণ প্রায় ৮,৮৩,২৪৬ ইং মাইল। ইহা আমাদিগের পৃথিবী অপেক্ষা প্রায় ৫০ লক্ষ গুণ বৃহৎ। গ্রহগণ যেরূপ সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করতঃ অনবরত ভ্রমণ করিতেছে, সূর্য্যও তদ্রূপ কোন গ্রহ বা অন্য কোন নক্ষত্রকে পরিবেষ্টন করিয়া ভ্রমণ করে, এরূপ বোধ হয় না; তবে সূর্য্যকে স্বীয় কক্ষায় ২৫ দিন ১৪ ঘণ্টা ৮ মিনিটে একবার আবর্ত্তন করিতে দেখা যায়। ইহার মেরুদণ্ডের কক্ষাভিমুখে নতি ৮২০ ডিগ্রী (অংশ) ৪৪ মিনিট (কলা)। সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যে কতক গুলি মলিন চিহ্ন দৃষ্ট হয়। দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে ঐ সকল চিহ্নের সময়ে সময়ে পূর্ব্বাংশে বা পশ্চিমাংশে অপসরণ দর্শনে ঐ ভ্রমণ ও সূর্য্যমণ্ডলের গোলত্বের অনুমান হইয়া থাকে। পৃথিবী স্বীয় কক্ষায় ভ্রমণ করিতে করিতে শীতকালে সূর্য্যের অতীব নিকটবর্ত্তিনী হয়েন এবং গ্রীষ্মকালে অত্যন্ত দূরগামিনী হয়েন, এই কারণেই গ্রীষ্মকাল অপেক্ষা শীতকালে সূর্য্যমণ্ডল কিঞ্চিৎ বৃহৎ দৃষ্ট হইয়া থাকে, তদ্ভিন্ন ঐ পরিবর্ত্তনের আর কোন কারণ দৃষ্ট হয় না। পৃথিবীর পৃষ্ঠের ন্যায় সূর্য্যমণ্ডলের উপরিভাগ সমতল নহে, স্থানে স্থানে উচ্চতা বা নিম্নতা অনুভূত হয়। আমরা সামান্য জ্ঞানে সূর্য্যমণ্ডলকে যেরূপ উত্তপ্ত বোধ করি, বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ বলেন, সূর্য্যমণ্ডল প্রকৃত পক্ষে তাদৃশ উত্তপ্ত নহে। উহার কিঞ্চিৎ দূর প্রদেশ ব্যাপিয়া বাষ্পাকার-পরিণত, উহারই অংশভূত, জ্বলনশীল, বায়ুবৎ পদার্থরাশি নিয়ত সূর্য্যমণ্ডলকে আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে, তাহাতেই সূর্য্যমণ্ডল তেজোময় লক্ষিত হয়। ঐ পদার্থ মেঘমালার ন্যায় নিয়ত চঞ্চল। ফলতঃ সূর্য্যমণ্ডলকে স্বভাবতঃ ঐ প্রকার উত্তাপশূন্য বিবেচনা করিবার বিষয়ে পণ্ডিতগণ প্রধানতঃ দুইটি কারণ নির্দ্দেশ করেন। তাঁহারা বলেন যে, সূর্য্যমণ্ডল যদি স্বয়ং উত্তপ্ত হইত, তাহা হইলে পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী স্থান সকল হইতে উপরের স্থান সকলে অপেক্ষাকৃত অধিক শীতের প্রাদুর্ভাব হইত না এবং মেরুসন্নিহিত প্রদেশ সকলে সূর্য্যরশ্মি বক্রভাবে পতিত হইয়াও অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা উত্তাপের আধিক্য উৎপাদন করিত না। অতএব উত্তাপ সূর্য্যের স্বাভাবিক ধর্ম্ম নহে। পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী কোন পদার্থের গুণে ঐ উত্তাপের হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে, অর্থাৎ পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ২০২৫ ক্রোশ পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া যে বায়ুরাশি অবস্থিতি করিতেছে, ঐ প্রবল বায়ুর সংযোগে সূর্য্যকিরণের উত্তাপের হ্রাসবৃদ্ধি উৎপন্ন হয়। ঐ বায়ু স্বীয় ভারবশতঃ উন্নত প্রদেশ অপেক্ষা নিম্নে অধিক গাঢ়। এই কারণেই উন্নত স্থান অপেক্ষা নিম্নপ্রদেশে উত্তাপের বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

আর্য্য জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতগণ (সূর্য্যকে পৃথিবী স্থানীয় করিয়া) বলেন; প্রতিযুগে অর্থাৎ ৪৩২০০০০ বৎসরে ঐ সংখ্যক বার রাশিচক্র ভ্রমণ করেন। এবং একবার ভ্রমণে মধ্যগতিতে ৩৬৫ দিন ১৫ দণ্ড ৩১ পল ৩১ বিপল ও ২৪ অনুপল লাগে *। পাশ্চাত্যমতে ৩৬৫।৫ ৪৫।

* সূর্য্যসিদ্ধান্ত মতে ৩৬৫ দিন, ১৫ নাড়ী (দণ্ড) ৩১ বিনাড়ী (পল) ৩১৪ প্রাণ (অনুপল) সময় লাগে।

নাক্ষত্রিক ভ্রমণকালের স্থিরতা আর্য্যমতে নাই; ইংরাজীমতে ৩৬৫।৬।১০ মিনিট। উক্ত রাশিচক্র ১২ ভাগে ৩৬০ অংশে বিভক্ত, সুতরাং সূর্য্যের এক রাশি ভ্রমণকাল এক মাস; তজ্জন্য পৃথিবীসম্বন্ধে সূর্য্যের একমাসে এক রাশি ভোগ হইয়া থাকে। এক রাশি হইতে রাশ্যন্তর গমনকালের নামই সংক্রান্তি। পৃথিবীর কক্ষা সম্পূর্ণ গোল নহে বলিয়া, উক্ত সংক্রমণ কালের হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে। পৃথিবীসম্বন্ধে সূর্য্যের দৈনিক গতি ৫৯ কলা ৮ বিকলা ১০ অনুকলা, তদনুসারে সূর্য্যের সর্ব্বরাশিতে অবস্থিতি কাল; অহোরাত্রে ৬০ দণ্ড হইলেও, মেষরাশিতে অবস্থানের সময়ে সাধারণতঃ দিনমান ৩০।৫৫।৩৩, বৃষে ৩১।২৪।৫৬, মিথুনে ৩১।৩৭।৩২, কর্কটে ৩১।২৮।৫৩, সিংহে ৩১।২৫।৫২, কন্যাতে ৩০।২৯।৪, তুলাতে ২৯।৫৭।২, বৃশ্চিকে ২৯।৫৭।৩৯, ধনুতে ২৯।১৫।৩, মকরে ২৯।২৪, কুম্ভে ২৯।৪৯।৪৩ এবং মীনে ৩০।২৩।৩১ দণ্ডাদি হয়; সুতরাং মাসেরও ঐরূপ হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে *। সূর্য্য পৃথিবী সম্বন্ধে ২৮ বৎসরান্তে স্বস্থানে প্রত্যাগত হইয়া, পূর্ব্ববৎ রাশ্যাদি ভোগ করিয়া থাকেন।

বুধ।—এই গ্রহ, সকল গ্রহ অপেক্ষা সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী; এইহেতু পণ্ডিতগণ বলে, ইহা আমাদিগের পৃথিবীর ন্যায় ক্ষিত্যংশসম্ভূত নহে। যদি সেরূপ হইত, তাহা হইলে, ইহা এতদিন সূর্য্যের উত্তাপে দ্রবীভূত হইয়া, কাচের ন্যায় স্বচ্ছ আকার ধারণ করিত। ঐ গ্রহকে সর্ব্বদা সূর্য্যের অতি নিকটে পশ্চিম হইতে পূর্ব্বাভিমুখে ভ্রমণ করিতে দেখা যায়, এই কারণে জ্যোতির্ব্বিদ্গণ এখনও ইহার বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে কিছুই স্থির করিতে পারেন নাই। ইহার জ্যোতিঃ সকল গ্রহ অপেক্ষা অধিকতর শুভ্র। এই গ্রহ সূর্য্যমণ্ডল হইতে ৩৮৭১০ মাইল দূরে অবস্থিত। ইহার ব্যাস ৩২২৪ মাইল; পৃথিবী হইতে দৃশ্যমান ব্যাস ১০ বিকলা এবং রবি হইতে দৃশ্যমান ব্যাস ২৬ বিকলা। রাশিচক্র বা সূর্য্য-প্রদক্ষিণ কাল ৮৬'৯৬৯২৮২৪ দিন † এবং পৃথিবীর সহিত সংযোগকাল ১১৫৮৭৭ দিন; সুতরাং তথায় ঋতুভেদ ৪৪ দিনের অধিক নহে। বুধগ্রহের স্বীয় মেরুদণ্ডে একবার আবর্ত্তনের কাল ১৪ দিন ২৪ ঘণ্টা ৫ মিনিট ২৮ সেকেণ্ড। ইহার কক্ষা রবিমার্গাভিমুখে ৭ অংশ অবনত। এই গ্রহ পৃথিবী সম্বন্ধে ২৮ অংশ ২০ কলার মধ্যে অবস্থিতি করে, সুতরাং সূর্য্য স্বীয় মাসিক রাশি-সংক্রমণ নিয়মানুসারে যখন যে রাশিতে গমন করেন, বুধ তাঁহার উচ্চ অংশের মধ্যে অবস্থান করেন। বুধের দৈনিক গতি সূর্য্যসিদ্ধান্তমতে ৩ অংশ, ৫ কলা, ৩২ বিকলা, ২১ অনুকলা। বার্ষিক মধ্যগতি ৮৭ দিন, ৫৮ নাড়ী, ১০ বিনাড়ী, ৫'৫৭ প্রাণ; বক্রগতি ২৪দিন এবং ২ দিন স্থিতি। এই গ্রহ ৪৬ বৎসর অন্তর পূর্ব্বরাশিতে প্রত্যাগমন করেন। বুধগ্রহকে কিছু দিন সূর্য্যাস্তের পর পশ্চিমে ও কিছুদিন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে পূর্ব্বদিকে দেখা যায়। যখন বুধ পশ্চিম দিকে উদয় হয়, তখন সূর্য্যের বিশেষ নৈকট্যপ্রযুক্ত প্রায় সুস্পষ্ট দেখা যায়না; কিন্তু দিন দিন সূর্য্য হইতে কিঞ্চিৎ অপসৃত হইলে, স্পষ্টরূপ দৃষ্ট হয়, আবার নিকটবর্ত্তী হইলে সূর্য্যরশ্মি প্রভাবে কিছুকাল অদৃশ্য হইয়া যায়। দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে চন্দ্রকলার ন্যায় বুধেরও হ্রাস বৃদ্ধি দেখা যায়; কিন্তু সূর্য্যের অতি নৈকট্য প্রযুক্ত ইহার আলোকিত অংশ কোন কালেই পৃথিবীর সম্মু-

* কোন কোন জ্যোতিষশাস্ত্রে মাসমানের ব্যবস্থা এইরূপ আছে;—বৈশাখ ৩০।৫৬।৪৯, জ্যৈষ্ঠ ৩১।২৫।৩৯, আষাঢ় ৩১।৩৮।৩৫, শ্রাবণ ৩১।২৭।৫৭, ভাদ্র ৩১।০।২০, আশ্বিন ৩০।২৫।৪০, কার্ত্তিক ২৯।৫২।৫১, অগ্রহায়ণ ২৯।২০।১, পৌষ ২৯।১৯।৯, মাঘ ২৯।২৭।২৩, ফাল্গুন ২৯।৫০।৪, চৈত্র ৩০।২২।৩।

† অন্য একখানি জ্যোতিষশাস্ত্রে ৮৭ দিন, ৫৮ দণ্ড, ৯ পল, ১৭ বিপলে বুধ একবার রাশিচক্র ঘুরিয়া আসে। ইহার গতি নানারূপ। প্রতি রাশিতে বুধ ১৮ দিন থাকে। সূর্য্যসিদ্ধান্তমতে রাশিচক্র ঘুরিতে ৮৭ দিন, ৫৮ নাড়ী, ১০ বিনাড়ী, ৫'৫৭ প্রাণ সময় লাগে।

খীন না হওয়াতে, পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায় গোলাকার দেখা যায় না। কোন কোন সময়ে এই গ্রহ সূর্য্য ও পৃথিবীর মধ্যস্থলে আসিয়া সূর্য্যমণ্ডলের উপরিভাগ দিয়া গমন করে, ঐ কালে সূর্য্যমণ্ডলে যে কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন দৃষ্ট হয়, তাহাতে উহার গ্রহণ অনুমিত হয়।

শুক্র।—এই গ্রহ দেখিতে অতি সুন্দর। সন্ধ্যাকালে ও প্রত্যুষে এই গ্রহ অতিশয় ঔজ্জ্বল্য সহকারে প্রকাশিত হয়, এই কারণে লোকে ইহাকে প্রভাত তারা ও সন্ধ্যাতারা বা শুক্র-তারা বলিয়া থাকেন। ইহার এই পশ্চিম বা পূর্ব্বদিকে উদয় কাল পৃথিবী সম্বন্ধে ২৯০ দিবস। শুক্রের ব্যাস ৭৬৮৭ মাইল। পৃথিবী হইতে দৃশ্যমান ব্যাস ৫৮ বিকলা এবং সূর্য্যমণ্ডল হইতে দৃশ্যমান ব্যাস ৩০ বিকলা। এই গ্রহ সূর্য্য হইতে ৭২৩৩৩ মাইল দূরে অবস্থিত। রাশিচক্র ভ্রমণ কাল ২২৪·৭০০৭৭৫৪ দিন * এবং পৃথিবীসংযোগ কাল ৫৮৩·৯২০ দিন। মেরুদণ্ডে আবর্ত্তন কাল ২৩ ঘণ্টা ২১ মিনিট ৮ সেকেণ্ড। ইহার কক্ষ রবিমার্গে ৩ অংশ ২৩ কলা ৩৫ বিকলা অবনত। শুক্র গ্রহের দৈনিক গতি সূর্য্যসিদ্ধান্তমতে ১ অংশ, ৩৬ কলা ৭ বিকলা ৪৪ অনুকলা; অন্যগ্রন্থে ১ অংশ ৭ বিকলা, ৪৪ অনুকলা; বার্ষিক মধ্যগতি ২২৪ দিন ৪১ কলা, ৫৪ বিকলা, ৫·০৬ অনুকলা; বক্রগতি ৪২ দিন এবং ৪ দিন স্থিতি এই গ্রহ পৃথিবীসম্বন্ধে সূর্য্যের ৪৭ অংশ ৪৮ কলার মধ্যে স্বীয় কক্ষে ভ্রমণ করিয়া থাকে। ৮ বৎসর পরে শুক্র পূর্ব্বস্থানে প্রত্যাগমন করে। শুক্র গ্রহের সূর্য্যের সহিত সমাগম হইবার পর, প্রথমতঃ ইহাকে সূর্য্যোদয়ের কিছু প্রাক্কালে পূর্ব্বদিকে উদয় হইতে দেখা যায়। এই সময়ে দ্বিতীয়ার চন্দ্রের ন্যায় সূর্য্যাভিমুখে ইহার আলোকময় রেখা দেখা যায়। তদনন্তর ইহার গতি যত পশ্চিম দিকে বৃদ্ধি পাইতে থাকে, ততই ইহার আলোকময় অংশ ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। পরে যখন আবার সূর্য্যাস্তের পর পশ্চিম দিকে উদয় হয়, তখন ইহাকে পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় গোলাকার ও আলোকময় দৃষ্ট হয়, পরে ক্রমশঃ ক্ষয় হইতে থাকে।

মঙ্গল।—এই গ্রহ সূর্য্য হইতে ২৫২৩৬৯ মাইল। ইহার ব্যাস ৪১৮৯ মাইল। পৃথিবী হইতে দৃশ্যমান ব্যাস ২৭ বিকলা এবং সূর্য্য হইতে দৃশ্যমান ব্যাস ১০ বিকলা। রবিমার্গে মেরুদণ্ডের অবনতি ৫৯ অংশ ২২ কলা এবং স্বমার্গের রবিমার্গে অবনতি ১ অংশ ৫১ কলা। রাশি চক্র ভ্রমণ কাল ৬৮৬·৯৭৯৪৫৬১ দিন † সংযোগ কাল ৭৭০·৯৩৬ দিন। দৈনিক গতি সূর্য্যসিদ্ধান্তমতে ৩১ কলা, ২৬ বিকলা ২৯ অনুকলা; বার্ষিক মধ্যগতি রাশিচক্র ভ্রমণকালের তুল্য; বক্রগতি ৮০ এবং স্থিতি ৪ দিন। মেরুদণ্ডে আবর্ত্তন কাল ২৪ ঘণ্টা ৩৯ মিনিট ২২ সেকেণ্ড। এই গ্রহ ৭৯ বৎসরান্তে পুনর্ব্বার পূর্ব্বস্থানে প্রত্যাগমন করেন।

গ্রহগণ গাঢ় প্রবহ বায়ু মধ্যে ভ্রমণ করাতে উহাদিগের জ্যোতিঃ রক্তিমাবর্ণ হয়। তদনুসারে মঙ্গল গ্রহের জ্যোতিঃও পৃথিবী হইতে রক্তবর্ণ দৃষ্ট হয়। তদ্ভিন্ন মঙ্গল গ্রহে কতকগুলি কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন দেখা যায়। উহাদ্বারা এই গ্রহের দৈনিক আবৃত্তিকাল নির্ণীত হয়। শুক্র ও বুধের ন্যায় ইহার গতির নিয়মের নিশ্চয়তা নাই। ইহাকে কখন কখন সূর্য্যমণ্ডলের অতি নিকটে কখন বা অতি দূরে দেখা যায়। কোন সময় সূর্য্যাস্ত কালে ইহার উদয় হয়। কখন সূর্য্যোদয় কালে ইহার অস্ত হয়। পৃথিবী-কক্ষার বহির্দ্দেশে মঙ্গলের কক্ষা অবস্থিত; এই কারণে, চন্দ্রকলার ন্যায় যথাক্রমে হ্রাস বা বৃদ্ধি দেখা যায় না। মঙ্গল গ্রহ যখন দ্বিতীয় প্রহর

* সূর্য্যসিদ্ধান্তমতে শুক্রের রাশিচক্র ভ্রমণকাল—২২৪ দিন ৪১ নাড়ী, ৫৪ বিনাড়ী, ৫·০৬ প্রাণ। অন্য একখানি শাস্ত্রমতে ৭ মাস, ১৪ দিন, ৪২ দণ্ড, ৩ পল।

† সূর্য্যসিদ্ধান্তমতে মঙ্গলের রাশিচক্র ভ্রমণ কাল ৬৮৬, ৫৯ নাড়ী, ৫০ বিনাড়ী ৫.৮৭ প্রাণ অন্য গ্রন্থে ৬৮৬ দিন, ৫৮ দণ্ড, ৯ পল, ৩০ বিপল।

রাত্রিতে আমাদিগের মস্তকোপরি দৃষ্ট হয়, তখন ইহা পৃথিবীর সমধিক নিকটবর্ত্তী হইয়া, অতিশয় উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ পায়। মঙ্গল গ্রহ স্বীয় কক্ষায় প্রতি ঘণ্টায় প্রায় ২৭৬১১ ক্রোশ ভ্রমণ করে, কিন্তু মঙ্গল অপেক্ষা পৃথিবীর গতি অতিশয় ত্বরিত বলিয়া, মঙ্গলকে সর্ব্বদাই পশ্চিম দিকে যাইতে দেখা যায়। যখন পরস্পর গতিক্রমে মঙ্গল ও পৃথিবীর মধ্যস্থলে সূর্য্যের অবস্থান হয়, তখন সূর্য্যের জ্যোতিদ্বারা মঙ্গল আচ্ছন্ন ও অদৃশ্য হয়; কিন্তু এই ঘটনার ২৮৬ দিন পূর্ব্বে সন্ধ্যার সময় ইহাকে পশ্চিম দিকে এবং ২৮৬ দিন পরে শেষ রাত্রিতে পূর্ব্বদিকে উদিত হইতে দেখা যায়। তদনন্তর সূর্য্য ও মঙ্গলের মধ্যস্থলে পৃথিবীর সমাগমে মঙ্গলকে আমরা দ্বিতীয় প্রহর রাত্রিকালে আপন মস্তকোপরি দেখিতে পাই। তখন প্রায় সমস্ত রজনী মঙ্গলকে আকাশ-পথে ভ্রমণ করিতে দেখা যায়। আবার এইরূপ ঘটনারই কিছুকাল পরে, শেষ রাত্রিতে ইহাকে পশ্চিমদিকে দেখা যায়। এই প্রকার দর্শন কাল প্রায় ২০৮ দিন। তৎপরে সূর্য্যমণ্ডলের তেজে মঙ্গল অদৃশ্য হইয়া যায়।

মঙ্গল গ্রহ নিত্যই গমনশীল হইয়া, স্বীয় কক্ষায় ভ্রমণ করাতে, পৃথিবীর ন্যায় এই গ্রহে ঋতু-পরিবর্ত্তন অনুমিত হয়। মঙ্গলের মেরু প্রদেশ সময়ে সময়ে অতিশয় উজ্জ্বলভাবে পরিদৃষ্ট হওয়াতে, জ্যোতির্ব্বিদ্গণ বিবেচনা করেন যে, পৃথিবীর ন্যায় যখন ইহার মেরুপ্রদেশ হিমানী পুঞ্জে ব্যাপ্ত হয়, তখন উক্ত ঔজ্জ্বল্য দৃষ্ট হয় এবং গ্রীষ্মারম্ভে সূর্য্যতাপ-সংযোগে ঐ তুষার রাশি যখন দ্রবীভূত হয়, তখন উক্ত ঔজ্জ্বল্যও অন্তর্হিত হয়। এইরূপ কতকগুলি কারণ বশতঃ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে, মঙ্গল গ্রহ আমাদিগের এই পৃথিবীর ন্যায় জীবনিবাস। ইহার অসম্ভাবনাই বা কি? সর্ব্বশক্তিমান্ জগদীশ্বরের সৃষ্টির কোথায় কি আছে এবং কোন স্থানে যে কি ঘটিতেছে, তাহা কে বলিতে পারে? তাঁহার গুণ তিনিই জানেন। তাঁহার শক্তি তাঁহারই জ্ঞানগোচর। আমরা অতি ক্ষুদ্র। আমাদিগের সামান্য জ্ঞানে তাঁহার কোন কার্য্যই সম্যক্ প্রকারে আলোচিত হইতে পারে না।

বৃহস্পতি।—এই গ্রহ সূর্য্য হইতে ৫২০২৭৯ মাইল দূরে অবস্থিত। এই গ্রহ অতি বৃহৎ ইহার ব্যাস প্রায় ৮৯১৭০ মাইল। পৃথিবী হইতে দৃশ্যমান ব্যাস ৩৯ বিকলা এবং সূর্য্য হইতে দৃশ্যমান ব্যাস ৩৭ বিকলা। রবিমার্গে ইহার কক্ষার অবনতি ১ অংশ ১৮ কলা ৫৬ বিকলা এবং মেরুদণ্ডের স্বমার্গে অবনতি প্রায় ৯০ অংশ। রাশিচক্র ভ্রমণকাল ৪৩৩২·৩৮৪৮০৩২ দিন * এবং সংযোগ কাল ৩৯৮·৮৬৭ দিন। সূর্য্যসিদ্ধান্তমতে বৃহস্পতির দৈনিক গতি ৪ কলা, ৫৯ বিকলা, ৯ অনুকলা; বার্ষিক মধ্যগতি রাশিচক্র ভ্রমণকালের তুল্য। বৃহস্পতির গতির স্থিরতা নাই, অর্থাৎ একরূপ গতি নহে। ইহা প্রতি রাশিতে অল্পাধিক ১ বৎসর অবস্থিতি করে। ইহার বক্রগতি ১২০ দিন এবং ৯ দিন স্থিতি; মেরুদণ্ডোপরি আবর্ত্তনকাল ৯ ঘণ্টা ৫৫ মিনিট ৩৭ সেকেণ্ড। ইহা ৮৩ বৎসরান্তে পূর্ব্বস্থানে প্রত্যাগমন করে।

বৃহস্পতি আপন কক্ষোপরি প্রায় ঋজুভাবে থাকিয়া ভ্রমণ করে, এই নিমিত্ত ইহার ঋতুপরিবর্ত্তন সম্ভব নহে। ইহার মেরুদেশ নিরবচ্ছিন্ন সূর্য্যালোক প্রাপ্ত হয়। এই গ্রহে সময়ে সময়ে নানা আকারের মলিন চিহ্ন দৃষ্ট হয়, এ সকল চিহ্নকে কেহ বা বৃহস্পতির অবয়ব কেহ বা মেঘ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। যখন বৃহস্পতিকে রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের সময় মস্তকোপরি দেখা যায়, অথবা সূর্য্যোদয়ের সময় যখন ঐ গ্রহ অস্তগত হয়, কিম্বা সূর্য্যোদয়কালে যখন ইহার উদয় হয়, সেই সেই সময় ইহা অপেক্ষাকৃত পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী হয়, তখন ইহাকে অতিশয় উজ্জ্বল দেখা

* সূর্য্যসিদ্ধান্ত মতে বৃহস্পতির রাশিচক্র ভ্রমণ কাল ৪৩৩২ দিন ১৯ নাড়ী, ১৪ বিনাড়ী, ২·০৯ প্রাণ। অন্য শাস্ত্রখানির মতে ১১ বৎসর, ১০ মাস, ১৫ দিন, ৩৬ দণ্ড, ৮ পল।

যায়। চন্দ্রকলার ন্যায় বৃহস্পতির হ্রাস বা বৃদ্ধি দৃষ্ট হয় না। ইহাতে সূর্য্যের প্রভাব অভি অল্প হইলেও চন্দ্র চতুষ্টয়ের কিরণে অন্ধকার নিবারিত হয়। ঐ সকল চন্দ্রও আমাদিগের চন্দ্রের ন্যায় গ্রহণাদি ভজনা করে।

শনি।—এই গ্রহ একটী অঙ্গুরীবিশিষ্ট। ইহা সূর্য্য হইতে ৯৫৪০৭২ মাইল দূরে অবস্থিত। ইহার ব্যাস ৭৯০৪২ মাইল। পৃথিবী হইতে দৃশ্যমান ব্যাস ১৮ বিকলা এবং সূর্য্য হইতে দৃশ্যমান ব্যাস ১৬ বিকলা। মেরুদণ্ডের অবনতি ৬০ অংশ এবং কক্ষার অবনতি ২।২৯।৫০ অংশাদি; রাশিচক্র ভ্রমণকাল ১০৭৫৯'২১৯৭১০৬ দিন * এবং সংযোগকাল ৩৭৮'০৯০ দিন। সূর্য্যসিদ্ধান্তমতে শনির দৈনিক গতি ২ কলা, ০ বিকলা, ২৩ অনুকলা, বার্ষিক মধ্যগতি রাশিচক্র ভ্রমণকালের ন্যায়। অপর শাস্ত্রখানির মতে ইহার দৈনিক মধ্যগতি ১২ বিকলা, স্থিরস্থিতি ১০ দিন ও প্রতি রাশি ভোগ কাল ২ বৎসর ৬ মাস; বক্রগতি ১৪০ দিন এবং স্থিতি ১০ দিন। মেরুদণ্ডে আবর্ত্তনকাল ১০ঘ ১৩মি ২সে; প্রত্যাগমন কাল ৪৯ বৎসর। এই গ্রহের অধিকাংশ ধর্ম্মই বৃহস্পতির তুল্য †।

শ্রীশ্যামলাল সিদ্ধান্তবাচস্পতি।

---

* সূর্য্যসিদ্ধান্তমতে শনির রাশিচক্র ভ্রমণকাল ১০৭৬৫ দিন, ৪৬ নাড়ী, ২৩ বিনাড়ী, ০'৪১ প্রাণ; অন্য শাস্ত্রখানিমতে ২৯ বৎসর, ৫ মাস, ১৭ দিন, ১২ দণ্ড, ৩০ পল।

† এতদ্ভিন্ন আর্য্যশাস্ত্রমতে চন্দ্র, রাহু ও কেতু এবং পাশ্চাত্যমতে হর্ষেল ও নেপচুন গ্রহ কয়েকটির বিবরণ বড় গোলমাল, এজন্য উভয় শাস্ত্রের মতামত মিলাইয়া ইহার পরে দেওয়া যাইবে।

প্রতিমা-গঠন

(১)
জমায়ে জোছনা, লয়ে সেই উপাদান,
কবির প্রতিভা বলে,
নিখুঁত সুন্দর ক'রে,
যতনে করহ এক মূরতি-নির্ম্মাণ;
প্রতি অঙ্গ প্রতি অংশ মাধুরী মাখান।

(২)
প্রশান্ত-সাগর বক্ষে পূর্ণিমা নিশিতে;
পড়িলে চন্দ্রিকারাশি,
যে লাবণ্য যায় ভাসি,
সে লাবণ্য চুরি করি মাখাও অঙ্গেতে;
ছুটুক লাবণ্য-ভাতি প্রতি অঙ্গ হ'তে।

(৩)
কুঞ্চিত কুন্তলগুলি দুটী গণ্ড পরে
অলসে পড়িয়া ঢলি,
বায়ুভরে দুলি দুলি,
দুটী নেত্র পাশে যেন সুখে খেলা করে;
অধরে মধুর হাসি সদা যেন ঝরে।

(৪)
যেই ছাঁচে প্রাণখানি গঠিত তোমার,
ঠিক সেই ছাঁচে ঢালি,
ঠিক সেই মত করি,
গঠহ যতন করি পরাণ তাহার;
তোমার প্রাণের ছবি (হয়) যেন প্রাণ তার।

(৫)
যা কিছু পরাণ তব এ সংসারে চায়,
যে আশা, যে অভিলাষ,
যে আকাঙ্ক্ষা, যে পিয়াস,
প্রাণে বাঁধা আছে তব, সেই সমুদায়,
ঢালি দেহ-প্রাণে তার সম্পূর্ণ মাত্রায়।

(৬)
বাসনার বলে গঠি এমনি মূরতি,
মনের মন্দিরে তারে,
রাখহ যতন ক'রে,
প্রেমাঞ্জলি দেহ পদপ্রান্তে দিবা রাতি,
প্রেমের প্রতিমাখানি প্রেমময়ী সতী।

(৭)
সংসারের অন্ত হ'তে ছিড়িয়া পরাণে,
বাসনা সফল তব,—
প্রাণের কামনা সব,
কেন্দ্রীভূত কর সেই প্রতিমা চরণে;
(তার) প্রেম-তৃষা বিনা প্রাণ যেন নাহি জানে।

(৮)
সদা সে প্রতিমা খানি রবে তব বুকে;
যাবে না কাহার(ও) কাছে,
ফিরিবে না কার(ও) পাছে,
তোমার বুকেতে রবে চেয়ে তব মুখে;
মধুর মিলনে প্রাণ সদা রবে সুখে।

(৯)
যে তরঙ্গ তব প্রাণে উঠিবে যখন,
তার প্রাণ সে তরঙ্গে,
তখন(ই) নাচিবে রঙ্গে;
তোমার সুখের ছবি দেখাবে বদন;
অতৃপ্তি, অপ্রাপ্তি প্রাণে না পাবে কখন!

(১০)
এ হেন প্রতিমা যদি করিতে গঠন
পার নর এ সংসারে,
বাসনা সংযম ক'রে;
তবে এ সংসার হবে সরগ সমান;
তবে এ সংসার মাঝে শান্তি পাবে প্রাণ!

শ্রীসুরেশচন্দ্র রায় বি, এ,

গঙ্গোত্তরী ও গোমুখী

গঙ্গোত্তরী আমাদের একটি প্রাচীন তীর্থ। গোমুখী ও হরিদ্বার যেরূপ পুণ্যসলিলা ভাগীরথীর কৃপায় মহাতীর্থমধ্যে পরিগণিত হইয়াছে, গঙ্গোত্তরীও সেইরূপ ভাগীরথীর কৃপাতেই পবিত্র তীর্থে পরিগণিত। গড়োয়াল প্রদেশের অন্তর্গত হিমালয়-শিখর-মালার যে স্থান হইতে ভাগীরথী নির্গত হইয়াছে, তাহার দক্ষিণ পশ্চিমে ১০ মাইল দূরে একটি ক্ষুদ্র শৃঙ্গ আছে। শৃঙ্গটি ক্ষুদ্র হইলেও উচ্চে প্রায় ২২০০০ ফুট হইবে। প্রবাদ এই যে, এই শৃঙ্গের উপরিভাগে একখানি বৃহদাকার প্রস্তরের উপর বসিয়া মহারাজ ভাগীরথ গঙ্গানয়ন-কামনায় শিবের তপস্যা করিয়াছিলেন। পরে যখন সিদ্ধকাম হইয়া, গঙ্গা সমভিব্যাহারে এই শৃঙ্গের পাদদেশ দিয়া গমন করেন, তখন হইতে এই স্থান তীর্থ বলিয়া গণ্য হয়। ভাগীরথী এই স্থান হইতে ক্রমশঃ নিম্ন ভূমিতে অবতরণ করিতেছেন বলিয়া, এই স্থানের নাম গঙ্গোত্তরী বা গঙ্গাবতারী।

হিমালয়ের যে প্রদেশে গঙ্গোত্তরী তীর্থ অবস্থিত, উহা গাড়োয়ালের অন্তর্গত তিহিরি প্রদেশের তাকুনৌর পরগণা-ভুক্ত। যে শৃঙ্গের উপর বসিয়া মহারাজ ভগীরথ মহাদেবের তপস্যা করেন, উহা ভাগীরথীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। তীর্থের নামানুসারে এই শৃঙ্গকেও গঙ্গোত্তরী শৃঙ্গ বলে। গঙ্গোত্তরী তীর্থের উপরেই ভাগীরথীতীরে গঙ্গা দেবীর একটি মন্দির আছে; এই মন্দিরটীও গঙ্গোত্তরী মন্দির বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই মন্দির ব্যতীত গোমুখীর নিকট গঙ্গাতীরে আর কোন মন্দির নাই। গঙ্গাতীরে যতগুলি মন্দির আছে, তাহা গণনা করিতে হইলে, সর্ব্বপ্রথমে গঙ্গোত্তরী মন্দিরের নাম করিতে হয়। কেদারনাথ ও বদ্রিনাথের মন্দির আরও উর্দ্ধে বটে, কিন্তু ভাগীরথী তীরে নহে। গঙ্গোত্তরীরর মন্দির গঙ্গাতীরস্থ যাবতীয় মন্দিরের মধ্যে সর্ব্ব প্রথম হইলেও ইহা প্রাচীন মন্দির নহে। বর্ত্তমান ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে গাড়োয়ালের গুর্খলী জাতির আধিনায়ক অমর সিংহ থাপাকর্ত্তৃক এই মন্দিরটি নির্ম্মিত হয়। অমর সিংহ মন্দির নির্ম্মাণে কৃত-সংকল্প হইয়া স্থান অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন; পরে জন-প্রবাদ এবং সন্ন্যাসীগণের বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া, যে প্রস্তরের উপর মহারাজ ভগীরথ বসিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন, সেই বৃহদাকার প্রস্তর-খণ্ডের উপরেই মন্দির নির্ম্মাণ করেন। প্রস্তরখানি চতুষ্কোণ, সুতরাং মন্দিরের তলদেশও চতুষ্কোণ; কিন্তু মন্দির যতই উর্দ্ধে উঠিয়াছে, ততই গোল হইয়া, শেষে কাবুলিয়ানদিগের টুপির ন্যায় চূড়াকার প্রাপ্ত হইয়াছে। এ প্রদেশে পর্ব্বতের উপরিস্থ অন্যান্য সামান্য সামান্য মন্দিরগুলি যে প্রণালীতে রচিত, ইহার গঠন প্রণালীও তদ্রূপ। মন্দিরটি উচ্চে ১২ ফুট মাত্র, কারুকার্য্য বিশেষ কিছুই নাই, কেবল রক্তবর্ণ মৃত্তিকার রঙ্গে দেওয়ালের গাত্রে নানাবিধ চিত্র বিচিত্র করা আছে। মন্দিরের পূর্ব্বদিকে গোমুখীর অভিমুখে একটি বারাণ্ডা; বারাণ্ডার ছাদ প্রস্তরময়। এই বারাণ্ডার শেষে মন্দির-প্রবেশের পূর্ব্বমুখী দ্বার। প্রবেশ-দ্বারের ঠিক্ সম্মুখে এই ধরণের আর একটি ক্ষুদ্র মন্দির; এই মন্দিরে ভৈরবজীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। কাশীর কালভৈরব যেরূপ সমগ্র কাশী ও বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের রক্ষা-কর্ত্তা, এই ভৈরবজীও সেইরূপ গঙ্গোত্তরী-মন্দিরের রক্ষা-কর্ত্তা বলিয়া প্রসিদ্ধ। গঙ্গোত্তরী-মন্দিরমধ্যে রৌপ্যময়ী গঙ্গা-প্রতিমা ও বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি দেবতার প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি; এতদ্ব্যতীত মহারাজ ভগীরথেরও একটি প্রস্তর-মূর্ত্তি আছে। গঙ্গামন্দির ও ভৈরবজীর

মন্দির এক চত্বরেই অবস্থিত। এই চত্বরটির চারিদিক প্রস্তরময় প্রাচীরে বেষ্টিত। এই প্রাচীর কোন প্রকার চতুষ্কোণ অথবা গোলাকার প্রস্তরে গাঁথা নহে। সামান্যতঃ যেরূপ প্রস্তর-খণ্ড পাওয়া যায়, তাহাই গাঁথিয়া প্রাচীর নির্ম্মিত হইয়াছে। চত্বরের অন্তর্গত সমস্ত স্থান ও মন্দিরের অভ্যন্তর সমতল প্রস্তর খণ্ডদ্বারা আবৃত। ভৈরবজীর মন্দিরের নিকটে একটি সুন্দর পরিষ্কার বাড়ী। বাড়ীখানি ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু সকল প্রকার সুবিধা-সম্পন্ন। এই বাড়ীতে দেবীর পূজক ব্রাহ্মণেরা অবস্থিতি করেন। প্রাচীরের বাহিরেও কতকগুলি কাষ্ঠ-নির্ম্মিত গৃহ আছে; এই সকল গৃহে তীর্থযাত্রী ও সন্ন্যাসীরা বাস করে। মন্দিরের নিকটস্থ পর্ব্বতে অনেক গুহা আছে। এই সকল গুহাতেও সন্ন্যাসীদের বাস। এই সকল গুহা পর্ব্বতের গাত্রস্থিত গহ্বরের ন্যায় নহে, একটা বৃহৎ শিখরের উপরিভাগে খানিকটা ঝুঁকিয়া পড়িলে নিম্নস্থ ভূমির উপর যেরূপ ছাদের ন্যায় আবরণ পড়ে ও অপর কয়েকদিকে পর্ব্বতের পার্শ্বদেশ প্রাচীরের মত থাকিলে তদ্দেশ যেরূপ গৃহের ন্যায় বোধ হয়, ইহাও সেইরূপ গুহা।

গঙ্গোত্তরীর মন্দির ৩০ হইতে ৩১ ডিগ্রী উত্তর নিরক্ষান্তরে ও ৭৮ হইতে ৭৯ পূর্ব্বে দ্রাঘিমায় অবস্থিত এবং সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে ১০৩২০ ফুট উচ্চ।

গঙ্গোত্তরীর চতুর্দ্দিকস্থ প্রাকৃতিক দৃশ্য ও পরম রমণীয়। যে দিকেই চাহিয়া দেখ, দেখিতে পাইবে, সম্মুখে ছোট বড় শিখরমালা তুষারময় মুকুটে মস্তকাচ্ছাদন করিয়া, গগন স্পর্শ করিবার জন্যই যেন শৃঙ্গ বিস্তার করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। শিখরের পাদদেশে শ্বেত, পীত, ধূসর, কৃষ্ণ ও নীল বর্ণের প্রস্তর রাশি স্তূপাকার হইয়া হিমজলে বিগতমল হইয়া চক্‌মক্ করিতেছে, কোথাও বা স্তূপের উপর নানা বর্ণের কুসুম প্রস্ফুটিত হইয়া দিক্ আলো করিতেছে। প্রস্তররাশির মধ্যস্থ বৃহৎ বৃহৎ গর্ত্ত হইতে দেবদারু, ঝাউ, প্রভৃতি বৃক্ষ সকল মস্তক-উত্তোলনপূর্ব্বক পর্ব্বতের শিখরমালার সহিত স্পর্দ্ধা করিতেছে। স্থানে স্থানে পর্ব্বতগাত্র হইতে বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড খসিয়া পড়িয়া ভূমির বন্ধুরতা ও দুর্গমতা আরও বৃদ্ধি করিয়াছে; কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের প্রস্তরখণ্ড ইতস্ততঃ ছড়াইয়া পড়াতে, যে শোভটুকু বাড়িয়াছে, সে টুকু বড় সুন্দর! কোন কোন শিখরের উপর কতকগুলি পুরাতন ঝাউ পরস্পর মিলিত হইয়া, তলদেশ মনোরম সুশীতল ছায়ায় আবৃত করিয়াছে এবং বায়ুভরে আন্দোলিত হইয়া, ঝটিকা গর্জ্জনের ন্যায় এক প্রকার ভীষণ শব্দ উৎপন্ন করিতেছে। এই শব্দ নদী-বাহিত প্রস্তরখণ্ডের পতন শব্দের সহিত মিলিত বহুদূর হইতে পথিকের মনে স্থানের নির্জ্জনতা এবং ভীষণতার আভাষ প্রদান করিতেছে। গঙ্গোত্তরী পর্ব্বতে দাঁড়াইয়া যে দিকে চাহিয়া দেখ, এক মাত্র পূর্ব্বদিক ব্যতীত আর সকল দিকেই অত্যুচ্চ তুষারাবৃত শিখরমালায় দৃষ্টিপথ রুদ্ধ হইবে। পূর্ব্বদিকে দৃষ্টিপাত করিলে, কতকদূর পর্য্যন্ত তুষারশূন্য পর্ব্বতমালা ও তদুপরিস্থ ঝাউ ও দেবদারুর কুঞ্জ দেখিতে পাওয়া যায়। তৎপরে এই সকল বৃক্ষ ও পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্য দিয়া বহু দূরে দৃষ্টি করিলে, রুদ্র-হিমালয় নামক পর্ব্বতের সুধাধবল শৃঙ্গচতুষ্টয় গগন ভেদ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, দেখা যায়। অত্যধিক হিমপাত-নিবন্ধন পর্ব্বতের যে সকল স্থানে বৃক্ষলতাদি জন্মিতে পারে না, গঙ্গোত্তরী সে প্রদেশের অন্তর্গত নহে, সুতরাং এ প্রদেশে তরু গুল্মলতা প্রচুর না থাকিলেও অভাব নাই।

ফ্রেজার নামক জনৈক ব্যক্তি হিমালয় প্রদেশের অত্যুচ্চ ও দুর্গম স্থান সকলের বিষয় অনুসন্ধান করিবার জন্য ভ্রমণে বহির্গত হইয়া, এক সময়ে গঙ্গোত্তরী প্রদেশে উপস্থিত হন। গঙ্গোত্তরী সম্বন্ধে তিনি যে সকল বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন; তাহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, এই সকল স্থান এক প্রকার চিরতুষারাবৃত হইলেও, এত উচ্চ স্থানেও গ্রামের পর গ্রাম দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল গ্রামে অবশ্যই অধিবাসীর সংখ্যা অল্প; কিন্তু সকল গ্রামেরই অবস্থা কিছু নূতন ধরণের ও অবিরাম বরফ-পতনের নিমিত্ত ভয়ানক। ফ্রেজার আরও বলেন যে,

যদিও এ প্রদেশ এতদূর শীতল তথাপি এদেশে গমের চাষ বেশ ভালরূপ হইয়া থাকে ; আকরোট, বাদাম প্রভৃতির গাছ উত্তমরূপে জন্মে। নানাবিধ ফুলের গাছও আছে। ফ্রেজারের বর্ণনানুসারে গঙ্গোত্তরী পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী স্থানের মোটামুটী অবস্থা এইরূপ। পরে তিনি যখন নিজ গঙ্গোত্তরী পর্ব্বতে যাইবার জন্য উদ্যোগ করেন, তখন তাঁহার পথ-প্রদর্শক তাঁহাকে ভয় দেখাইয়া, সে উদ্দেশ্য হইতে বিরত করিতে চেষ্টা করে। ফ্রেজার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, সে বলে যে, ওদিকে পর্ব্বত হইতে এক প্রকার বিষাক্ত বায়ু প্রবাহিত হইয়া থাকে ; এই বায়ুতে পথিকেরা চেতনাশূন্য ও গতিহীন হইয়া পড়ে। ফ্রেজার কারণ শুনিলেন বটে, কিন্তু গমনে বিরত না হইয়া, পথ-প্রদর্শকের সহিত অগ্রসর হইলেন। কিয়দ্দূর গিয়া দেখিলেন যে, তখন যে স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন, তাহা কতকাংশে উদ্ভিজ্জ-জগতের বহির্ভাগে, ছোট ছোট গুল্ম পর্য্যন্তও সেখানে হয় না; কিন্তু তুষারক্ষেত্রের মধ্যে মধ্যে নানা বর্ণের কুসুমকুঞ্জ দেখিতে পাওয়া যায়। পথ-প্রদর্শকেরা এই স্থান হইতেই বিষাক্ত বায়ুর আশঙ্কা করিতে থাকে। এখানে আসিয়া ফ্রেজার নিজের পথ-প্রদর্শকের আশঙ্কা দেখিয়া বায়ু-পরীক্ষা করতঃ যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা এইরূপ—"আমার বোধ হয় না যে, একমাত্র পর্ব্বতের এত উচ্চ স্থলে আসাতেই বক্ষঃস্থল এতদূর পীড়িত বলিয়া বোধ হইবে। বোধ হয়, এই উচ্চস্থানে উঠিবার জন্য যে ক্লেশ পাইতে হইয়াছে এবং পথ যেরূপ ভয়ানক তাহতে স্বভাবতই মানুষে ওরূপ পীড়িত হইতে পারে। এখানকার লোকের বিশ্বাস যে, কোন বিষাক্ত ফুলের গন্ধে বাতাস দূষিত হইয়া যায় ; কিন্তু আমি দেখিতেছি যে, এখানকার অধিকাংশ ফুলের কোনও গন্ধ নাই, আর এসময়ে অধিক ফুলও ফোটে না। তৎপরে আমি বায়ু পরীক্ষা করিয়া দেখি যে, বায়ুতে আর কিছুই নাই, কেবল নিম্ন প্রদেশের বায়ু অপেক্ষা এখানকার বায়ু কিছু শুষ্ক ও অতিশয় ঠাণ্ডা। এইরূপে আমরা ক্রমশঃ ঘুরিতে ঘুরিতে ব্যোমেশ্বর পর্ব্বতে উপস্থিত হইলাম। এখানে বাতাস আরও ঠাণ্ডা ও কোন প্রকার উদ্ভিদ্ নাই।" এইখান হইতে ক্রমশঃ নামিয়া নানাবিধ দুঃখ-ভোগের পর তাঁহারা গঙ্গোত্তরীতে উপনীত হন। ফ্রেজার বলেন—"এতদিন যত ক্লেশ সহ্য করিয়াছি, গঙ্গোত্তরীর প্রাকৃতিক শোভা দেখিয়া সে কষ্ট ভুলিয়া গেলাম। এস্থানে আসিলে স্বভাবের বিপুল শোভা-দর্শন করিয়া কবির কবিত্ব, ভাবুকের ভাব, ভক্তের ঈশ্বর-ভক্তি আপনি উথলিয়া উঠে ; তাহাতে আবার এস্থান হিন্দুদিগের একটি পবিত্র তীর্থ। এখানকার শোভা ও হিন্দুদের হৃদয়ের ধর্ম্মভাব দেখিলে মন নাচিয়া উঠে। গঙ্গোত্তরীর শোভা বাস্তবিকই এইরূপ হইবে ; ফ্রেজারের বর্ণনা পাঠ করিলে ইহাতে আর কোন সন্দেহ থাকে না। গোমুখীর নিম্নেই গঙ্গোত্তরী আমাদের একটি পবিত্র তীর্থ। ইহার নিকটে ভাগীরথীর গতি ও অবস্থা কিরূপ ইহা জানিবার জন্য বোধ হয় পাঠকমাত্রেরই কৌতূহল হইয়া থাকিবে ; আর বাস্তবিকই পৃথিবীর বড় বড় নদী, পর্ব্বত, দেশাদির বিবরণ পাঠ করিতে মনে যেরূপ কৌতূহল জন্মে দর্শনে তৃপ্তিও তদনুরূপ হয়।

গঙ্গার উৎপত্তি স্থল নির্ণয় করিবার জন্য বহুদিবসাবধি চেষ্টা হইতেছে ; কিন্তু কেহই আজিও গোমুখীর অপর পারে উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। সর্ব্ব প্রথমে ১৬শ শতাব্দীর শেষভাগে মোগল সম্রাট আকবর একদল লোককে গোমুখী ও তৎসন্নিহিত ভূভাগের বিষয় অবগত হইবার জন্য প্রেরণ করেন। এই দল গোমুখীতে উত্তীর্ণ হইয়া, যাহা যাহা দেখিয়া আসিয়াছিল, তাহা সবিশেষ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহাতে গঙ্গোত্তরীর কথার উল্লেখ নাই। তৎপরে ইংরাজাধিকারে অনেকেই গঙ্গার উৎপত্তিস্থল অনুসন্ধানের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন ; কিন্তু অনেকেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ইহাঁদের মধ্যে হার্ব্বার্ট ও হজশন্ সাহেব যে সকল বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা অন্যান্যের অপেক্ষা আদরণীয় ; কিন্তু গঙ্গার গতি ও শাখাদির বিবরণ, যাহা তাঁহারা লিখিয়া গিয়াছেন, এক্ষণে অন্যান্য ভ্রমণকারীর অনুসন্ধানে তাহার অধিকাংশই

তর্পণ

"তর্পণ" বলিলে আমরা সাধারণতঃ "মৃত পিতৃপুরুষগণের উদ্দেশে, তাঁহাদের তৃপ্ত্যর্থ জলদানরূপ কার্য্য" বুঝিয়া থাকি, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। দেবর্ষি পিতৃমাতৃমাসবাদি ও সৃষ্ট যাবতীয় পদার্থের তৃপ্ত্যর্থ উৎসর্গীকৃত জলাঞ্জলির নাম তর্পণ। তর্পণ হিন্দুর নিত্য কার্য্য, আবার বিশেষ বিশেষ সময়েও বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানের সহিত তর্পণ করিবার বিধি আছে। তর্পণ তিলোদকদ্বারাও হইয়া থাকে এবং কেবল জলাঞ্জলিতেও হইয়া থাকে। বিশেষ বিশেষ সময়ে যে সকল তর্পণ করিবার বিধি আছে, তাহাতে তিলোদকদ্বারা তর্পণ অবশ্য কর্ত্তব্য।

নিত্য তর্পণ প্রত্যহ স্নানের পর করিতে হয়। এ তর্পণ তিলের একান্ত আবশ্যকতা নাই। ভীষ্মাষ্টমীর দিন, যমতর্পণের দিন, গ্রহণ-স্নানের দিন, পুণ্য-স্নানের দিন, তীর্থস্নানের দিন ও প্রেত-পক্ষে প্রত্যহ তর্পণকালে তিলোদকের একান্ত প্রয়োজন। গৌণ চান্দ্র ভাদ্র কৃষ্ণা প্রতিপদ হইতে মহালয়া অমাবস্যার দিন পর্য্যন্ত এক পক্ষ সময়কে প্রেতপক্ষ বলে। প্রেত পক্ষে হিন্দুরা প্রায় প্রত্যেকেই তর্পণাদি করিয়া থাকেন। এই ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতার স্রোতে পড়িয়া, যাহারা পিতামাতার শ্রাদ্ধ করিতে পরাঙ্মুখ হইয়া থাকে, দেখা গিয়াছে, তাহাদের মধ্যেও অনেকে এই প্রেতপক্ষের কয়েক দিবস যথার্থ ভক্তিভরে পিতৃতর্পণাদি করিয়া থাকে। আর "পিতাই স্বর্গ, পিতাই ধর্ম্ম, পিতাই পরম তপস্যা, পিতার তৃপ্তি হইলেই সর্ব্বদেবতার তৃপ্তি হইবে" বলিয়া যাহার মনে বিশ্বাস আছে, তাহার কথা বলা বাহুল্যমাত্র।

তর্পণ হিন্দুর নিত্যকার্য্য হইলেও ইহাতে সর্ব্ব সাধারণের সমান অধিকার নাই। যাহাদের পিতা জীবিত আছেন ও যাহাদের উপনয়ন হয় নাই তাহাদের এবং স্ত্রী ও শূদ্রের তর্পণমন্ত্রে অধিকার নাই। স্ত্রী ও শূদ্রেরা তর্পণ কার্য্য করিতে পারেন, কিন্তু মন্ত্রপাঠ করিতে হইবে একজন ব্রাহ্মণকে ; তাঁহারা কেবল জলাঞ্জলিটি ঢালিয়া দিবেন মাত্র। যে বিধবার পুত্রপৌত্রাদি নাই, সেই বিধবাই কেবল মন্ত্র-পাঠপূর্ব্বক স্বামী ও স্বামীর ঊর্দ্ধতন দুইটি পুরুষকে (অর্থাৎ স্বামীকে, শ্বশুরকে ও শ্বশুর-পিতা দাদাশ্বশুরকে) তর্পণ করিতে পারেন,—

"তর্পণং প্রত্যহং কার্য্যং ভর্ত্তুঃ কুশতিলোদকৈঃ।
তৎপিতুস্তৎপিতুশ্চাপি নামগোত্রাদিপূর্ব্বকং ॥"

কাশীখণ্ড।

দ্বিজগণের পক্ষে তর্পণকার্য্য প্রত্যহ করা আবশ্যক ; কারণ, ধর্ম্মশাস্ত্র প্রয়োজকগণের মধ্যে শাতাতপ নিজ সংহিতায় লিখিয়া গিয়াছেন,—

"তর্পণঞ্চ শুচিঃ কুর্য্যাৎ প্রত্যহং স্নাতকোদ্বিজঃ।
দেবেভ্যশ্চ ঋষিভ্যশ্চ পিতৃভ্যশ্চ যথাক্রমম্ ॥"

শাতাতপ-সংহিতা।

এইবিধি অমান্য করিলে যে ধর্ম্মহানি ঘটে, তাহা আর বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না ; কারণ, যে মন্বত্রি প্রভৃতি বিংশতিজন ধর্ম্ম-শাস্ত্র-প্রয়োক্তার বিধি অমান্য করিলে, ধর্ম্মহানি ঘটে শাতাতপ সেই বিংশতি জনের একজন। এতদ্ব্যতীত যে স্নান ভিন্ন দেহশুদ্ধি, চিত্তশুদ্ধ হয় না, তর্পণ সেই স্নানের একটি অঙ্গ, সুতরাং অঙ্গহীন করিয়া কেবলমাত্র জলাবগাহন করিলেই, স্নান সিদ্ধ হয় না,—

"নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং ত্রিবিধ্যং স্নানমুচ্যতে।
তর্পণন্তু ভবেত্তস্য অঙ্গত্বেন ব্যবস্থিতং॥"

ব্রহ্মপুরাণ।

নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য এই ত্রিবিধ স্নানেরই তর্পণ একটি অঙ্গ স্বরূপ; অতএব স্নানকালে তর্পণ না করিলে যে অঙ্গহানি হয়, ইহা স্বীকার্য্য এবং সেই সঙ্গে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, অঙ্গহীন কার্য্যে সম্যক ফল হয় না, বরং দোষ হয়।

তর্পণ না করিলে বিশেষ দোষ ঘটে। যোগিশ্রেষ্ঠ যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়া গিয়াছেন,—

"নাস্তিক্যভাবাদ্যশ্চাপি ন তর্পয়তি বৈসুতঃ।
পিবান্তি লেহনিঃস্রাবং পিতরো বৈ জলার্থিনঃ॥"

যোগি-যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

যদি পুত্র নাস্তিক্যভাববশতঃ তর্পণ না করে, তাহা হইলে তাহার জলার্থী পিতৃগণ লালা পান করিয়া থাকেন।

তৎপরে তর্পণ করিবার যে সকল নিয়ম আছে, তাহাও যে বিশেষ কষ্টসাধ্য, তাহা নহে। দ্বিজাতিগণ স্নান করিয়া নিত্য তর্পণ করিবেন। নিত্য তর্পণাভিলাষী সামবেদী ব্রাহ্মণগণ প্রাতঃসন্ধ্যা করিবার সময়ে সূর্য্যোপস্থানের মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক "ওঁ নমো ব্রহ্মণে" ইত্যাদি মন্ত্রে জলাঞ্জলিগুলি প্রদান করিয়া তর্পণ করিবেন, আর যদি সকালে স্নান করিবার সুবিধা না হয়, তাহা হইলে মধ্যাহ্ন-সন্ধ্যায় (অর্থাৎ চতুর্থ যামার্দ্ধে যখন মধ্যাহ্নসন্ধ্যা করিবেন, তখন) ঐ সকল মন্ত্রের পর তর্পণ করিবেন। দ্বিতীয়তঃ নদীতে তর্পণ করিতে হইলে, নাভিজলে দাঁড়াইয়া তর্পণ করা উচিত;—

"এবং স্নাত্বা পিতৃন্ দেবান্ মনুষ্যাংস্তর্পয়েন্নরঃ।
নাভিমাত্র জলে স্থিত্বা চিন্তয়েদুর্দ্ধমানসঃ॥"

গারুড়ে ২১৫ অধ্যায়।

নদীতে তর্পণ করিতে হইলে স্নান করিয়া আর্দ্রবস্ত্রেই (নাভি জলে দাঁড়াইয়া) তর্পণ করা আবশ্যক, আর যদি স্থলে উঠিয়া তর্পণ করা আবশ্যক হয়, তবে শুষ্ক শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করা উচিত;—

"স্নাতশ্চার্দ্রবাসা দেবপিতৃতর্পণমন্তঃস্থ এব কুর্য্যাৎ,
পরিবর্ত্তিতবাসাশ্চেৎ তীরমুত্তীর্য্যেতি॥"

বিষ্ণু-সংহিতা।

তীর্থস্নানে গমন করিয়া তর্পণ করিবার সময়, যদি শুষ্কবস্ত্র পরিহিত থাকে, তবে একপদ জলমধ্যে রাখিয়া তর্পণ করিবে। স্থলে তর্পণ করিতে হইলে, কুশের উপর তর্পণ-জল নিক্ষেপ করা উচিত। উদ্ধৃত জলে তর্পণ করিতে হইলে, যে পাত্র করিয়া জল আনীত হইয়াছে, তাহা হইতে অন্য এক শুদ্ধ পাত্রে ঢালিয়া লইবে এবং তর্পণ হইয়া গেলে, সেই জল কোন জল পূর্ণ গর্ত্তে নিক্ষেপ করিবে, স্থলে নিক্ষেপ করিবে না।

রবি ও শুক্রবারে, সপ্তমী ও দ্বাদশী তিথিতে, রাত্রিতে, শ্রাদ্ধ দিবসে, জন্মদিনে ও সংক্রান্তিতে তিল-তর্পণ করিতে নাই,—

"রবিশুক্র দিনেচৈব দ্বাদশ্যাং শ্রাদ্ধবাসরে।
সপ্তম্যাং জন্মদিবসে ন কুর্য্যাত্তিল-তর্পণম্॥"

স্মৃতিবচনসংগ্রহঃ।

"সংক্রান্ত্যাং নিশি সপ্তম্যাং রবিশুক্রদিনে তথা।
শ্রাদ্ধে জন্মদিনে চৈব ন কুর্য্যাত্তিল-তর্পণং॥"

মৎস্যপুরাণ।

কিন্তু উত্তরায়ণ বা দক্ষিণায়ণ কিম্বা বিষুব-সংক্রান্তি হইলে, গ্রহণের দিন, গঙ্গায়, প্রেতপক্ষে, যুগাদ্যদিনে, মৃতবাসরে, তীর্থে ও দাহান্তে নিষিদ্ধ দিনেও তিল-তর্পণ করিতে কোনরূপ দোষ নাই,—

"অয়নে বিষুবেচৈব সংক্রান্ত্যাং গ্রহণেষুচ।
উপাকর্ম্মণি চোৎসর্গে যুগাদ্যো মৃতবাসরে॥
তীর্থে তিথিবিশেষে চ কার্য্যং প্রেতে চ সর্ব্বদা।
সূর্য্য শুক্রাদিবারেঽপি ন দোষস্তিলতর্পণে॥"

স্মৃতিবচন সংগ্রহঃ।

"তীর্থে তিথিবিশেষেচ গঙ্গায়াং প্রেতপক্ষকে।
নিষিদ্ধেঽপি দিনে কুর্য্যাৎ তর্পণং তিলমিশ্রিতং॥"

স্মৃতিধৃত মরীচি-বচন।

তর্পণের জল আধার হইতে এক বিঘৎ উচ্চ করিয়া ঢালিতে হয়। বৃষ্টিকালে আবৃত স্থানে তর্পণ করা উচিত; কারণ, তর্পণের জন্য গৃহীত জলে বৃষ্টি-বিন্দু পড়িলে সে জল দূষিত হয়। জলে দাঁড়াইয়া তর্পণ করিতে হইলে, বাম হস্তের কফোণীর (কনুইর) নিকট যে স্থান লোমশূন্য, সেই স্থলে তিল রাখিয়া, দক্ষিণ করের মধ্যমাঙ্গুলিদ্বারা ভিজাইয়া তুলিয়া লইতে হয়। দুই অঙ্গুলি দিয়া চিম্‌টাইয়া তিল তুলিতে নাই। মুক্তা, স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র পাত্রে তর্পণ করা প্রশস্ত। তিল যদি না পাওয়া যায়, তবে তিলের প্রতিনিধিস্বরূপ স্বর্ণ অথবা রজত-ধৌত জল ব্যবহৃত হইতে পারে; তাহারও অভাব ঘটিলে কুশধৌত জলে তর্পণ করিতে পারা যায়,—

"তিলানামপ্যভাবে তু সুবর্ণরজতান্বিতং।
তদভাবেঽপি সিঞ্চেত্তু দর্ভৈর্মন্ত্রেণ চাপ্যথ॥"

যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা।

তর্পণের তিল মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে নাই। কোন শস্যের বিনিময়ে সংগ্রহ করিতে হয়। প্রথমে দেবতর্পণ, তৎপরে মনুষ্যতর্পণ ও দক্ষিণার পূর্ব্বে পিতৃতর্পণ করিতে হয়;—

"প্রাগগ্রেষু সুরাস্তর্প্যাঃ মনুষ্যাংশ্চৈবমধ্যতঃ।
পিতৃংশ্চ দক্ষিণাগ্রেষু দদ্যাদিতি জলাঞ্জলিম্॥"

অগ্নিপুরাণ।

দেবতর্পণের জল পূর্ব্ব মুখে বসিয়া দৈবতীর্থ (বৃদ্ধাব্যতীত অন্য করাঙ্গুলি সকলের অগ্রভাগ) দিয়া ঢালিতে হয়। মনুষ্যতর্পণের জলপশ্চিম মুখে (সামবেদী ভিন্ন অন্য বেদীরা উত্তর মুখে) মালার ন্যায় যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া মনুষ্য বা কায়তীর্থ (কনিষ্ঠা ও অনামিকার মূলদেশ) দিয়া ঢালিতে হয়, ঋষিতর্পণের জল, পূর্ব্ব মুখে স্বাভাবিক আকারে যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া দৈবতীর্থ দিয়া ঢালিতে হয় এবং পিতৃতর্পণ, ভীষ্মতর্পণ, যমতর্পণ ও অন্যান্য তর্পণের জল, দক্ষিণ মুখে বিপরীতোত্তরীয় করিয়া (দক্ষিণ স্কন্ধে পৈতা রাখিয়া বাম হস্তের নিম্নদিয়া ঘুরাইয়া লইয়া) পিতৃতীর্থ (অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর মধ্যে করতলের পার্শ্ব) দিয়া ঢালিতে হয়।

এই গেল তর্পণের বিধি ব্যবস্থাদি। এক্ষণে তর্পণটি কি তাহাই দেখা যাউক।

ইতিপূর্ব্বে আমরা যোগী যাজ্ঞবল্ক্যের যে বচন উদ্ধৃত করিয়া, তর্পণ না করার দোষ দেখাইয়াছি,

তাহা হইতে বুঝা যায় যে, যদিও দেবর্ষিপিতৃমানবাদির প্রীত্যর্থ তর্পণ করিতে হয়, তথাপি পিতৃপুরুষগণের প্রীতিবর্দ্ধন করাই তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য।

যাহা হউক, হিন্দুর সন্তান নিজ পিতৃপুরুষের তৃপ্ত্যর্থ উদকাঞ্জলি দিতে বসিয়া, প্রথমে আদিদেব ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র ও প্রজাপতিকে তৃপ্ত করিবার জন্য এক এক অঞ্জলি জল দিয়া থাকেন। তাহার পর তিনি একটি মন্ত্র পড়েন—

"দেবাযক্ষাস্তথা নাগাগন্ধর্ব্বাপ্সরসোঽসুরাঃ।
ক্রূরাঃ সর্পাঃ সুপর্ণাশ্চ তরবোজৃম্ভগাঃ খগাঃ॥
বিদ্যাধরাজলাধারাস্তথৈবাকাশগামিনঃ।
নিরাহারাশ্চ যে জীবাঃ পাপে ধর্ম্মেরতাশ্চ যে॥
তেষামাপ্যায়নায়ৈ তদ্দীয়তে সলিলং ময়া।

"দেবগণ, যক্ষগণ, নাগগণ, গন্ধর্ব্বগণ, অপ্সরগণ, অসুরগণ, ক্রূর সর্পগণ, সুন্দর পত্রবান তরুসকল, সরীসৃপসকল, পক্ষিগণ, বিদ্যাধরগণ, জলাধারগণ (জলচরজীবসমূহ) আকাশগামিগণ, নিরাহারী জীবগণ, পাপিগণ, ধার্ম্মিকগণ, প্রভৃতি সকলেরই তৃপ্ত্যর্থ আমি এই জল দিলাম।" এই বলিয়া উদকাঞ্জলি নিক্ষেপ করিলেন! ভাই! হিন্দুভিন্ন এরূপ নিস্বার্থ কর্ম্মানুষ্ঠান আর কাহারও নিকট পাইবে না। সভা-সমাজে তর্পণ বিধিকে নিরর্থক বলিয়া উপহাসই করুন, আর হিন্দুর কল্পিত কথা বলিয়াই উড়াইয়া দিন, ইহাদ্বারা যে মনুষ্যসমাজে বিন্দুমাত্র শিক্ষা হয় না বা উপকার হয় না, তাহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। তাঁহারা সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখেন না বলিয়া, ইহাকে নিরর্থক বলিয়া থাকেন। প্রথমতঃ তাঁহাদের কথা স্বীকার করিলেও, আমরা দেখিতে পাই যে, হিন্দুর-কল্পনা করিয়া মৃত পিতৃপুরুষগণের তৃপ্ত্যর্থ যে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয়, তদ্বারা তাহাদের উপাস্য দেবতাহইতে সামান্য জড়জগতের সামগ্রী পর্য্যন্তকে সুখী করিবার কল্পনা করিয়া থাকে। এরূপ কল্পনাই বা আর কোন জাতি করিতে পারে? তৎপরে ঐ মন্ত্রটি হইতে বুঝা যায় যে, ধার্ম্মিককে হিন্দু যে সুখ দিতে প্রস্তুত, পাপীর প্রতি সেই ব্যবস্থা করিতে কিছুমাত্রও কুণ্ঠিত নহে! এরূপ সমদর্শন বোধ হয়; আর কোন জাতি কল্পনাতেও আনিতে পারে কি না সন্দেহ!

তৎপরে হিন্দু সন্তান পড়িলেন—

"সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতন।
কপিলশ্চাসুরিশ্চৈব বোঢ়ুঃ পঞ্চশিখস্তথা,
সর্ব্বে তে তৃপ্তিমায়ান্তু মদ্দত্তেনাম্বুনা সদা।"

এই সকল মহর্ষিগণ আদি-সৃষ্ট মানব, ইঁহারা অকৃতদার, অপুত্রক অথচ সর্ব্বলোক পূজ্য, জ্ঞানি গণাগ্রগণ্য সুতরাং হিন্দু সন্তান আজ স্বীয় পিতৃগণের তৃপ্তি সাধন করিতে বসিয়া, তাঁহাদিগকে ভুলিবেন কিরূপে? তাই আজ ভক্তিভরা প্রাণে জলাঞ্জলি দিয়া বলিলেন "আমার দত্ত এই জলাঞ্জলিতে তোমরাও তৃপ্ত হও।"

তৎপরে তিনি মরীচি, অত্রি প্রভৃতি প্রজাপতিগণের উদ্দেশে তর্পণ করিয়া থাকেন। ইঁহারাই আদি প্রজাপতি, সমস্ত চরাচরস্থ জীবকুল ইঁহাদের কুলেই উৎপন্ন, কাজেই এই সকল আদি জনয়িতৃগণকে এ সময়ে হিন্দু ভুলিবেন কেন? তৎপরে পিতৃলোকাধিষ্ঠাতা অগ্নিস্বত্তাসৌম্যাদি পিতৃদেবতাগণও পূজিত হন।

তৎপরে যম, যাঁহার জন্য পিতৃপুরুষেরা স্বর্গগত হইয়াছেন, তাঁহাকেও হিন্দু এক অঞ্জলি জল দিয়া থাকেন। তৎপরে নিজ পিতৃগণের উদ্দেশে জলাঞ্জলি দিয়া থাকেন। পিতৃগণকে তৃপ্ত করিয়া পিতৃবৎসল হিন্দুর প্রাণ উথলি উঠে। উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে তাঁহাকে আবার জল দিতে হয়,—

"অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে জীবা যেঽপ্যদগ্ধাঃকুলে মম।
ভূমৌ দত্তেন তোয়েন তৃপ্যন্তু যান্তু পরাং গতিং॥"

"যে সকল জীব অগ্নিদগ্ধ হইয়া মরিয়াছে বা যাহারা আমার বংশে জন্মিয়া অগ্নিতে দাহ হইতে পায় নাই, তাহারা আমার দত্ত এই ভূমিনিক্ষিপ্ত জলে তৃপ্ত হইয়া পরামাগতি লাভ করুন।"—পূর্ব্বে হিন্দুরা দুই বৎসরের অনধিক বয়স্ক সন্তান মরিলে দাহ না করিয়া প্রোথিত করিতেন; তাহাদিগের শ্রাদ্ধশান্তি হইত না, কিন্তু মোক্ষপ্রিয় সমদর্শী দয়ালু হিন্দু তাহাদের মুক্তির বিধান না-করিয়া থাকিবেন কিরূপে? তাই এই মন্ত্রটির সৃষ্টি? এতদ্ব্যতীত যাহারা অপঘাতে মরিয়াছে বা লোকাভাবে দাহ-সংস্কারে সংস্কৃত হইতে পায় নাই, তাহাদের ও মুক্তির বিধান এই মন্ত্রে হইল।

প্রার্থনায় আবার জল দিলেন,—

"যে বান্ধবাবান্ধবা বা যেঽন্যজন্মনি বান্ধবাঃ।
তে তৃপ্তিমখিলাং যান্তু যে চাস্মত্তোয়কাঙ্ক্ষিণঃ॥"

এরূপ ভাবের বিধিব্যবস্থা হিন্দুর প্রাণ ব্যতীত অপর কোন জাতির প্রাণে আসিতে পারে কি? অতুবা এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে যাঁহারা সভ্যতাবশে পিতামাতাকেও কুপোষ্য বলিয়া স্থির করেন, তাঁহারা যে মৃত বন্ধুবান্ধব, অবান্ধব (সম্পর্কহীন ব্যক্তি) ও পূর্ব্বজন্মের বান্ধবগণের তৃপ্ত্যর্থ তর্পণ করা আবশ্যক বোধ করিবেন, ইহা অসম্ভব।

তাহার পর আবার জল দিতে হয়—

"আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ দেবর্ষিপিতৃমানবাঃ।
তৃপ্যন্তু পিতরঃ সর্ব্বে মাতৃমাতামহাদয়ঃ॥
অতীতকুলকোটিনাং সপ্তদ্বীপনিবাসিনাং।
ময়া দত্তেন তোয়েন তৃপ্যন্তু ভুবনত্রয়ং॥"

"ব্রহ্মলোকহইতে সমস্ত লোক ও ভুবন, সমস্ত দেবর্ষিপিতৃমানব, মাতৃমাতামহাদি পিতৃবর্গ, সপ্তদ্বীপনিবাসী, কোটীকুলাতীত ব্যক্তিবর্গ ও সমগ্র ত্রিভুবন আমার দত্ত এই জলাঞ্জলিতে তৃপ্তি লাভ করুক।' পাঠক! আর কি আহারও জল পাইতে বাকি রহিল বোধ হয়? সন্দেহ করিতেছ? যেন রহিল, না? আচ্ছা, হিন্দু সন্তান যতক্ষণ নিজের তৃপ্তি না হয়, ততক্ষণ কাতর নহেন। তাঁহাকে আবার জল দিতে হইল,—

"আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং জগৎ তৃপ্যতু।"*

আর বোধ হয় বাকী থাকিতে পারে না, কেমন?

ভাই! বল দেখি এমন সামান্য বিষয়ে এত উদারতা এত মহানুভবতা, এত মহাপ্রাণতা, এত উচ্চ-শিক্ষা আর কোথাও দেখিয়াছ কি? দিবে তুমি কেবল এক গণ্ডূষমাত্র জল, কিন্তু বল দেখি, মন্ত্রগুলি পাঠ করিলে, তোমার হৃদয়ের প্রসারতা কত বাড়িবে? তুমি কতটা উচ্চান্তঃকরণ হইতে পারিবে? †

---

* যাঁহারা নিত্য সম্পূর্ণ তর্পণ করিতে অশক্ত, তাঁহাদিগের পক্ষে এই একমাত্র মন্ত্রপাঠ করিয়া তিন অঞ্জলি জল দিবার ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। হায়! দুঃখের বিষয় এই যে, এই এতটা সহজসাধ্য বিষয় হইলেও অনেকে আজকাল তর্পণ করিতে পরাঙ্মুখ!

† জন্মাষ্টমীর দিন তর্পণ করিলে গয়াক্ষেত্রে শতবর্ষব্যাপী শ্রাদ্ধ করার ফল হয় যথা,—

"তস্যাং তিথৌ বারিমাত্রং পিতৃণাং যঃ প্রযচ্ছতি।
গয়াশ্রাদ্ধং কৃতং তেন শতাব্দংনাত্র সংশয়ঃ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ—শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ড।

হরিদাস স্বামী

চৈতন্যদেবের শিষ্য ও প্রশিষ্যগণ বৃন্দাবনধামে অনেকগুলি মঠ ও মন্দির স্থাপন করেন, সেই সকল আধুনিক মন্দিরের মধ্যে বিহারীজীর মন্দিরটী দেখিতে মন্দ নয়। এই মন্দির প্রস্তর-নির্ম্মিত, চতুরস্র। লাল বেলে পাথরে ইহা গ্রথিত। সম্মুখে মধ্যস্থলে একটী তোরণদ্বার। তোরণদ্বার সম্পূর্ণ নির্ম্মিত হয় নাই; দেখিলেই বুঝা যায় যে, ইহার উপরে গৃহ বা অন্য কিছু হওয়া আবশ্যক। মন্দিরটী কালের প্রভাবে কিছু দিন পূর্ব্বে একেবারে উৎসন্ন গিয়াছিল, কিন্তু মন্দিরাধিকারী গোস্বামীরা ৭০০৲ টাকা খরচ করিয়া, ইহার জীর্ণসংস্কার করিয়াছেন। এই টাকা দূর-দূরান্তর হইতে ভিক্ষা করিয়া সংগৃহীত হয়। বিহারীজীর মন্দির আপামর সাধারণের নিকট "বাঁকে বিহারীর মন্দির" নামেই প্রসিদ্ধ।

মন্দিরের বর্ত্তমান অধিকারী গোস্বামীরা এখন স্ত্রীপুত্রাদি লইয়া সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ৫।৬ শত হইবেন। ইঁহারা বলেন, আমরা হরিদাস স্বামী নামক জনৈক মহাপুরুষের বংশের জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। ইঁহাদিগের এই মন্দিরটী ভিন্ন অন্য কোথাও মঠ বা অন্য কোন মন্দির নাই। ইঁহারা বৈষ্ণব-গণের মধ্যে একটী স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তয়িতা। স্বামী হরিদাস এই সম্প্রদায়ের প্রথম প্রবর্ত্তক। এই স্বামী হরিদাসের অদ্ভুত মহিমা শুনিবার উপযুক্ত।

হরিদাস স্বামী নিজে বিরক্ত বৈরাগী ছিলেন, কখন দার-পরিগ্রহ করেন নাই। তাঁহার একটি সহোদর ছিল, নাম জগন্নাথ। এই জগন্নাথের মেঘস্বামী, মুরারিদাস ও গোপীনাথদাস নামে তিনটী পুত্র হয়। এই তিন সহোদরের মধ্যে কনিষ্ঠ নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক গমন করেন। মেঘস্বামী ও মুরারিদাসের বংশে বর্ত্তমান গোস্বামিগণের জন্ম হইয়াছে। মেঘশ্যামের বংশীয়েরা "বড় ঘরার গোঁসাই" ও মুরারিদাসের বংশীয়েরা "ছোট ঘরার গোঁসাই" বলিয়া বিখ্যাত। ইঁহারা পালাক্রমে মন্দিরের উপসত্ব ভোগ করিয়া থাকেন। স্বামী হরিদাস মহাপুরুষ ছিলেন বলিয়া, তাঁহার বংশীয়েরাও যে মহাপুরুষের ন্যায় উন্নত হৃদয় তাহা নহে; মন্দিরের পালা লইয়া উভয় গোস্বামিবংশে মহাবিবাদ, এমন কি, ফৌজদারী মোকদ্দমাপর্য্যন্ত হইয়া যায়! বর্ত্তমান গোস্বামি-গণের মধ্যে অনেকেরই বর্ণ পরিচয় নাই, অনেকে স্বভাবেও নরাকার পশু, তীর্থের কলঙ্কস্বরূপ! অন্যান্য বৈষ্ণবগণের ন্যায় ইঁহারাও ভগবদ্গীতাকেই প্রধান গ্রন্থ বলিয়া মানিয়া থাকেন; কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা অল্প লেখাপড়া জানেন, তাঁহারা সংস্কৃত ভাষার আলোচনা বড় রাখেন না; হিন্দী বা ব্রজভাষায় লিখিত পুস্তকাদি কেহ কেহ পাঠ করেন মাত্র। নাভজীর ভক্তমাল-গ্রন্থ ইঁহাদের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা আদরণীয়।

ভক্তমালের মধ্যে বিংশতি মালায় স্বামী হরিদাসের মহিমা গ্রথিত হইয়াছে, কিন্তু ভক্তমালে তাঁহার বিষয়ে বিশেষ কোন কথাই লিখিত হয় নাই; শুধু এই মাত্র আছে;—

আশধীর উদ্যোত কর রসিক ছাপ হরিদাস কী॥
জুগল নাম সোঁ নৈম জপত নিত কুঞ্জবিহারী॥
অবিলোকত রহিঁ কেলি সখী সুখকো অধিকারী॥
গানকলা গন্ধর্ব্ব শ্যামশ্যামাকোঁ তোষেঁ॥
উত্তম ভোগ লগায় মোর মরকট তিমি পোষেঁ॥
নৃপতি দ্বার ঠাঢ়ে রহেঁ দরশন আশা জাস কী॥
আশধীর উদ্যোত কর রসিক ছাপ হরিদাস কী॥

"আশধীরের গৌরবস্থল, সাধুগণের অগ্রগণ্য হরিদাস কুঞ্জবিহারী এই যুগল নাম নিত্য জপ করিতেন, যিনি সখীদিগের (গোপীদিগের) সহিত তাহাদের সুখের অধিকারীর (কুঞ্জবিহারীর) কেলি দেখিতেন, যিনি গানে গন্ধর্ব্বস্বরূপ ছিলেন এবং শ্যাম ও শ্যামাকে উত্তম ভোগ দিয়া তুষ্ট করিতেন, মর্কট (বানর) তিমি (মৎস্য) ও ময়ূরদিগকে আহার দিতেন, যাঁহার দর্শনাশায় নৃপতি (মোগলসম্রাট আকবর) দ্বারে দাড়াইয়া ছিলেন, তিনিই আশধীরের গৌরবস্থল, সাধুগণের অগ্রগণ্য হরিদাস।

ভক্তমালভিন্ন ভক্ত-সিন্ধু নামক আর একখানি ঐ প্রকার গ্রন্থে ২১১টি শ্লোকে ইহার সম্বন্ধে অনেক বিষয় প্রকাশিত আছে। বৃন্দাবনের প্রবাদ ও ভক্ত-সিন্ধুর বর্ণনা হইতে স্বামী হরিদাসের মহিমা সংক্ষিপ্ত ভাবে সংগৃহীত হইল।

কোল বা জলসারদেশে ব্রহ্মধীর নামক জনৈক সাধক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার এক পুত্র ছিল, নাম জ্ঞানধীর। জ্ঞানধীর শ্রীকৃষ্ণের গিরিধারীমূর্ত্তির সেবক ছিলেন এবং প্রায়ই তীর্থোদ্দেশে পবিত্র গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে গমন করিতেন। তিনি বিবাহ করেন নাই, করিবেন না এরূপ স্থির করিয়াছিলেন; কিন্তু বিধির নির্ব্বন্ধকে খণ্ডাইবে?—একবার এইরূপ তীর্থযাত্রায় বাহির হইলে, মথুরা নগরীতে তিনি বিবাহ করিতে বাধ্য হন। যথাসময়ে এই পত্নীর গর্ভে জ্ঞানধীরের আশধীর নামে এক পুত্র জন্মে। আশধীর বৃন্দাবনের সন্নিহিত রাজপুর গ্রামনিবাসী গঙ্গাধর নামক জনৈক ব্রাহ্মণের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। আশধীরের পত্নী সম্বৎ ১৪৪১ অব্দে ভাদ্র মাসের ৮ই তারিখে একটী পুত্র প্রসব করেন। পুত্রের নাম হইল হরিদাস। বলা বাহুল্য, ইনিই আমাদের ভবিষ্যৎ স্বামী হরিদাস।

লোকের ভবিষ্যতে কত উন্নতি হয়, তাহার কিঞ্চিৎ আভাষ বাল্যকাল হইতেই পাওয়া যায়। বুদ্ধপ্রভৃতি প্রত্যেক প্রকৃত মহাত্মার ন্যায় শৈশবাবস্থা হইতেই হরিদাসেরও ধর্ম্ম প্রবণতার ভাব দেখিতে পাওয়া যাইত। তিনি আমোদপ্রিয় অন্যান্য বালকগণের সহিত খেলা করিতে ভাল বাসিতেন না, নির্জ্জনে বসিয়া সর্ব্বদা প্রার্থনায় ও ধর্ম্মচিন্তায় নিরত থাকিতেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, হরিদাস দার-পরিগ্রহ করেন নাই। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার প্রতিজ্ঞা ছিল, বিবাহ-বন্ধনে কখন বদ্ধ হইব না। তাঁহার পিতামাতা বিবাহ করিতে তাঁহাকে একান্ত অনুরোধ করেন। হরিদাস ব্যথিত হৃদয়ে পিতামাতার অনুরোধ অগ্রাহ্য করেন এবং ২৫ বৎসর বয়সে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া মানসসরোবরের * তীরে গিয়া বাস করিতে থাকেন। কিছুদিন পরে তিনি মানস সরোবর ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনস্থিত নিধুবনে গিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার মাতুল বিঠ্ঠল পাল সর্ব্বপ্রথম তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এই সময় হইতেই হরিদাসের যশসৌরভ দিগন্তে প্রসারিত হয় এবং অনেকেই তাঁহার মধুর উপদেশ শুনিবার জন্য বহুদূর হইতে আসিতে আরম্ভ করে। তাঁহার সম্বন্ধে নানাপ্রকার গল্প প্রচলিত আছে।

দয়ালদাস নামক জনৈক ক্ষেত্রী (বণিক্) স্বামীর নিকট একদিন উপস্থিত হয়। তাহার নিকট একখণ্ড স্পর্শমণি ছিল। মহামূল্য বিবেচনা করিয়া দয়াল ঐ প্রস্তরখণ্ড স্বামীকে উপকার দেয়। স্বামী উহা যমুনার জলে ফেলিয়া দেন। কাজেই দয়াল অত্যন্ত দুঃখিত ও বিরক্ত হয়। স্বামী দয়ালের মনের ভাব বুঝিয়া তাহাকে যমুনার তীরে লইয়া গিয়া বলিলেন "দয়াল, এই জল হইতে মুষ্টিপরিমিত বালুকণা তুলিয়া লও"। দয়াল স্বামীর আজ্ঞামত বালি তুলিয়া লইয়া দেখিল যে, স্পর্শমণিরই অনু-পরমাণুই এই বালুকা সমষ্টি এবং ইহার আস্বাদনও ঠিক সেইরূপ। ইহাতে দয়ালের দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে, সাধু সন্ন্যাসিদিগের অর্থাভাব কখন ঘটে না এবং তদবধি সে স্বামীকে গুরুত্বে বরণ করিল।

* বৃন্দাবনধামের অপর পারস্থ যমুনা নদীর বামে মানস সরোবর অবস্থিত।

স্বামীর নিকট স্পর্শমণি আছে শুনিয়া, কয়েকগুলি দুরাচার তাহা চুরি করিতে মনস্থ করে। একদিন স্বামী হরিদাস স্নান করিতেছেন, এমন সময় তাহারা স্পর্শমণি-বোধে স্বামীর শালগ্রাম শিলাটি লইয়া পলায়ন করে। পরে ভ্রম বুঝিতে পারিয়া অপহরণকারিগণ শিলাখণ্ড নিবিড় বনমধ্যে ফেলিয়া দেয়। স্বামী উক্ত শিলার সন্ধানে বহুদূর ভ্রমণ করেন, অবশেষে যে বনে শালগ্রাম শিলাটি নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, সেই বনপ্রান্তদিয়া যাইবার সময় বনমধ্য হইতে এইরূপ বাক্য শুনিতে পাইলেন; "হরিদাস, আমি অপহৃত হইয়া এইখানে পড়িয়া রহিয়াছি, আমাকে এ স্থান হইতে লইয়া যাও।" বলা বাহুল্য, হরিদাস শিলাখণ্ড সমাদরপূর্ব্বক বন হইতে উদ্ধার করিয়া বাটী লইয়া গিয়া যথাবিধি পূজা করিলেন। এই সময় হইতেই স্বামী প্রত্যহ আশ্চর্য্য ভাবে একটী করিয়া মোহর পাইতেন। এই মোহরে দেবপ্রতিমূর্ত্তিসমূহের ভোগাদির ব্যয় নির্ব্বাহ হইত এবং যে টাকা অবশিষ্ট থাকিত, তাহাতে যমুনাস্থিত মৎস্য, তীরবর্ত্তী ময়ূর ও বানরদিগের আহারোপযোগী ফলমূলাদি ক্রয় করিতেন।

একদিন জনৈক কায়স্থ ১০০০৲ টাকা মূল্যের এক বোতল আতর আনিয়া স্বামীকে উপহার দেয়। স্বামী অগ্রাহ্য করিয়া উহা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেন। কাজেই বোতলটী ভাঙ্গিয়া যায় ও সমস্ত আতর নষ্ট হয়। স্বামীর এই ব্যবহারে ঐ ব্যক্তি অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করে। স্বামী দুঃখিত দেখিয়া তাহাকে মন্দিরে লইয়া গেলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র ঐ লোকটীর সমস্ত দুঃখ তিরোহিত হইল, সে দেখিয়া বিস্মিত হইল, যে মন্দিরের চতুর্দ্দিকেই তাহার আনীত ঐ মহামূল্য আতরের সুগন্ধ বিরাজ করিতেছে এবং মন্দিরটী আমোদিত হইয়া রহিয়াছে।

স্বামী-সম্বন্ধে আরও একটী প্রচলিত গল্প আছে। ইহাতে স্বামীর অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে একটি প্রধান গায়কের জীবনের প্রধান ঘটনা পাঠ করিয়া মোহিত হইয়া যাইতে হয়। দিল্লীরাজ আকবরের সভায় একজন গায়কের একটী মূর্খ পুত্র ছিল। মূর্খতা দেখিয়া ঘৃণাবশতঃ পিতা-পুত্রকে বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। পুত্রও অগত্যা উপায়ান্তর না দেখিয়া নানা দেশ ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করে; অবশেষে বৃন্দাবনধামে উপস্থিত হইল এবং পথশ্রান্তিহেতু রাস্তার উপর শুইয়া নিদ্রা গেল। অতি প্রত্যূষে যমুনায় স্নান করা স্বামীর প্রাত্যহিক কর্ম্ম ছিল। সেদিনও নিধুবন হইতে স্বামী যমুনায় যাইতেছিলেন, অন্ধকারহেতু পথমধ্যে ঐ ব্যক্তির গায় পা-লাগায় স্বামী পড়িয়া যান। স্বামী তাহাকে পথে শুইয়া থাকিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সে সমস্ত বলিল। স্বামী আনুপূর্ব্বিক তাহার দুরবস্থা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে উৎকৃষ্ট গায়ক করিয়া দেন এবং তানসেন নামে তাহার নূতন নামকরণ করেন। অবশেষে তানসেন দিল্লীতে যাইয়া রাজসভায় মধুরকণ্ঠে নানাপ্রকার গান করেন এবং সম্রাট ও সভাস্থ সকলে তাঁহার আশ্চর্য্য ক্ষমতা দেখিয়া মোহিত হইয়া যান। পরে দিল্লীরাজ তাহাকে নিজ বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করেন। তানসেন পিতাকর্ত্তৃক গৃহহইতে বহিষ্করণ প্রভৃতি বলিয়া স্বামীর ভূয়সী প্রশংসা করিয়া নিজ কথা শেষ করেন। সম্রাট স্বামীর অলৌকিক শক্তির পরিচয় পাইয়া বৃন্দাবনে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে মনস্থ করেন। কার্য্যানুরোধে শীঘ্রই তাঁহাকে আগ্রা যাইতে হয়। কার্য্যসমাপ্তির পর তিনি আগ্রা হইতে তানসেনকে সঙ্গে লইয়া বৃন্দাবনধামে গমন করেন এবং সহর হইতে পদব্রজে নিধুবনে স্বামীর নিকট উপনীত হন। স্বামী তাঁহার পূর্ব্ব শিষ্যকে সাদর সম্ভাষণ করিলেন, কিন্তু চিনিতে পারিয়াও তিনি আকবরের অভ্যর্থনাদি করিলেন না। অবশেষে সম্রাট তাঁহার জন্য কোন শুভকর কার্য্য করিতে অভিলাষ প্রকাশ করেন। স্বামী প্রথমতঃ তাহাতে অসম্মত হন, কিন্তু একান্ত অনুরোধে পড়িয়া বৃন্দাবনস্থিত বানরদিগকে পর্য্যাপ্ত আহার দিতে আজ্ঞা করেন ও নানা অমৃতময় উপদেশ

দেন, সম্রাট স্বামীর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া সাধুদর্শনে প্রফুল্লচিত্তে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

ভক্তসিন্ধুর মতে স্বামী হরিদাস ১৪৪২ সম্বতে জন্মগ্রহণ করেন ও ১৫৩৭ সম্বতে অর্থাৎ ১৪৮১ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন; এ অনুমান নির্ভুল বলিয়া বোধ হইতেছে না; কারণ, পূর্ব্বে তানসেনের বিষয় যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহাহইতে জানা যাইতেছে যে, তানসেন ও হরিদাস সমসাময়িক। তানসেন আকবরের সভাসদ্ ছিলেন। কাজেই আকবর ও স্বামী এক সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। আরও, যে সম্রাট স্বামীর নিকট উপদেশ লইতে গিয়াছিলেন, তিনি যে আকবর ভিন্ন আর কেহই হইতে পারেন না, ইহা স্থির। আকবর ১৫৫৬ হইতে ১৬০৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন; সুতরাং স্বামীও, ঐ সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। অধিকন্তু গ্রাউস্ সাহেবের নিকট যে একখানি পুথি ছিল এবং তাহা মিলাইয়া তিনি যে সময় নিরূপণ করিয়াছেন, তাহার সহিত আমাদের এ সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ ঐক্য হইতেছে। গ্রাউস্ সাহেবের ঐ পুথিখানি ১৮২৫ সম্বৎ অর্থাৎ ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত। ঐ পুথিখানিতে প্রথম অর্থাৎ স্বামী হরিদাস হইতে ঐ সময় যাবৎ ৮ জন মোহান্তের নাম ও তাঁহাদের কৃত পদাবলী লিখিত আছে।

২০ বৎসর করিয়া প্রত্যেকের গড়পড়তা ধরিলে, এইরূপ উপলব্ধি হয় যে, স্বামী হরিদাস অষ্টম মোহান্তের সময়ের অর্থাৎ ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ২০×৮=১৬০ বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন, অর্থাৎ ১৬০৯ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন।

আমাদের সিদ্ধান্তের আরও দুইটী প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। প্রথমতঃ স্বামী হরিদাসের লেখা দেখিয়া বোধ হয় যে, তিনি তুলসীদাসের পূর্ব্বকার লোক নহেন। তুলসীদাস ১৬২৪ খ্রীষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন; অতএব এরূপ অনুমান করা যুক্তিবিরুদ্ধ নয় যে, মহাত্মা হরিদাস স্বামী ১৬শ শতাব্দীর শেষভাগে ও ১৭শ শতাব্দীর প্রারম্ভে বর্ত্তমান ছিলেন। দ্বিতীয়তঃ স্বামী হরিদাসের পরবর্ত্তী ও তৃতীয় মোহান্ত বিহারিণীদাস তাঁহার বিরচিত ৬৮৪ পৃষ্ঠাপূর্ণ বৃহৎ গ্রন্থের একস্থলে সম্রাট আকবর ও তাঁহার বিখ্যাত বন্ধু বীরবলের নামোল্লেখ করিয়াছেন;—

রাগ—গৌরী।

কহা গর্ব্বেরে মৃতক নর॥
খান স্যায় কো খান পান তন আঁঠি চলত রে নিলজ্জ নিডর॥ ১
যহি অবধি বহু বিদিত জগ বাভন বড়ে ভয়ে বীরবর॥
মরত দুয়ো হিয়োন জিয়ো কিয়ো ন সহাই সাহি অকবর॥ ২
শাসন নিকসত সুর অসুর রাযে রোথি কাল করতর॥
ইতহি ন উতহি বীচহী ভুল্যোফুল্যো হি ফিরত কৌনকে থর॥ ৩
সুখদ শয়ন হরিচরণকমল ভজি বাদি ফিরত ভটকত ঘরঘর॥
শ্রীবিহারীদাস হরিদাস বিপুলবল লটকি লগ্যো সঙ্গ সর্ব্বোপর॥ ৪

মানব! তুমি মৃত্যুর অধীন, তুমি গর্ব্ব কর কেন? তোমার শরীর শৃগাল কুকুরের ভক্ষ্য হইবে, তথাপি তুমি ভয় বা লজ্জা না করিয়া শরীরের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চলিতেছ? জগতে বিদিত আছে যে, সকলেরই পরিণাম মৃত্যু। বীরবর একজন মহৎ লোক ছিলেন তথাপি তিনি মৃত্যুর

* স্বামী হরিদাস, বিঠ্ঠল বিপুল, বিহারিণী দাস, নাগরীদাস, সরসদাস, নওলদাস, নরহরদাস, রসিকদাস ও ললিত কিশোরী অথবা ললিত মোহন দাস।

হস্তহইতে নিষ্কৃতি পান নাই, তাঁহার মৃত্যুতে যে আকবর ব্যথিত হইয়াছিলেন, তিনিও বেশী দিন বাঁচেন নাই কিম্বা অন্য কিছু উৎকৃষ্ট বস্তু পান নাই। যখন দেব বা দৈত্যগণেরও মৃত্যু হয়, যম তাহাদিগকে জঠরে ধারণ করে এবং পৃথিবীতে বা নরকে নয়, মধ্যস্থলে তাহাদিগকে ঝুলাইয়া রাখে। উৎপথে গিয়া গর্ব্বে স্ফীত হইতেছ? কাহার উপর তোমার বিশ্বাস? শ্রীহরির পাদ-পদ্ম পূজা কর; এক বাটীহইতে অন্য বাটী ঘুরিয়া বেড়ান গর্ব্বমাত্র। হরিদাসের বিশেষ সাহায্যে বিহারিণীদাস সর্ব্বশক্তিমানকে ধরিতে পারিয়াছে।

বীরবর ১৫৯০ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন, সুতরাং বিহারিণী দাস যে ১৫৯০ খৃষ্টাব্দের পরে বা সেই সময় জন্ম গ্রহণ করেন, ইহা নিশ্চিত; কিন্তু পূর্ব্বেই আমরা প্রমাণ করিয়াছি যে, বিহারিণী দাস স্বামীর পরবর্ত্তী ও তৃতীয় মোহান্ত। ভক্তসিন্ধুতে প্রকাশ যে, একজন মোহান্তের মৃত্যুর ঠিক্ পরেই আর একজন তাঁহার স্থানাধিকার করিয়াছেন; সুতরাং ইহাদ্বারা আমাদের পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত আরও দৃঢ়ীভূত হইতেছে।

অধ্যাপক উইলসন্ তাঁহার "হিন্দুদিগের উপাসক সম্প্রদায়" গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, হরিদাস মহাপ্রভু চৈতন্যের শিষ্য ছিলেন, সুতরাং ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫২৭ খৃষ্টাব্দ মধ্যে বর্ত্তমান ছিলেন। চৈতন্যের শিষ্য একজন হরিদাস ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি এই স্বামী হরিদাস নহেন। তিনি ম্লেচ্ছবংশোদ্ভূত ছিলেন। অনেকেই এই দুই জন হরিদাসের পার্থক্য নির্দ্ধারণ করিতে না পারিয়া মহা গোলে পড়িয়া থাকেন।

হরিদাস স্বামী প্রণীত দুইখানি মাত্র কাব্য এখন পাওয়া যায়। একটীর নাম "সাধারণ সিদ্ধান্ত" অপরখানির নাম "রাস কি পদ"। এই কাব্য ও তাঁহার পদাবলীতে বৈষ্ণব ধর্ম্মের মূলমন্ত্র গুলিই শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। কাব্যদ্বয়ে ভাবের সহিত রচনার এরূপ সমাবেশ করা হইয়াছে যে, অধিকাংশ স্থলে অর্থ বোধ করা দুর্ঘট হইয়া উঠে। বারান্তরে মূল শ্লোকগুলি ও তাহার বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিবার মানস রহিল।

শ্রীকালীচরণ মিত্র।

কেন সই?

নিরাশার অন্ধকারে,
এখনো একটু আলো,
রয়েছে জাগিয়া,
সন্ধ্যা মোর তরুশির
এখনো করেনি কালো,
কালিমা ঢালিয়া।

অসীম শূন্যের মাঝে
উজ্জ্বল তারাটি সই
রয়েছে চাহিয়া,—
দেখাইতে পথ মোর,
তাইতো এতেক সই,
যাতনা সহিয়া।

শ্রীসুরেনাথ চক্রবর্ত্তি।

হাকিম সাহেব

প্রথম পরিচ্ছেদ

আজ অনেক দিনের কথা—দোর্দ্দণ্ড প্রতাপান্বিত —শাহ তখন পারস্যের। সিংহাসনে তাঁহার মত বুদ্ধিমান নৃপতি পারস্যের সিংহাসনে এই প্রথম; কারণ, তাঁহার রাজনীতির মূলমন্ত্র—রাজা প্রভু, প্রজা ভৃত্য; ভৃত্যের কার্য্য প্রভুর পদানত থাকা; প্রজার কার্য্য রাজাজ্ঞা নীরবে পালন করা। যে দুঃসাহসিক রাজাজ্ঞার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়, সে রাজদ্রোহী, অদৃষ্ট তাহার নিতান্ত মন্দ, দুঃখ তাহার জীবনের চিরসহচর। বিনয়,—রাজার শোভা পায় না—বিনয়ে রাজসম্ভ্রম হ্রাস করে; কারণ, দেখা যায় যে, সামর্থ্যহীন লোকে বা ভিক্ষুসন্ন্যাসিগণেই বাধ্য হইয়া বিনয়ের আশ্রয় লইয়া থাকে। রাজার জন্ম—প্রকৃতি শাসন করিতে, তাঁহার কার্য্য—আদেশ দান করা। উদ্দেশ্য যেমন মহৎ, কার্য্যও তেমনি গৌরবময় হওয়া উচিত, কাজেই রাজার পক্ষে বিনয় শোভা পায় না—সুতরাং —শাহ বিনয় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

শাহের প্রধান গুণ—তিনি যাহা ভাবিতেন তাহাই কার্য্যে পরিণত করিতেন, তবে মনুষ্য-চরিত্র কিনা অসম্পূর্ণ, তাই দুই এক স্থলমাত্রে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিত। দুষ্টে জটলা করিত—স্বার্থসিদ্ধির ব্যাঘাতই নাকি ঐ দু'এক স্থলে মতানুরূপ কার্য্য না করার অন্তরায়। এ জটিল প্রশ্নের সমাধান চেষ্টা সর্ব্বজ্ঞ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতদিগের উপর রহিল।

শুনা গিয়াছে, এই দেবচরিত্রদুর্লভ মহদ্‌গুণের বশবর্ত্তী হইয়া, পরম হিতাকাঙ্ক্ষিগণের সদুপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া, শাহ তাঁহার একত্রসন্নিবিষ্ট রাজনীতি ও সমাজনীতি নির্ভয়ে পরিচালনা করিতেন; যথা,—এক দিন রাত্রি-জাগরণে তাঁহার উঠিতে বেলা হয়, তাহাতেও কিন্তু ঘুমের শান্তি হইল না, ঢুলুঢুলু নয়নে আলোক বড় তীব্র লাগিল; সকলে ভাবিল, আজ বোধ হয়, আলোক-বিধাতা অরুণদেবের ফাঁসী হইবে, কিন্তু অরুণদেবের অদৃষ্ট নাকি সেদিন নিতান্তই প্রসন্ন, তাই তাঁহার আর তলব হইল না। যাহা হউক তত্ত্বজ্ঞানীর ন্যায় তৎক্ষণাৎ সম্রাট আজ্ঞা প্রচার করিলেন,—বিলাসীতার প্রশ্রয় দেওয়া অবিধেয়, বিলাসীতার যত হ্রাস হয়, ততই মঙ্গল, এজন্য আজ সন্ধ্যা ৭টার পর সকলেই প্রদীপ নিবাইয়া দিবে; কারণ, শাহ আজ সন্ধ্যা হইবামাত্র শয্যাগারে প্রবেশ করিবেন, সুতরাং পাছে কোন স্থান দিয়া কোনরূপ আলোক রেখা তাঁহার নয়নে লাগিয়া ঘুমের ব্যাঘাত করে। যে এ আদেশ অন্যথা করিবে, তাহার গুরুতর শাস্তি হইবে।" সম্রাট হয়তো আদেশ দিয়াছিলেন, কেবল রাজপ্রাসাদেই এই নিয়ম চলিবে; কিন্তু ব্যবহারবিদ্ উজীর সাহেব এ আদেশটি নগরময় প্রচার করাইলেন। সেদিন দুর্ভাগ্যক্রমে নগর প্রান্তে জনৈক দরিদ্রমণীর সঙ্কট পীড়া; বৃদ্ধস্বামী প্রদীপ জ্বালিয়া তাহার শুশ্রূষা করিতেছিল। আর কে রক্ষা করে? দেখিতে না দেখিতে ক্ষুদ্রপর্ণকুটীরখানি শতাধিক চৌকিদার সৈন্যে পরিবেষ্টিত হইল। বেচারী ব্যাপার কিছুই বুঝিল না; কারণ সে রাজাজ্ঞার কথা কিছুই শুনে নাই। সহরের নির্জ্জন প্রান্তভাগে তাহার কুটীর; ঘোষবাদ্যবাদকেরা আলস্যে সে দিকে আর আসে নাই। বেচারা অনেক অনুনয়-বিনয় করিল। সুযোগ্য রাজকর্ম্মচারিগণ উত্তর করিল আমাদের কর্ত্তব্য আমরা করিব, অসন্তুষ্ট হইলেও, না হয় স্বীকার করিয়া লইলাম, ঘোষবাদ্যবাদকেরা এদিকে আসে নাই, তা' তুমি অন্য প্রতিবেশীর নিকট হইতে কোন রাজাজ্ঞা প্রচারিত হইয়াছে কি না, তাহার তত্ত্ব লও নাই কেন? প্রকৃত কথা, তুমি বিদ্রোহী, দণ্ডার্হ; দণ্ডার্হের শাস্তি হওয়া

উচিত, নহিলে রাজ্যে বিশৃঙ্খলা ঘটে, তবে এক কথা—না, তুমি দরিদ্র।" বলাবাহুল্য কর্ম্মচারিগণ শীঘ্রই তাহাকে প্রধান উজীর সাহেবের নিকট উপস্থিত করিল। আনুসঙ্গিক স্বকপোলকল্পিত ও অতিরঞ্জিত কথারও অবশ্য অভাব হইল না। উজীর পরদিন প্রাতঃকালে রাজসমীপে আসামী হাজির করিলেন। শাহ বৃদ্ধের কোন কথা না শুনিয়া মিথ্যাবাদী প্রভৃতি নানা আখ্যায় তাহাকে ভূষিত করিয়া; আদেশ দিলেন, এখনই ইহাকে 'ডালকুত্তার মুখে ফেলিয়া দেও।' সম্রাটের আদেশ তখনই পালিত হইল। পরদিন রাজার এই ন্যায়সঙ্গত শাস্তির কথা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল; প্রজারাও বুঝিল, বৃদ্ধের অপরাধও বড় ভয়ানক হইয়াছিল। কতকগুলি কুস্বভাব প্রজা কিন্তু ইহার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধানে ব্যস্ত হইল। তাহারা কাণাকাণি করিতে লাগিল, বৃদ্ধের যুবতী কন্যার উপর শাহের বহুকালপূর্ব্ব হইতে নজর পড়িয়াছিল। বৃদ্ধ ইহাতে বাধা দেয়। শাহ চটিয়া গোপনে বৃদ্ধকে সর্ব্বস্বান্ত করেন; কিন্তু তাহাতেও তাঁহার প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ হয় নাই। সুখের বিষয় কুলোকের এই বিশ্বাসের কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ এপর্য্যন্ত হস্তগত হয় নাই। আর একবার কথিত আছে, শাহের কোন নিম্নপদস্থ উজীর তাঁহার বিশ্বাস মতে একটী বড় গর্হিত কার্য্য করেন, অর্থাৎ তিনি তাঁহার কোন একজন শত্রুকে সবিশেষ কষ্ট দিবার জন্য তাহার সহিত আর একজন নিরীহ ভদ্রলোককে অযথা বিপদে ফেলেন। ফল হয় শত্রুর ১৫ বৎসর ও ভদ্র লোকটীর ৫ বৎসর কারাবাস। ইহাতে হৃদয়ে কেমন একটা ভাব উদিত হইয়া উজীরের বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল; এমন কি শয়নে স্বপনে জাগরণে সকল সময়েই তিনি যেন অশান্তির ছায়া দেখিতে লাগিলেন, অবশেষে অনুতাপ অসহ্য হওয়াতে তিনি সেই নিরীহ ভদ্রলোকটীর কাছে গিয়া,তাহাকে সকল কথা খুলিয়া বলিলেন ও তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন! উজীর সাহেব স্বয়ং আসিয়া ক্ষমা চাহিলেন, কাজেই, সে ভদ্রলোক তাহার সকল কষ্ট ভুলিয়া গেল। সে আনন্দে উজীর সাহেবের প্রশংসা করিতে লাগিল। উজীর অচিরেই তাহাকে কারামুক্ত করিয়া প্রচুর অর্থ দিলেন; সে ব্যক্তিও মহাসুখে কালযাপন করিতে লাগিল। সামান্য লোকের কাছে রাজ্যের একজন উজীরের ক্ষমা-প্রার্থনার কথা কোন প্রকারে শাহের শ্রুতিগোচর হইল। শুনিয়া তিনি ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন এবং তৎক্ষণাৎ উজীরকে তলব করিলেন। উজীর বেচারী ত্রস্ত, ভয়ে জড়সড়; দীর্ঘ সেলাম ঠুকিয়া রাজ সমীপে উপস্থিত। দেখা হইবামাত্র উজীরের সহিত শাহের তাড়াতাড়ি দুই একটা কথা হইল। তাহার পর ঘোষণা করিয়া দেওয়া হইল, আজ হইতে সেই উজীরকে বরখাস্ত করা গেল। তাহার অপরাধ অতি গুরুতর; কারণ, সে ব্যক্তি শাহের উজীর হইয়াও বুঝে না যে, এরূপ অপকর্ম্ম উজীরের কর্ত্তব্য নহে বা তাহার নিজের হীন বুদ্ধিতে যাহাই ঘটিবে, সে তাহাই করিতে পারে না; কারণ, সে উজীরমাত্র ভৃত্যমাত্র। শেষে হুকুম হইল,—প্রথমতঃ তাহাকে ২৪ ঘণ্টাকাল দুর্গন্ধময় পদার্থের ধূমে রাখিয়া দেওয়া হইবে, তাহার পর তাহাকে যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ করা হইবে।

শাহের ব্যবহারে পারস্যের প্রজাবর্গ সুখেস্বচ্ছন্দেই কাল যাপন করে, তবে কখন কাহার অদৃষ্টে কি ঘটে, তাহা ভাবিয়াই লোকে যা একটু আকুল হইয়া পড়ে; এই জন্য রাজ্যের কুলোকে বলাবলি করিত, শাহ বড় অত্যাচারী কিন্তু সে কথা ধরিতে গেলে শাহের রাজ্য করা চলিত না। সময়ে সময়ে এই সকল কুলোকে ক্ষেপিয়া উঠিত। শাহের সুশাসন সর্ব্বত্র সমদৃষ্টিতে বর্ত্তমান ছিল, কাজেই এরূপ মতাবলম্বীগণের হত্যাসংবাদ প্রায়ই অন্যান্য শীতলমস্তিষ্ক প্রজা শুনিতে পাইত। এরূপে যাহারা হত হইত, তাহাদিগকে পাগল ভিন্ন পাঠকও আর কিছুই বলিতে পারিবেন না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সত্যমিথ্যা জানি না, কিম্বদন্তী এইরূপ,—শাহ প্রবল প্রতাপান্বিত হইলেও, যমরাজ নাকি তাঁহার শাসন মানিতেন না; এমন কি, পাঁচ ছয় মাস ধরিয়া ক্রমাগত ভয় দেখাইয়া দেখাইয়া তিনি নাকি—শাহের পরিণীতা পত্নীকে তাঁহার অঙ্ক হইতে বিচ্যুত করিয়া লইয়াছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, শাহের ইহাতে ক্রোধের উদ্দীপন হয় নাই, অধিক কি, তাঁহার বিরুদ্ধে কোন অভিযানের উদ্যোগও করেন নাই। করিবার আবশ্যকও বিশেষ ছিল না; কারণ, পাঠকমাত্রেরই বোধ হয়, জানা আছে, অথবা এতদূর আসিয়া অন্ততঃ জানা উচিত যে, কয়েকটী পরিণীতা স্ত্রীভিন্ন শাহের রক্ষিতা স্ত্রীর সংখ্যা নূন্যাধিক দেড়শত। সে কালের এ দেশের কুলিন ব্রাহ্মণ কন্যাগণের ন্যায় কিন্তু ইহাঁদের দুর্দ্দশা নয়, অর্থকষ্টতো থাকিবারই কথা নয় (রাজপ্রাসাদের দ্বিতীয় সংস্করণস্বরূপ একটী সুরম্য হর্ম্ম্য ইহাদের আবাসস্থান) অধিকন্তু স্বামী-সহবাসেও (শাহকে স্বামী বলাই অনেকটা যুক্তিযুক্ত, কেননা শাহ ব্যতীত অতি সঙ্গোপনে ভিন্ন সাক্ষাৎসম্বন্ধে অপরপুরুষের সঙ্গে কোনরূপ সম্পর্ক রাখিবার সুবিধা ইহাদের ছিল না; কারণ, প্রথমতঃ বাড়ীটীর চতুর্দ্দিকে সশস্ত্র প্রহরীবেষ্টিত, দ্বিতীয়তঃ কাহাকে পরপুরুষের সঙ্গে দেখিলে উভয়েরই প্রাণদণ্ড সুনিশ্চিত) ইহারা একেবারে বঞ্চিত ছিল না। শাহের রক্ষিতা স্ত্রীর সংখ্যা আধিক্যের একটী কারণ—লোকলজ্জা; প্রবাদ আছে এরূপ অধিক সংখ্যক রক্ষিতা স্ত্রী না থাকিলে সম্রাটের মানহানি হয়, তাঁহার উপর কার্পণ্যঅপবাদ আসে এবং তাঁহার ঐশ্বর্য্যের ও অনাথা-প্রতিপালন বিষয়ে একটী প্রধান অভাব থাকিয়া যায়। এই জন্যই একটা স্ত্রীর জন্য শাহ যমের বিরুদ্ধে অভিযান করেন নাই; তাঁহার হৃদয় অতি বড় ক্ষমাশীল বলিয়াই ইহা আজও ঘটিতে পারে নাই।

শাহ বড় সংযমী ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠ পুরুষ ছিলেন। পত্নীবিয়োগে শোক তাঁহার হৃদয়ে স্থান পাইল না,—পাইতেও পারে না; কারণ, যে ব্যক্তি এত কাল ধরিয়া দয়া, মায়া, মমতা, পরিত্যাগ করিতে অভ্যাস করিয়াছে, তাহার প্রাণে যদি মায়া ও স্নেহমূলক শোকের ছায়াও স্পর্শ করে, তবে তাহার এত কালের তপস্যার কি ফল হইল?

তৎপরে শাহ দেখিলেন, তাঁহার পত্নীবিয়োগ হওয়ায়, তাঁহার অন্তঃপুরে একটি কামিনীর অভাব হইয়াছে। রাজার প্রধান কর্ত্তব্য,—অভাব দূর করা। শাহ কর্ত্তব্যনিষ্ঠ রাজা, কাজেই তিনি বেশী দিন এ অভাব অপূর্ণ রাখিতে পারিলেন না। শীঘ্রই পারস্যের একটী রূপবতী, গুণবতী যুবতীর পাণিগ্রহণ করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শাহের এক পুত্র ছিল। পিতার গুণ সন্তানে বর্ত্তে। শাহের দুরদৃষ্টবশতঃ তাঁহার পুত্রে এই সর্ব্ববাদীসম্মত বাক্যটীর যাথার্থ্য প্রতিপালিত হয় নাই। বুঝি বৈষম্য জগতের নিয়ম, বুঝি ক্ষেত্রভেদে বিধাতার ইচ্ছায় ফলের উৎকর্ষতা বা অপকর্ষতা জন্মে,—তাই শাহ নিজের ইচ্ছায় নিজে চলেন,—পুত্র রাজপুত্র হইয়াও পরের সুখদুঃখ দেখিয়া চলে। শাহ ক্ষমতাপ্রিয়—পুত্র বিনয়ী, পিতাপুত্রে এরূপ বিভিন্নতা জগতে বিরল, কিন্তু তাই বলিয়া শাহ পুত্রের বিরুদ্ধে কিছু বলিতেন না, কারণ, শাহ জানিতেন,—পুত্রওতো "নবাবসাহেব", তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি কেন কথা কহিব।

পুত্র যুবা। শৈশব হইতে যে শিক্ষকের হস্তে পুত্রের শিক্ষাভার অর্পিত হয়, তিনি সমগ্র পারস্যের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও জ্ঞানী বলিয়া স্বীকৃত, কাজেই শাহ তাঁহাকেই পুত্রের শিক্ষকতা দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন ; কারণ, যাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট তাহাই রাজভোগ্য।

সঙ্গই জীবমাত্রেরই চরিত্র গঠন করে। সঙ্গের গুণে বা দোষে মানুষ দেবতা অথবা পশু হয়। হিন্দুশাস্ত্রকারগণ বলেন "কীটোঽপি সুমনঃ সঙ্গাদারোহতি সতাং শিরঃ। তথা সৎ-সন্নিধানেন মূর্খো যাতি প্রবীণতাম্॥" শৈশবের দোষ গুণ মানুষ আজীবন বহন করে।—শাহের পুত্রেরও তাহাই হইয়াছিল।—শাহও তাহা বুঝিয়াছিলেন, তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন, শিক্ষকের দোষেই নবাব সাহেব বিগড়াইয়া গিয়াছে।

বাস্তবিকও শাহের এরূপ দুঃখ করিবার কথা ; কারণ যুবরাজ শিক্ষা পাইবার দোষেই গুরু-জনদিগের প্রিয়পাত্র এবং প্রজাবৃন্দ ও অন্যান্য সাধারণের পরম ভক্তি ও শ্রদ্ধার আধার হইয়া পড়িয়াছিলেন। শাহের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিগণ স্বার্থহানির ভয়ে গোপনে নবাবসাহেবের অমঙ্গল কামনা করিত ও সর্ব্বদা শাহের নিকটে নবাবসাহেবের প্রজাপ্রিয়তা, বিনয়, দয়া, মমতা প্রভৃতি দোষের কথা কীর্ত্তন করিত। বস্তুতঃও পারস্যের নবাবসাহেব হইয়া তাঁহার পক্ষে এ সকল দোষাবলম্বন করা অনুমোদনের অযোগ্য।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পারস্যের রাজসভা এখন দুইটী বিষয় লইয়া বড়ই ব্যতিব্যস্ত।

প্রথমতঃ প্রধান উজীরের বিবাহ। উজীর সাহেব এই বয়সে পাঁচ ছয় বার বিবাহ করি-লেন—কিন্তু সাধ্বী মহিলাগণ সকলেই তাঁহাকে বিরহসাগরে ভাসাইয়া সধবাবস্থায় স্বর্গ-ধামে চলিয়া গেলেন। ইহাতে কেহ বলিত, উজীর সাহেব বড় ভাগ্যবান্, অন্দরে বাহিরে যুগতী-সম্ভোগ চিরকালই তাঁহাতে বিদ্যমান্ ; কাহারও মতে তাঁহার বড় দুরদৃষ্ট, মনের মত স্ত্রী পাইতে না পাইতেই তাহা অন্তর্হিত হইয়া যায়। অদৃষ্ট সমালোচনা বড় শক্ত কথা, কেননা ঈশ্বর মঙ্গলময় ;—তা যাক্। উজীরসাহেব এখন বিপত্নীক, বিবাহ করিবার প্রয়োজনীয়তা অতিমাত্রায় বোধ করিতে লাগিলেন। বয়স মোটে ৪৯, এ বয়সে বিবাহসম্বন্ধে আপত্তি উঠা অসম্ভব। পারস্যের একটী সুন্দরী কন্যা নির্ব্বাচিতা হইল। বিবাহ সমাগত প্রায়। এই কন্যাটী নবাব সাহেবের সেই শিক্ষক কন্যা। শিক্ষক উজীরকে কন্যাদানে প্রথমতঃ স্বীকৃত ছিলেন না, শেষে উজীর সাহেবেরই কৌশলে বাধ্য হইয়া স্বীকার করিলেন।

দ্বিতীয়তঃ নবাবসাহেবের কঠিন পীড়া। রাজ্যে মহা হুলস্থূল—এক দিকে আনন্দ, অন্য দিকে বিষাদ, এক দিকে সংসার, অন্য দিকে বৈরাগ্য একদিকে সাহস, অন্যদিকে ভয়, এক দিকে দিকে মিলন, অন্যদিকে বিরহ। লোকে প্রমাদ গণিল।

নবাবসাহেবের কঠিন পীড়ার কথা শুনিয়া মায়ামমতাবিজয়ী শাহও উদ্বিগ্ন হইলেন, তাঁহার মনে ভয়ের সঞ্চার হইল। দিনের পর দিন, আসে আর যায়—নবাবসাহেব এই আবর্ত্তন বিব-র্ত্তনের মধ্যে পড়িয়া ক্রমশঃ বিবর্ণ, কৃশ, দুর্ব্বল ও মৌনী হইয়া পড়িতে লাগিলেন, পূর্ব্বের মত তাঁহার শরীরে সে কান্তি নাই, নয়নে সে জ্যোতি নাই, হৃদয়ে সে বল নাই, মনে সে স্ফূর্ত্তি নাই, প্রাণে সে উৎসাহ নাই, হীনপ্রাণতায় ছায়া যেন তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ বেষ্টন করিয়া ফেলিল। ক্ষুধা তাঁহার নিকট হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে, নিদ্রাও সময় বুঝিয়া অন্তর্ধান হইয়াছে—এখন তাঁহাকে দেখিলে অতি কঠোর প্রাণেও দয়ার উদ্রেক হয়। সুন্দর

কিরূপে বীভৎস ভীষণ হয়, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখিয়া মনে বিস্ময়ের পর বিস্ময় জন্মিতে থাকে। শাহ এক দিন স্বচক্ষে পুত্রের অবস্থা দেখিয়া পারিবারিক চিকিৎসককে চিকিৎসা করিতে অনুমতি দিলেন। হাকিম সাহেব রোগ নির্ণয়ে সাধ্যমত চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাতে আশু কোন ফল পাইলেন না। তিনি নাড়ী টিপিয়া, জিহ্বা পরীক্ষা করিয়া নানা মত প্রশ্ন করিয়া,—ইত্যাদি নানা উপায়ে রোগ স্থির করিতে যত্নবান হইলেন ; কিন্তু কোন সন্তোষজনক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিলেন না। তিনি যথাসাধ্য পরীক্ষা করিয়া বুঝি-লেন, জীবনধারণোপযোগী সকল যন্ত্রই অবিকৃত রহিয়াছে, কেবল দুর্ব্বলতা ভিন্ন রোগীর পীড়ার অন্য কোন লক্ষণ খুঁজিয়া পাইলেন না ; অথচ নবাবসাহেব মহারোগীর ন্যায় দিন দিন মৃত্যুপথে অগ্রসর হইতেন! হাকিমসাহেবের মনে গভীর সন্দেহ উপস্থিত হইল, রোগের উৎপত্তি কোথা হইতে? কারণ নাই, কার্য্য কিরূপে হইতেছে, কারণ নিশ্চয়ই আছে। দূষিত রক্ত বা যন্ত্র-বিশেষের আংশিক হানি অথবা কার্য্যকরীশক্তিহ্রাস এ রোগের কারণ নয়, এ রোগের কারণ অন্যবিধ, কিন্তু সে কারণ কি? হাকিম সাহেব মহা সমস্যায় পড়িলেন, কিন্তু তিনি নিরাশ হইবার লোক নহেন, আশায় বুক বাঁধিয়া এ দুর্ভেদ্য রহস্য ভেদ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

হাকিম সাহেবের বৈদ্যজ্ঞতত্ত্বে অগাধ জ্ঞান, রোগ নির্দ্ধারণে ও তাহার প্রতীকার সাধনে ইনি একপ্রকার সিদ্ধহস্ত। ইহাঁর সুচিকিৎসায় অনেকেই নবজীবন লাভ করিয়াছে, নিতান্ত যাহাদের পরমায়ু ফুরাইয়াছে তাহাদেরই নিকটেই ইহার পরাজয়। শুদ্ধ চিকিৎসায় নয়, সাধারণ সকলে বিষয়েই হাকিম সাহেবের সবিশেষ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি। হাকিম সাহেব বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান, বহুদর্শী, জ্ঞানী ও চতুর। ইনি অতি অমায়িক, সকলের সহিত ইহাঁর সমান ব্যবহার। তবে একটী দোষ, কুচক্রীর প্রতিশোধ ইনি ভাল বাসেন, ইহাঁর মত "শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ"—যে যেমন তাহার সহিত সেইরূপ ব্যবহার করিবে, শঠের সহিত শঠতা করিবে। হাকিম সাহেব বাল্যাবধি অত্যন্ত চতুর এবং অল্প বয়সেই প্রচুর জ্ঞানোপা-র্জ্জনে সক্ষম হইয়াছিলেন। শৈশবাবধি তাঁহার একান্ত ইচ্ছা—স্বাধীনভাবে জীবন কাটাইব। ইহাঁর মনের ভাব বুঝিয়া, অনেকেই ইহাকে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করিতে উপদেশ দেন, কিন্তু পিতামাতা পুত্রের বুদ্ধির প্রখরতা ও তীক্ষ্ণদৃষ্টি দেখিয়া ইহাকে ব্যবসায় বাণিজ্য করিতে নিযুক্ত করেন। ইনি ব্যবসায় লিপ্ত হইয়াও অবকাশমত চিকিৎসা বিদ্যা অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। প্রতিভা-দর্পণে সকল বিষয়ই সহজে প্রতিভাত হয়। শীঘ্রই ইনি এক জন প্রসিদ্ধ বণিক হইয়া উঠিলেন। প্রচুর ধন সম্পত্তির অধিকারী হইলেও ইনি আলস্যের দাস হন নাই। যখনই অবসর পাইতেন, তখনই ইনি একজন নিযুক্ত চিকিৎসকের নিকট চিকিৎসা-শাস্ত্র পাঠ করিতেন এবং কাহারও পীড়ার কথা শুনিলে স্বয়ং তাহার বাড়ী গিয়া ঔষধাদি ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। একবার ব্যবসায়ে ইহার অত্যন্ত ক্ষতি হইয়া গেল ; ক্ষুণ্ণমনে অবশিষ্ট ধনে পুনরায় বিক্রেয়দ্রব্য দূরদেশে জাহাজযোগে পাঠাইলেন। অদৃষ্টের ফের, এবার জাহাজ ভাঙ্গিয়া তাঁহার সমস্ত দ্রব্য নষ্ট হইয়া গেল, তিনি সর্ব্বস্বান্ত হইলেন। এই সময় হইতে অগত্যা ব্যবসা ছাড়িয়া চিকিৎসা-বিদ্যা অধিকতর মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন এবং আন্তরিক যত্ন ও উৎসাহের সহিত চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। সুচিকিৎসার গুণে শীঘ্রই ইহাঁর 'নাম' হইয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে যথেষ্ট অর্থাগম হইতে লাগিল। একবার সম্রাটের

জনৈক আত্মীয়ের সঙ্কট পীড়া হয়, ইহার চিকিৎসায় তিনি অল্প দিনে আরোগ্য হেন; তদবধি শাহ ইহাকে স্বীয় পারিবারিক চিকিৎসক ও রাজ-হাকিম পদে নিযুক্ত করেন। কি কারণে বলা যায় না, ইহাকে—শাহ ভাল বাসিতেন ও ইহাঁর দু একটা পরামর্শ শুনিতেন, তবে ইনি পরামর্শ দিতেন না; কারণ শাহের সহিত ইহার মতের মিল হইত না।

হাকিম সাহেবের সহিত কাহারও বিবাদ ছিল না, বুদ্ধিমান অমায়িক লোকের সহিত কাহারও বিবাদ কখন ঘটেনা, তবে একমাত্র বড় উজীর সাহেব ইহার শত্রুস্বরূপ ছিলেন। উজীর সাহেব হাকিম সাহেবকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করেন। হাকিম সাহেবও উজীর সাহেবকে দেখিতে পারেন না। উভয়ের মধ্যে এরূপ ভাবের কারণ কি, তাহা ইতিহাসে লিখে না, কিন্তু প্রবাদ আছে যে, একবার উজীর সাহেব কোন একটী বৃদ্ধের জন্য হাকিম সাহেবের নিকট ভবযন্ত্রণা এড়াইবার ঔষধ চাহিয়া ছিলেন, তিনি তাহা দেন নাই। উজীরসাহেব অত্যন্ত ক্ষমতাশালী ও স্বেচ্ছাচারী এবং হাকিম সাহেবও অল্প চতুর নহেন। কাজেই ইচ্ছাসত্ত্বেও উজীর সাহেব হাকিমসাহেবের বড় কিছু অনিষ্ট করিতে পারিতেন না, তবে সর্ব্বদাই সে বিষয়ে সচেষ্ট থাকিতেন।

হাকিম সাহেবের স্ত্রী পরমা সুন্দরী। পারস্যের সমস্ত সুন্দরী গণকেও একত্রিত করিলে সে সৌন্দর্য্যের সমাবেশ হয় কি না সন্দেহ। ইহাও নাকি উজীরের সহিত মনোবাদের আর একটি কারণ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

একদিন সহসা শাহ হাকিমসাহেবকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। যথাসময়ে হাকিম সাহেব আসিলেন। গম্ভীরস্বরে শাহ বলিলেন, আমার পুত্রের রোগ কি, তাহা নিশ্চই তুমি বুঝিয়াছ; বোধ হয় আমি ভয় পাইব বলিয়া, তুমি তাহা প্রকাশ করিতে সাহস করিতেছ না; কিন্তু আমি প্রকৃত ব্যাপার শুনিতে চাহি, বল আমি তোমাকে আদেশ করিতেছি।

হা। জাহাঁপনা, আমি আপনাকে সন্তুষ্ট করিতে সক্ষম; দুর্ভেদ্য রহস্য ভেদ করিতে পারিয়াছি।

শা। তুমি তবে রোগ নির্ণয় করিতে পারিয়াছ। রোগের নাম—

হা। প্রেম। নবাবসাহেবের আহারে প্রবৃত্তি নাই, নিদ্রায় আসক্তি নাই, মনে উৎসাহ নাই, হৃদয়ে বল নাই—ইহার কারণ প্রেম। যাহার প্রেমে নবাবসাহেব মোহিত, তাহার সহিত মিলন না হইলে তাঁহার ক্ষুধা, নিদ্রা, আশা, উৎসাহ কিছুই ফিরিয়া আসিবে না।

শা। নবাবসাহেব কাহার প্রেমে মোহিত?

হা। এ প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি পারিলাম না, নবাবসাহেব তাহার নাম আমাকে বলিবেন না।

শা। আচ্ছা, আমিই নিজে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিব।

হা। আপনাকেও তিনি এ বিষয়ে প্রকৃত উত্তর দিবেন কিনা, সে সম্বন্ধে আমার দারুণ সন্দেহ আছে। যাহা হোক আপনি ভীত হইবেন না। রোগীর অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাহার গুপ্তকথা জানিবার উপায়, এ হাকিমের আছে। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আজ রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই আমি আপনাকে জানাইব, কোন্ রমণী নবাবসাহেবকে পাগল করিয়াছে। আপনার প্রধান উজীর সাহেবের আজ বিবাহ, বৈকালে আপনার রাজপ্রাসাদে অভ্যর্থনা সভা হইবে।

আজ নগরের সকল সুন্দরীই এখানে আসিবে। আপনি কোন প্রকারে এই পর্য্যন্ত বন্দোবস্ত করিবেন যে, নবাবসাহেবের সম্মুখ দিয়া যেন প্রত্যেক রমণী একা যায়। আমি, যেন অন্যমনস্কভাবে নবাবসাহেবের হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকিব এবং অতি সন্তর্পণে তাঁহার নাড়ীর গতি পরীক্ষা করিব, এক এক করিয়া রমণীগণ সম্মুখ দিয়া যাইতে আরম্ভ করিলে যাহাকে দেখিয়া নবাবসাহেবের নাড়ী দ্রুতবেগে চলিবে, বুঝিব তাহারই প্রেমে নবাবসাহেব মুগ্ধ।

শা। এ অতি চমৎকার উপায়! আচ্ছা, এইরূপে প্রকৃত রমণীর সন্ধানে যেন পাওয়া গেল, আর আমিও যেন তাহার সহিত পুত্রের বিবাহ দিলাম; কিন্তু তাহাতেই যে রোগ সারিবে তাহার প্রমাণ?

হা। বান্দার শির জামিন রাখিতে আজ্ঞা হউক।

শা। বেশ কথা। এক্ষণে বিদায় হও। সব ঠিক হইবে।

হাকিম সাহেব সেলাম করিয়া বিদায় হইলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

যথাসময়ে রাজবাটীতে অভ্যর্থনা সভা হইল। সভায় অত্যন্ত লোক সমাগমও হইল। রাজ সভাস্থ সমস্ত সুন্দরী সভায় উপস্থিত। হাকিমসাহেবের সুন্দরী স্ত্রী মনোরম পরিচ্ছদে ভূষিতা হইয়া সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। এমন কি, বড় উজীর সাহেবের নববধূ অপেক্ষাও তাঁহার সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিল, লোকে দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া গেল।

শাহ রাজ-সিংহাসনে উপবিষ্ট, তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে বিবর্ণ ও বিমর্ষ যুবরাজ। হাকিমসাহেব যুবরাজের হাত ধরিয়া নীরবে দণ্ডায়মান। শাহ রাজসভাসদ্‌গণকে জানাইলেন, এই শুভদিনে তাঁহার হস্ত চুম্বন করিতে তিনি সকলকে অনুমতি দিতেছেন। সম্রাটের এ অনুগ্রহ কিছু সহজলভ্য নয়; সকলেই মহানন্দে সমস্বরে আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিল।

উৎসব আরম্ভ হইল। প্রথমে রমণীগণ ও পরে পুরুষগণ সম্রাটের হস্ত চুম্বন করিল। বলা বাহুল্য, রমণীগণ সম্রাটের নিকটে যাইবার সময় নবাবসাহেবেরও সম্মুখ দিয়া যাইতে লাগিল। হাকিম সাহেবও ঔৎসুক্যের সহিত ফল প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ফল যাহা হইল হাকিম সাহেবই তাহা বুঝিলেন।

উৎসব শেষ হইলে শাহ নিজ কক্ষে গিয়া হাকিম সাহেবকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। হাকিমসাহেব কম্পিত কলেবরে বিবর্ণ ও বিরস বদনে রাজ-সমীপে দণ্ডায়মান হইলেন। শাহ হাকিম সাহেবের আকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া বলিলেন, হাকিম সাহেব, কি হইল, খবর কি?

হা। জাহাঁপনা, পরীক্ষা সফল হইয়াছে।

শা। বেশ বেশ। নবাবসাহেব কাহার প্রেমে উন্মত্ত?

হাকিমসাহেব দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বিমর্ষভাবে বলিলেন "তাহাকে জাহাঁপনাও চিনেন।—শাহ হাকিমের দীর্ঘনিশ্বাস শুনিয়া ফিরিয়া চাহিলেন, চাহিয়া বিস্মিত হইয়া গেলেন, বলিলেন "হাকিম সাহেব একি, তোমার শরীর বিবর্ণ কেন, ওরূপভাবেই বা উত্তর দিলে কেন?

হাকিম সাহেব পূর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘতর গভীর দুঃখ-ব্যঞ্জক দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া উত্তর দিলেন "আনন্দিত হইবার আমার কোনও কারণ নাই"। এই কথা বলিয়া হাকিমসাহেব একটু

নীরব হইলেন, কম্পিতস্বরে পুনরায় বলিলেন " যে রমণীর অভাবে নবাবসাহেব পীড়াগ্রস্ত, সে আমার স্ত্রী "।

শা। বাস্তবিকই তোমার স্ত্রী পরমা সুন্দরী—তাহার সৌন্দর্য্যে কাহার না মন মুগ্ধ হয়? পুত্রের ভালবাসা অপাত্রে অর্পিত হয় নাই।

হাকিম সাহেব নীরব—মুখে কথা নাই।

কিছুক্ষণ পরে শাহ কহিলেন "বেশ কথা, এক্ষণে আমার আদেশ শুন। তোমা দ্বারাই যখন নবাবসাহেবের রোগপ্রতিকারের যথার্থ ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তখন তুমি তাহা অবশ্যই রোগীকে দিতে বাধ্য, অর্থাৎ আমার পুত্রের সুখ-সম্পাদনার্থ তোমায় স্ত্রী পরিত্যাগ করিতে হইবে, অতএব তুমি তোমার স্ত্রীকে আমার পুত্রের হস্তে দিবার—।" শাহের কথা শেষ হইতে না হইতে হাকিম সাহেব উত্তর করিলেন "তাহা অসম্ভব, কারণ তাহাকে আমি আমার প্রাণাপেক্ষা অধিক ভালবাসি"।

শা। পত্নী পরিত্যাগে সকলেরই অনেক উপকার দর্শিবে।

হা। আমি সম্মত হইতে পারি না।

শা। ইহা তোমার কর্ত্তব্য।

হা। সে সম্বন্ধে আমার গভীর সন্দেহ আছে।

শা। সন্দেহ! এ বিষয় আমি আমার স্বপক্ষেই বিচার করিতে পারি। কিন্তু ভালবাসি তাই এখনও তোমার সম্মতির অপেক্ষা করিতেছি, নতুবা এতক্ষণ কোন্‌কালে একটী মাত্র কথায় ইহা সম্পন্ন হইয়া যাইত। অল্পক্ষণ নীরব থাকিয়া শাহ পুনরায় বলিলেন, আচ্ছা আমি এ সম্বন্ধে বড় উজীরকে জিজ্ঞাসা করিয়া তোমার সন্দেহ এখনই ভাঙ্গিয়া দিতেছি।

হা। জাহাঁপনার যেমন অভিরুচি।

শা। তিনি যাহা বিচার করিবেন, তাহাতেই কিন্তু তোমায় সম্মত হইতে হইবে। হতাশ্বাসের সহিত হাকিম সাহেব উত্তর করিলেন,—"হাঁ, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি।

তৎক্ষণাৎ বড় উজীর সাহেবের তলব হইল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মুহূর্ত্ত মধ্যে উজীর নিজ পদানুযায়ী গর্ব্বের সহিত বৈবাহিক বেশে রাজ-প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন এবং রাজাকে অভিবাদন করিয়া ঘৃণিতভাবে হাকিমসাহেবের প্রতি একবার চাহিলেন ও রাজাজ্ঞা অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

শাহ সংক্ষেপে নবাবসাহেব ও হাকিম সাহেবের বৃত্তান্ত উজীরকে বলিলেন। তিনি তাহা শুনিয়া সানন্দচিত্তে বলিলেন " জাহাঁপনা, হাকিম সাহেব কি এ প্রস্তাবে স্বীকৃত হইতেছেন না?—শাহ উত্তর করিলেন "না"।

উজীর সাহেব তখন গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিলেন "ইহাও কি সম্ভব? এ প্রস্তাবে সম্মত না হইলে নবাবসাহেব সুখ ইহজন্মের মত নির্ম্মূল হইবে, এমন কি ইহাতে তাঁহার জীবনেরও আশঙ্কা আছে। এরূপ অবস্থায় স্বার্থত্যাগ অবশ্য কর্ত্তব্য।
এবং আনন্দিত চিত্তে এ কর্ত্তব্য পালন করা উচিত। ধিক্ হাকিম সাহেব—এ প্রস্তাবে স্বীকৃত না হওয়া যে মহাপাপ। সম্রাটের জন্য স্বার্থত্যাগ পৌরুষের কার্য্য, সিংহাসনের ভবিষৎ অধিকারীর মঙ্গলের জন্য আত্মবলিদান গৌরবের বিষয়। স্বার্থত্যাগ—

সম্রাট উজীরের কথায় বাধা দিয়া বলিলেন "হাকিম সাহেব, উজীরের কথা শুনিলেতো? স্বার্থত্যাগ ভিন্ন তোমার আর এখন উপায়ান্তর নাই। এখন"—

হাকিম সাহেব যেন বজ্রাহতের ন্যায় অসংলগ্ন কথায় ইহার প্রতিবাদ করিতে যাইলেন।

শাহ তখন চটিলেন, বলিলেন "না, হাকিম সাহেব, তুমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, উজীর সাহেবের বিচারমত কার্য্য করিবে। নবাব সাহেব তোমার স্ত্রীকে বিবাহ করিবেনই। শীঘ্রই তুমি স্ত্রীত্যাগের অনুমতি পাইবে।"

হাকিম সাহেব দুঃখে ও ক্রোধে প্রধান তীব্র কটাক্ষ করিয়া বলিলেন "উজীর সাহেব, ইহাই কি আপনার প্রকৃত মত? যদি আজ আপনি আমার মত অবস্থায় পড়িতেন, তাহা হইলে আপনিও কি এইরূপ স্বার্থত্যাগে স্বীকৃত হইতেন?"

উজীর সাহেব, বিশাল শ্মশ্রুরাশি দোলাইয়া দৃঢ়তার সহিত উত্তর করিলেন "আনন্দের সহিত করিতাম, সন্দেহ নাই।"

শাহ উজীরের রাজভক্তি দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। উজীরের দৃঢ়তা দেখিয়া কিন্তু এইবার হাকিম সাহেবের ভাবান্তর হইল। তাঁহার চক্ষুদ্বয় ঘুরিতে লাগিল, অধরে একটু ক্ষীণ হাসির রেখা দেখা দিল। তিনি জানু পাতিয়া শাহের দিকে চাহিয়া বলিলেন "জাহাঁপানা, আমাকে ক্ষমা করুন, আমি আপনাকে প্রতারণা করিয়াছি।"

শাহ চমকিত হইয়া উঠিলেন। উজীর সাহেব ভ্রুকুটী প্রদর্শন করিলেন। সাশ্চর্য্যে শাহ বলিলেন "আমাকে প্রতারণা!"

হাকিম সাহেব অধিকার দৃঢ়তার সহিত বলিলেন "হাঁ আপনাকেই। আমার স্ত্রী নবাব সাহেবের মন মোহিত করিতে সমর্থ বটে, কিন্তু তাহার অদৃষ্টে সে সৌভাগ্য বিধাতা লিখেন নাই।"

শাহ বলিলেন "তোমার স্ত্রী নয়, কে তবে—"

হাকিম সাহেব উজীর সাহেবের দিকে ভ্রুকুটি করিয়া চাহিলেন। সে চাহনিতে উজীর সাহেব মুখ নামাইয়া লইলেন। হাকিম সাহেব শাহের দিকে চাহিয়া বলিলেন "কে? বলিতেছি, শ্রবণ করুন—সে একটী সুন্দরী যুবতী, তাহার গুণ অশেষ, তাহার মত রূপবতী পরীকুলেও নাই নহিলে সে জাঁহাপনা ব্যতীত রাজ্যের সর্ব্বপ্রধান শক্তিশালী পুরুষের হৃদয় বশীভূত করিতে পারিত না। সে রমণী এই উজীর সাহেবের এবারকার নির্ব্বাচিতা পাত্রী, মৌলবী সাহেবের কন্যা। শাহ উজীর সাহেবের মুখের দিকে চাহিলেন। প্রথমতঃ শুধু সন্দেহের ঘোরে বিবর্ণ উজীর সাহেব এখন কালিমাময়। হাকিম সাহেব তখন সে কৃত্রিম দুঃখ প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া উজীর সাহেবের প্রতি পুনঃরায় কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া পরিষ্কার সহজস্বরে বলিলেন "উজীর সাহেবের নির্ব্বাচিতা এই রমণী ভিন্ন নবাবসাহেবের রোগ সারিবে না। হাকিম সাহেবের কথা শেষ হইবামাত্র যেন সকলের মনে সহসা পটপরিবর্ত্তন হইল। শাহ বিস্ময়ান্বিত, উজীর সাহেব উন্মত্তপ্রায় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়, হাকিম সাহেব প্রফুল্লচিত্ত।

শাহ তখন উজীরকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "এখন ঘটনা ভিন্নরূপ, অতএব আপনি বিবাহের আশা পরিত্যাগ করুন।"

উজীর সাহেব উচ্চৈস্বরে বলিয়া উঠিলেন "অসম্ভব"। হাকিম সাহেব তখন উজীর সাহেবের পূর্ব্ব হাবভাব অনুকরণ করিয়া বলিতে লাগিলেন "এরূপ অবস্থায় স্বার্থত্যাগ অবশ্য কর্ত্তব্য এবং আনন্দিতচিত্তে এ কাজ করা উচিত। ধিক্ উজীর সাহেব, এ প্রস্তাবে সম্মত না হওয়া যে মহাপাপ। সম্রাটের জন্য স্বার্থত্যাগ পৌরুষের কার্য্য, সিংহাসনের ভবিষ্যৎ অধিকারীর মঙ্গলের জন্য আত্মবলিদান গৌরবের বিষয়। স্বার্থত্যাগ"—

উজীর সাহেব সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত—তাঁহার উপর যেন হীনপ্রাণতার ছায়া বিরাজিত; তিনি স্বর্গ হইতে একেবারে যেন নরককুণ্ডে স্থানান্তরিত, নির্ব্বাক্, নিষ্পন্দ।

হাকিম সাহেব তখন আনন্দে দুই হস্ত এরূপ ভাবে মর্দ্দন করিতে লাগিলেন যে, হস্তদ্বয় হইতে রুধিরধারা বাহির হইবার উপক্রম হইল। তিনি বলিতে লাগিলেন, "এইমাত্র আপনি বলিলেন যে, আমি যাহা করিতে অসম্মত হইতেছিলাম তাহা আপনি আনন্দের সহিত করিতে প্রস্তুত আছেন। আপনার স্বার্থত্যাগ যথার্থই বীরোচিত। যাহা হউক বোধ হয়, আপনার জানা আছে যে, পারস্যে কোন রাজকর্ম্মচারী দুই মিনিট মধ্যে তাহার নিজ কথার প্রতিবাদ করিতে অক্ষম; এ নিয়ম ভঙ্গের শাস্তিও অতি কঠোর।"

উজীর সাহেব এ কথায় যেন ঈষৎ আশান্বিত হইয়া উঠিলেন; তাঁহার মুখের ভাব ফিরিল। তিনি হাকিম সাহেবের দিকে না চাহিয়া শাহের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "জাঁহাপনা, আমিও তাই বলি; হাকিম সাহেব জানিয়া শুনিয়া পারস্যের সম্রাটের সম্মুখে দাঁড়াইয়া প্রথমতঃ সত্যকথা বলিলেন, কিন্তু এক্ষণে নিজের বিপদ বুঝিতে পারিয়া হঠাৎ কথা ঘুরাইয়া লইতেছেন। ইহা কি প্রতারণা নহে? ইহা কি আত্মরক্ষার্থ প্রবঞ্চনাপূর্ণ বৃথা আকিঞ্চন নহে? এ দোষ কি পারস্য সম্রাটের নিকট দণ্ডার্হ নহে?"

শাহ বলিলেন "উজীর সাহেব, হাকিম সাহেব স্বীকার করিয়াছেন যে, প্রথমে তিনি আমায় প্রবঞ্চনা করিয়াছিলেন; কিন্তু শেষে সত্য কথা কহিয়াছেন।"

উজীর বলিলেন "—তাহার প্রমাণ?—যে প্রথমবার সম্রাট সম্মুখে নিষ্প্রয়োজনে মিথ্যা বলিল, সে যে দ্বিতীয় বারেই সত্য কথা বলিয়াছে, তাহার প্রমাণ?"

শাহ কি বলিতে যাইতেছিলেন; কিন্তু হাকিম সাহেব দ্রুত অথচ ধীর গম্ভীরস্বরে বলিলেন "তাহার প্রমাণ—যে প্রথম বারে যাহা বলিয়াছিল, তাহার সত্যাসত্য দেখাইবার জন্য কোন প্রমাণ দেয় নাই বা যাহার কথার সত্যাসত্য দেখাইবার জন্য প্রমাণ আবশ্যক হয় না, সে যখন নিজে স্বীকার করিতেছে যে, তাহার প্রথম কথা মিথ্যা, দ্বিতীয় কথা সত্য, তখন তাহাই বিশ্বাস্য হওয়া উচিত।"

উজীর এই উদ্ধত বাক্য শুনিয়া বলিলেন—"হইতে পারে আবশ্যকমত সেই ব্যক্তি, আবার এখনই তাহার দ্বিতীয় বাক্যকেও মিথ্যা বলিয়া প্রচার করিতে চাহিবে; কারণ, পারস্যের দণ্ডবিধিতে প্রবঞ্চনাকারীর দণ্ড—ফাঁসীকাষ্ঠে প্রাণবধ!"

হাকিম সাহেব শান্তভাবে বলিলেন "যে নিজ বাক্য প্রবঞ্চনা বলিয়া সম্রাটের সম্মুখে অনায়াসে ব্যক্ত করিতে পারে, সে যে কোন দিন প্রাণভয়ে সত্যকে মিথ্যা করিবে না, এটা পারস্যের প্রধান উজীরের বুঝা উচিত ছিল।"

শাহ বৃথা বাক্‌বিতণ্ডায় চটিয়া বলিলেন—"না হাকিম সাহেব, তাহা হইবে না, আমি তোমার কথার প্রমাণ চাই; কারণ, আমার বিশ্বাস, মৌলবী সাহেবের কন্যা অপেক্ষা তোমার স্ত্রীর রূপেই লোকের বিশেষতঃ যুবকগণের চিত্ত বেশী পাগল হইতে পারে। যদি ইহা মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ করিতে পার, তবে তোমার দ্বিতীয় কথানুসারে কার্য্য করিতে পারি, নতুবা তোমাকেই স্ত্রীত্যাগ করিতে হইবে।"

উজীর সাহেব এই আদেশে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন; কিন্তু হাকিম সাহেব সমান প্রশান্ততার সহিত বলিলেন "তাহাতে ফল হইবে, আমাদের বৃথা দম্পতীবিচ্ছেদ, নবাব সাহেবের অকাল, মৃত্যু।"

শাহ বলিলেন "তবে প্রমাণ চাই, নতুবা তোমার কথা বিশ্বাস্য নহে।

হাকিম সাহেব বলিলেন "বন্দে নেওয়াজ, বান্দার কথায় যখন বিশ্বাস নাই, তখন আমার ঔষধ বা ব্যবস্থা অবলম্বন বিশ্বাস করিবার প্রয়োজন কি? আমার বিদায় দিন।"

শাহ ক্রোধে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন "তবে প্রবঞ্চনাকারীর দণ্ড লও।"

তখন হাকিম সাহেব জানু পাতিয়া সেলাম করিয়া বলিলেন, "গরীব-নেওয়াজ, এ বান্দা পারস্যের অধীশ্বর—শাহকে চিনে, সুতরাং প্রমাণহীন কোন কথা বলে নাই। যদি প্রমাণ আবশ্যক হয়, তবে যাঁহার কন্যাকে লইয়া কথা, সেই মৌলবী সাহেবকে ডাকিয়া পাঠান; তিনিই বলিবেন, নবাব সাহেব তাঁহার কন্যায় আসক্ত কিনা এবং তাঁহার কন্যাও নবাব সাহেবকে ভাল বাসে কিনা?"

উজীর শুনিয়া আবার উন্মনায়মান হইয়া তাড়াতাড়ি বলিলেন "এরূপ স্থলে ওরূপ সাক্ষীর কথা গ্রাহ্য নহে; কারণ, নিজ কন্যাকে নবাব সাহেবের বাঁদী করিবার জন্য কে না মিথ্যা বলিয়া প্রস্তুত হইবে?"

হাকিম সাহেব দৃঢ় কড়মড় করিয়া বলিলেন "খবরদার, হাজী *—মৌলবী সাহেবকে মিথ্যাবাদী বলিলে মুসলমানের জাহান্নামেও † স্থান হইবে না।"

উজীর থামিয়া গেলেন। শাহ মৌলবী সাহেবকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

যথাসময়ে মৌলবী সাহেব আসিয়া অভিবাদন করিলে, শাহ বলিলেন "মৌলবী সাহেব, শুনিলাম, আপনি আপনার কন্যার সহিত নবাব সাহেবের আসকের ‡ কথা জানেন; তবে আপনি উজীর সাহেবকে কন্যা দিতেছেন?"

মৌলবী বলিলেন—"জাঁহাপনা, এখনও দিই নাই কখনও দিব না। উজীর সাহেবকে কন্যা দিবার পূর্ব্বে হয় আমার নতুবা উঁহারই প্রাণ যাইবে।"

শাহ সাশ্চর্য্যে জিজ্ঞাসিলেন "কেন? সেকি?"

মৌলবী সাহেব কটিদেশে লুক্কায়িত পেশকবচ § বাহির করিয়া দেখাইয়া বলিলেন "উজীর সাহেব আজ ৪।৫ মাস আমার কন্যার জন্য চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু আমি দিই নাই; কারণ, ইতিপূর্ব্বে নবাব সাহেবের সহিত উহার আসক্ত আমি জানিতাম। তৎপরে আমার অভিপ্রায় জানিয়া উজীর সাহেব বলপূর্ব্বক কন্যা হরণ করিবার চেষ্টায় থাকেন, তাহাতে কৃতকার্য্য না হইয়া শেষে বিবাহ প্রস্তাব করায় আমারও ইচ্ছা হয় যে, পৃথিবী হইতে এ কণ্টক না গেলে এ রাজ্যে কাহারও স্ত্রীকন্যা লইয়া ঘুম হইবে না, সুতরাং উঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিলাম। স্থির ছিল, বিবাহের সভাতেই এই পেশকবচখানি আমূল ঘাড়ে বসাইয়া দিয়া না হয় ফাঁসীতে ঝুলিব। উঁহার ভয়ে যে কন্যা দিতে চাহিয়াছিলাম তাহা নহে, বরং স্থির করিয়াছিলাম যে, এই সুযোগে যাহাতে দেশের ঐ কণ্টকটি বিদায় হয় তাহা করিব,"

শাহ ও উজীর চমকাইয়া উঠিলেন। উজীর কিন্তু মৃতপ্রায় হইয়া বসিয়া পড়িলেন।

শাহ বলিলেন "আপনি এ কথা আমায় জানান নাই কেন?"

---

* হাজী—যাহারা 'হজ' করিয়াছে অর্থাৎ মক্কায় গিয়াছে। মক্কা হইতে ফিরিয়া আসিয়া মুসলমানদিগের পাপ করা শাস্ত্র নিষিদ্ধ।

† নরক।

‡ আসক্—প্রেম, ভালবাসা।

§ ছোট খড়্গাকার ছুরী, কোমরে বাঁধা থাকে।

মৌলবী বলিলেন "আমি সময় প্রতীক্ষায় ছিলাম; কারণ সময়ে ঈশ্বরের ইচ্ছায় অতি কঠিন বিষয়েরও সুন্দর মীমাংসা হইয়া যায়। আর পাপীর শাস্তি খোদাই দিয়া থাকেন, আমি কে? যে আমি তাহার শাস্তি দিব।" তবে যে পেশকবচ রাখিয়াছিলাম, সে তাঁহার ইচ্ছানুসারে তাঁহার কার্য্যেই লাগিয়া যাইত।"

উজীর সাহেব কাষ্ঠপুত্তলিকার মত শুনিতে লাগিলেন আর নিস্পন্দভাবে বসিয়া রহিলেন।

শাহ বলিলেন "মৌলবী সাহেব, আপনার কন্যাকে তাহার প্রণয়পাত্রের হস্তে দিতে উদ্যোগ করুন। নবাব সাহেব শাহার জন্য নীরবে জীবন বিসর্জ্জন দিতে বসিয়াছেন। হাকিম সাহেব, তোমার কথাই সত্য। আমি তোমার প্রমাণে খুসী হইয়াছি। উজীর সাহেব আর তোমার কোন কথা কহিবার আবশ্যক নাই, এ কন্যার আশা ত্যাগ কর।"

হাকিম সাহেব বলিলেন "উজীর সাহেব শুনিলেন, আমি প্রথম কথা বলিয়া নিষ্প্রয়োজনে প্রবঞ্চনা করি নাই।

মৌলবী হাজী সাহেবের উপর আপনি যে সমস্ত অত্যাচার করিয়াছেন, তাহা জাহাঁপনার সম্মুখে উত্থাপন করাই ইহার উদ্দেশ্য। আর ইহাতে মৌলবী সাহেবের হস্তে আপনার প্রাণও বাঁচিল।

উজীর সাহেবের আর অন্য উত্তর দিবার কথা নাই; অগত্যা বাধ্য হইয়া তখন সম্রাটকে "জাহাঁপনার আজ্ঞাই প্রতিপালিত হউক" বলিয়া অভিমানে, ক্ষোভে, দুঃখে অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেলেন।

দশম পরিচ্ছেদ

শীঘ্রই নবাব সাহেবের বিবাহের দিন স্থির হইল। মহা সমারোহে মৌলবী-কন্যার সহিত নবাব সাহেবের শুভ পরিণয় সম্পন্ন হইয়া গেল। দুই তিন সপ্তাহের মধ্যে তিনিও তাঁহার পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইলেন, সকল রোগ দূরীভূত হইল।

বিবাহের পর এক বৎসর মধ্যে ক্রমান্বয়ে পাঁচ ছয় মাস কঠিন পীড়ায় দারুণ কষ্ট ভোগ করার পর শাহের মৃত্যু হইল। কৃতান্তের নিকট দুর্দ্দান্তের পরাজয় হইল।

দেশ মধ্যে খরতরবেগে আনন্দ-স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। প্রজাগণ যেন নবজীবন লাভ করিল। নবাবসাহেব রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পিতার নিয়মাদি তুলিয়া দিয়া উপযুক্ত রূপে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। প্রজাবৃন্দ নির্ভয়ে শান্তি সুখের ছায়ায় বাস করিতে লাগিল।

নবাব সাহেবের অভিষেকের পর প্রধান উজীর সাহেব চির অবসর লইয়া মক্কা গেলেন, তিনি আর বিবাহও করিলেন না। তাঁহার শিক্ষিত পুত্র তাঁহার পদাভিষিক্ত হইলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হাকিম সাহেবই রাজ্যের প্রধান নায়ক হইয়া রহিলেন।

শুনা যায়, মক্কা হইতে আসিয়া ভূতপূর্ব্ব উজীর সাহেব হাকিম সাহেবের সহিত সৌখ্য স্থাপন করিয়াছিলেন।

শ্রীকালীচরণ মিত্র।

রোমিও জুলিয়েট

ভেরোনা নগরে কপুলেট ও মণ্টেগ নামক দুই গোষ্ঠির বসতি ছিল। উভয় গোষ্ঠিই সম্ভ্রান্ত কিন্তু উভয় বংশে বহুদিন হইতে এরূপ বিবাদ বিসম্বাদ চলিয়া আসিতেছিল যে, উভয় বংশের লোকের কথা দূরে থাকুক, তাঁহাদিগের উভয় বংশের ভৃত্যগণেরও যদি পথিমধ্যে দেখা সাক্ষাৎ হইত, তবে তৎক্ষণাৎ বিবাদ বাধিত। এই উভয় বংশের বিবাদে কতদিন রাজপথ রক্তরঞ্জিত হইয়াছে; আর কাগজে কলহের ত কথাই নাই। উভয় বংশের এইরূপ আড়াআড়ি দেখিয়া ভেরোনাধিপতি নিয়ম করিয়াছেন,—এখন যে, ঐ বিবাদ বাধাইয়া শান্তিভঙ্গ করিবে, তাহাকেই কঠিনরূপে দণ্ড প্রদত্ত হইবে।

একদা রাত্রে কপুলেট ভবনে ভারি একটা উৎসব আরম্ভ হইয়াছে। মণ্টেগ-বংশীয় ভিন্ন আর ভেরোনার যাবতীয় লোকই সে উৎসবে আহূত ও নিমন্ত্রিত হইয়াছে।

মণ্টেগ বংশপতির একমাত্র পুত্র রোমিও, রোজালিন নাম্নী একটি যুবতীকে ভালবাসিয়াছিলেন, কিন্তু রোজালিন রোমিওকে ভাল বাসিতেন না। রোমিওর প্রাণ, একবার রোজালিনকে দেখিলে, কত আনন্দ অনুভব করিত—একবার তাঁহাকে দেখিবার জন্য রোমিওর প্রাণের কত আকুল বাসনা; কিন্তু রোজালিন রোমিওকে দেখা দিতে ভাল বাসিতেন না। পোড়া প্রেমের কেমনই মোহিনী মায়া, তবুও রোমিও তাঁহাকে ভুলিতে পারেন না। রোমিওর বন্ধু বেনভোলিও এজন্য রোমিওর উপর বড় চটা,—তিনি কত দিন রোমিওকে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়াছেন যে, রোজালিন কুরূপা, অরসিকা, তাহাকে তুমি বিস্মৃত হও; কিন্তু রোমিও ভুলিতে পারেন না। আজি সুবিধা বুঝিয়া বেনভোলিও রোমিওকে বলিলেন,—"কপুলেট ভবনে উৎসব হইতেছে, সেখানে ভেরোনার অনেক সুন্দরীর সমাগম হইবে, রোজালিনও তথায় যাইবে, চল বন্ধু, সেই সকল সুন্দরীগণের তুলনায় তোমাকে দেখাইয়া আনি যে, তুমি যাহাকে রাজহংসী ভাব সে, রাজ হংসী নহে, বায়সী।"

বেনভোলিওর কথায় রোমিও কপুলেট ভবনে যাইতে স্বীকৃত হইলেন। রোজালিনকে তুলনা করিয়া দেখিতে যাওয়া, তাঁহার প্রাণের অভিলাষ নহে,—তাঁহার বাঞ্ছা সেখানে রোজালিন আসিয়াছেন, তবু একবার দেখিতে পাইব।

তাঁহারা দুই বন্ধুতে নর্ত্তকবেশে কপুলেট ভবনে উৎসব স্থলে গমন করিলেন। সেখানে লোকে লোকারণ্য প্রাসাদ আলোকমালায় বিভূষিত ও বিবিধ সাজে সুসজ্জিত; আর অগণ্য সুন্দরী যুবতীগণ সে স্থলের শোভাতিশয় বর্দ্ধিত করিয়াছেন। রোমিও দেখিলেন, সে সকল রাজহংসী মধ্যে তাঁহার রোজালিন বায়সীই বটে। প্রেমে এরূপ হয় না সত্য; প্রেমের চক্ষে কুরূপ হইলেও সেই সুন্দর। প্রেম কুরূপকে সুরূপ করিয়া দেখায়, কিন্তু প্রেম ঘাত-প্রতিঘাত-সাপেক্ষ,—রোজালিন ভাল বাসিত না,—আর রোমিও কেবলই ভাল বাসিতেন, সে ভালবাসায় কখনই স্থায়ীত্ব সম্ভবে না।

রোমিও দেখিলেন, সেই সকল সুন্দরী যুবতীর সৌন্দর্য্য রাশি নিষ্প্রভ করিয়া একটি যুবতীর অপরূপ রূপচ্ছটা প্রতিভাসিত হইতেছে। রোমিও একদৃষ্টিতে সেরূপ রাশি দেখিতে লাগিলেন,—দেখিয়া আর তাঁহার নয়নের তৃপ্তি হয় না, দেখার সাধ আর মিটে না। যুবতীও রোমিওর দিকে চাহিতে লাগিলেন, রোমিওও স্বভাব-সুন্দর—তাঁহাদের চাওয়া-চাহিতে বুঝি একটা গোলযোগ বাধিয়া উঠিল।

বহ্নিকে কতক্ষণ বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া রাখা যাইতে পারে? রোমিও ছদ্মবেশে অধিকক্ষণ লুক্কায়িত থাকিতে পারিলেন না, কপুলেট দলপতির ভ্রাতষ্পুত্র টাইবল্ট তাঁহাকে চিনিয়া ফেলিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইল; কিন্তু কপুলেট দলপতি তাঁহাকে নিবারণ করিয়া বলিলেন, "নগরের লোক সকলেই রোমিওর প্রশংসা করিয়া থাকে, বিশেষতঃ রোমিও এখানে আসিয়া কোনরূপ অভদ্রতাচরণও করেন নাই, তাঁহার উপর এখন অত্যাচার করিলে, নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ বিরক্ত হইয়া উঠিয়া যাইবেন। টাইবল্ট নিরস্ত হইল, কিন্তু মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল,—ইহার প্রতিশোধ সময়ান্তে লইব।

রোমিও কিন্তু সে সব গোলযোগের দিকে লক্ষ্যও নাই, তিনি সেই সুন্দরীর অপরূপ রূপ দর্শনে বিমোহিত ছিলেন। নির্নিমেষ নয়নে সেই রূপসুধা পান করিতেছিলেন। সহসা সেই যুবতীর ধাত্রী আসিয়া নিবেদন করিল, "আপনার জননী আপনাকে ডাকিতেছেন।"

যুবতী ধাত্রীর সহিত গমন করিলেন; কিয়দ্দূর গেলে রোমিও অবসর বুঝিয়া তাঁহার নিকট গিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিলেন। উভয়ের বচন বৈদগ্ধতায় উভয়ে আস্তে আস্তে উভয়ের পক্ষপাতী হইয়া পড়িলেন। শেষে ধাত্রীর নিকট জিজ্ঞাসা করায়, রোমিও জানিতে পারিলেন,—এই সর্ব্বাঙ্গীন সৌন্দর্য্য-প্রতিমা যুবতী কপুলেট গোষ্ঠিপতির একমাত্র কন্যা, জুলিয়েট। জুলিয়েটও কিয়দ্দূর গমন করিয়া ধাত্রীর নিকট যুবকের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—ধাত্রী বলিল, "ঐ সর্ব্ব-গুণসম্পন্ন ও সুন্দর যুবক মণ্টেগগোষ্ঠিপতির পুত্র রোমিও।"

এই কথা শুনিবামাত্র জুলিয়েট শিহরিয়া উঠিলেন। সুশুভ্রা চাদনী যামিনীতে যেন সহসা কোথাহইতে এক খণ্ড ক্ষুদ্র মেঘের উদয় হইল। জুলিয়েট যাইতে যাইতে অনেকক্ষণ গভীর চিন্তা করিতে লাগিলেন। শেষে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন,—

হায়, বিধি একি দায় হইল আমার।
যারে হেরি মুখফিরে যাইব ঘৃণায়,
কোন্ কর্ম্ম করি তারে তুলিতু হৃদয়ে,
ছাই হ'ল চন্দন আমারে পুড়াবারে।

ধাত্রী ইহা শ্রবণ করিয়া সাশ্চর্য্যে এবং বিস্মিত ভাবে বলিল,—"তুমি কি বলিতেছ, জুলিয়েট?"

ধাত্রীর কথায় জুলিয়েটের চমক ভাঙ্গিল, মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "আজি উৎসব সভায় এই শ্লোকটি শিখিয়াছি।"

এ দিকে ক্রমে রাত্রি অত্যন্ত অধিক হওয়াতে উৎসব বন্ধ হইয়া গেল। নিমন্ত্রিত ব্যক্তি-গণ স্ব স্ব ভবনে গমন করিলেন। উৎসব স্থল জনশূন্য হইল। আর থাকিলে চলে না, রোমিওকে যাইতে হইবে; কিন্তু যে মন হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে, সে মনোহারিণী ভাবিনীর ভবন পরিত্যাগ করিয়া যাইতে যেন রোমিওর প্রাণ স্বীকৃত হইল না; তবুও না গেলে চলে না—কাজেই সঙ্গিগণের সহিত বাহির হইয়া কিয়দ্দূর আসিয়া ছলে কৌশলে রোমিও তাঁহা-দিগের সঙ্গ পরিত্যাগ করিলেন এবং অনেকক্ষণ চিন্তার পর তিনি এক অসমসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি চিরবৈরী কপুলেটদিগের প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া, অন্তঃপুর সংলগ্ন উদ্যান মধ্যে প্রবেশ করিলেন। রোমিও একবার ভাবিলেন না যে, কপুলেটগণ যদি তাঁহাকে এরূপ ভাবে দেখিতে পায়, তবে এখনি তাঁহার অমূল্য জীবন ধ্বংস করিয়া ফেলিবে। হায়! প্রেমোন্মত্ততা জন্মিলে যুবক যুবতীগণকে এইরূপই বিচারশক্তি শূন্য হইয়া পড়ে।

প্রেমের মিলন বড় আশ্চর্য্যজনক। রোমিও সেই উদ্যান মধ্যে জুলিয়েটের রূপরাশি ধ্যান করিয়া পদ চারণা করিয়া বেড়াইতেছেন, সহসা জুলিয়েটের গবাক্ষ দ্বার উন্মুক্ত হইল।

রোমিও চন্দ্রকিরণে দেখিলেন যেন, আঁধাররাশি বিদূরিত করিয়া ঊষা আসিয়া পূর্ব্বদিক্‌ভাগে উদিত হইলেন, যেন তাঁহার উদয়ে রোমিওর মনের সমস্ত আঁধার বিদূরিত হইয়া গেল। জুলিয়েটের শরীরে এখনও সেই উৎসবের বেশ শোভা পাইতেছে। সুন্দরী আসিয়া গবাক্ষদ্বারে দাঁড়াইয়া কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। শেষে সুদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, হায় রোমিও! তুমি রোমিও হইলে কেন? তুমি মণ্টেগ বংশে জন্ম গ্রহণ করিলে কেন? রোমিও প্রাণাধিক—তুমি মণ্টেগ নাম পরিত্যাগ কর: নাথ, নামে কি আসে যায়? স্বভাব সুন্দর গোলাপকে যদি কেহ গোলাপ না বলিয়া অন্য কিছু বলে, তবে তাহাতে কি আসে যায়? গোলাপের সৌন্দর্য্য ও গুণরাশি অন্য নামে কখনই নষ্ট হয় না, আর নাম যদি পরিত্যাগ করিতে না পার,—আমার সম্মুখে আসিয়া বল, জুলিয়েট, আমি তোমাকে গ্রহণ করিলাম। প্রাণাধিক তাহা হইলে এখনই আমি কপুলেট নাম পরিত্যাগ করিতেছি।"

রোমিও উদ্যানে দাঁড়াইয়া তাঁহার মনোহারিণী জুলিয়েটের মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া একেবারে আনন্দে নিমগ্ন হইয়া গেলেন। তিনি আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিলেন না। অবসরোচিত কাল বিবেচনা করিয়া রোমিও বলিয়া উঠিলেন—"প্রসন্না হও, আমি তোমাকে গ্রহণ করিলাম।"

সহসা মনুষ্য কণ্ঠশব্দে জুলিয়েট চমকিয়া উঠিলেন; কিন্তু সে স্বর যে তাঁহার চির পরিচিত। প্রণয়ের কেমনই মাহাত্ম্য! জুলিয়েট রোমিওর কেবল গুটিকয়েক কথামাত্র শুনিয়াছিলেন—তবু সে স্বর যেন তাঁহার চিরপরিচিত। জুলিয়েট রোমিওকে চিনিলেন। রোমিও বিশেষ বিপদাশঙ্কা জানিয়া বলিলেন, "আপনি কি করিয়াছেন? আপনার কি স্মরণ নাই যে, কপুলেটবংশ আপনাদের চির শত্রু? কেহ দেখিতে পাইলে এখনই যে মহা সর্ব্বনাশ ঘটিবে।"

রোমিও। ভয় নাই—এ রাত্রি কালে আমাকে কেহ চিনিতে পারিবে না। শীত-নিবারক খুব মোটা কাপড়ে আমার দেহ আবৃত আছে।

জুলিয়েট। এমন সুদীর্ঘ প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া আপনি এখানে কোন সাহসে আসিলেন।"

রোমিও। এত সামান্য দুর্ম্মুখি! তোমা হেন রত্ন যদি অকূল সমুদ্র পারে থাকিত—আমি সেখানেও গমন করিতেও কুণ্ঠিত হইতাম না। এক্ষণে বল, আমি যাহার জন্য এত পাগল হইয়াছি, তাহা পাইব কি না—আমার আশা পূর্ণ হইবে কি না।

জুলিয়েট। আমার মনের কথা বোধ হয়, আপনি সকলই শুনিয়াছেন। যদি আমাকে পবিত্র-ভাবে গ্রহণ করিতে অভিলাষী হয়েন, তবে নিশ্চয়ই আমি আপনার। এ হৃদয়ে আপনার ছবি একেবারে খোদিত হইয়া গিয়াছে।

রোমিও বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইলেন। তখন জুলিয়েট বলিলেন, "আজ আর অধিকক্ষণ আপনি এখানে থাকিবেন না, বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা। আপনি কল্য পুরোহিত ঠিক্ করিয়া আমাকে সংবাদ দিবেন, গোপনীয় স্থানে আমাদিগের বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন হইবে। বলা বাহুল্য আমাদিগের পিতামাতার মত লইয়া এ বিবাহ কিছুতেই সম্পন্ন হইবার নহে।

রোমিও হাতে স্বর্গ পাইলেন। তিনি আনন্দ চিত্তে সে সকল কথায় স্বীকৃত হইলেন।

প্রেমিক প্রেমিকায় কথোপকথন হইতেছে, এমন সময় জুলিয়েটের ধাত্রী জুলিয়েটকে শয়ন করিতে ডাকিল। "এখনি আবার আসিতেছি, তুমি দাঁড়াও" রোমিওকে এই কথা বলিয়া জুলিয়েট ধাত্রীর নিকট গমন করিলেন। আবার কিয়ৎক্ষণ পরেই গবাক্ষদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আবার কথোপকথন হইতে লাগিল,—আবার ধাত্রী ডাকিল। জুলিয়েট একবার ধাত্রীর নিকট ও একবার গবাক্ষে আসা-যাওয়া করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের কথা আর ফুরায় না,—বলিয়া

বলার শেষ আর হয় না। হারমোনিয়ম, পিয়ানোপ্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের স্বর অপেক্ষা প্রেমিক প্রেমিকা পরস্পরের কথা অধিক মিষ্ট জ্ঞান করিয়া থাকে।

অবশেষে পূর্ব্ব গগনে শুকতারার সমুদয় দেখিয়া রোমিও বিদায় লইলেন।

৩

প্রিয়তমার নিকট বিদায় লইয়া রোমিও রাজপথে সমাগত হইলেন। এখন তিনি কোথায় যাইবেন? বাড়ী যাইতে তাঁহার ইচ্ছা হইল না। তিনি বিবাহের পুরোহিত যোগাড় করিবেন স্থির করিলেন।

ভেরোনার লরেন্স নামক একজন পরহিতব্রতে ব্রতী সন্ন্যাসী বাস করিতেন। রোমিওর সহিত ফ্রায়ার লরেন্সের বিশেষ আলাপ পরিচয়ও ছিল এবং রোমিও যে রোজালিনকে ভাল বাসিতেন, ফ্রায়ার লরেন্স তাহাও জানিতেন। রোমিও এ বিবাহ দিবার জন্য তাঁহারই শরণাগত হওয়া উচিত বিবেচনায় তাঁহারই আশ্রমাভিমুখে গমন করিলেন।

সে সময় উষা,—সূর্য্যদেব রক্তিম রাগে পূর্ব্বগগনে উদিত হইয়া একটু পরেই ধরণীর নীহারাশ্রু মুছাইয়া দিবেন। ফ্রায়ার লরেন্স পদার্থ-তত্ত্বজ্ঞ; তিনি রোগার্ত্ত ব্যক্তির যন্ত্রণার লাঘব করিতে পারিবেন বলিয়া চিকিৎসা-শাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ আস্থা ছিল।

রোমিও মঠে উপস্থিত হইলেন। ফ্রায়ার লরেন্স তাঁহার ভাবভঙ্গী দর্শনে বুঝিলেন, রোমিও যুবক সুতরাং যুবজনসুলভ মত্ততায় প্রমদা-প্রসঙ্গে রাত্রি-জাগরণ করিয়া আসিয়াছেন। রোজালিনকে রোমিও ভাল বাসিতেন, লরেন্স তাহাই জানিতেন, সুতরাং তিনি ভাবিলেন, রোমিও নিশ্চয়ই রোজালিনের সহিত রজনী যাপন করিয়াছেন; কিন্তু শীঘ্রই তাঁহার এ ভ্রম দূরীভূত হইল। তিনি অবিলম্বেই রোমিওর নিকট সমস্ত কথা শুনিলেন। তখন তিনি মনে মনে ভাবিলেন, যুবকযুবতীদিগের যে ভালবাসা, তাহা অন্তরের নহে সে চক্ষের।

শেষে রোমিও বিবাহের কথা উত্থাপন করিয়া বলিলেন, আমাদিগের বিবাহ আপনার আলয়ে, আপনাদ্বারাই সম্পন্ন হইবে।

ফ্রায়ার লরেন্স একটু চিন্তা করিয়া শেষ বিবাহ দিতে স্বীকৃত হইলেন। কেবল যে, রোমিওর অনুরোধেই তিনি এই গোপনীয় বিবাহ দিতে স্বীকৃত হইলেন, তাহা নহে। ফ্রায়ার লরেন্স মণ্টেগ ও কপুলেট উভয় বংশের চির হিত-চিকীর্ষু। তিনি ভাবিলেন, উভয় দলপতির পুত্র কন্যায় বিবাহ হইলে, উভয় বংশের বিরাগ-বিবাদ অপনোদিত হইবে। তাই তিনি ইহাতে সম্মত হইলেন।

রোমিওর আনন্দ আর ধরে না। জুলিয়েট-প্রেরিত তদীয় ধাত্রীদ্বারা রোমিও সমস্ত কথা বলিয়া পাঠাইলেন এবং যথা সময়ে জুলিয়েট আসিয়া রোমিওর সহিত যথাবিহিত বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইলেন। বিবাহান্তে ফ্রায়ার লরেন্স এই বলিয়া বরকন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, ঈশ্বর-প্রসাদে তোমাদিগের এই বিবাহ উভয় বংশের সৌহার্দ্দ্য স্থাপিত হউক।

বর-কন্যা আর অধিকক্ষণ সেখানে থাকিতে পারেন না। রোমিওকে স্বীয় গৃহ সংলগ্ন সেই উদ্যানে রাত্রিকালে যাইবার সঙ্কেত করিয়া জুলিয়েট চলিয়া গেলেন।

রোমিও বিবাহান্তে কত সুখের ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে বাড়ী যাইতেছিলেন; কিন্তু বিধাতা বুঝি মানুষের কেবল সুখ ভালবাসেন না,—তাই রোমিও যেসকল সুখের ছবি মনোমধ্যে গঠন করিতে করিতে যাইতেছিলেন, বিধাতা তাহা ভাঙ্গিবার জন্য পথেই তাহার আয়োজন করিয়া বসিলেন।

রোমিও যাইতে যাইতে পথিমধ্যে দেখিতে পাইলেন,—বেন্‌ভোলিও ও মার্কুসিও নামক তাঁহার প্রাণাধিক বন্ধুদ্বয়ের সহিত কপুলেটদলপতির ভ্রাতষ্পুত্র টাইবল্ট ঝগড়া বাধাইয়া

দিয়াছেন। তাঁহাদিগের অসিযুদ্ধ প্রায় আরম্ভ হয়, এমন সময় রোমিও তথায় গিয়া উপনীত হইলেন। তখন টাইবল্ট তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া রোমিওর উপর অযথা গালি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কপুলট টাইবল্টের উপর মণ্টেগ রোমিওর কিন্তু আর তেমন ভাব নাই—কপুলেট নামে এখন তাঁহার হৃদয় উচ্ছ্বাসিত হয়,—তাঁহার জুলিয়েট যে কপুলেট আর টাইবল্ট যে তাঁহার প্রিয়তমা জুলিয়েটের পিতৃব্যপুত্র! রোমিও বলিলেন, টাইবল্ট আমার ইচ্ছা করে তোমার সহিত দেখা হইলে আমি আমাদিগের বংশগত বিবাদ ভুলিয়া বয়স্যোচিত ব্যবহার করি। তুমি কেন এরূপ করিতেছ?" রোমিওর এই সরল ও বিনয়-নম্রতা মাখান কথায় টাইবল্ট যেন একটু নম্র হইলেন।

মার্কুসিওর কিন্তু তাহা সহিল না কারণ তিনি সাধারণতঃ একটু অহঙ্কারী ছিলেন। তিনিতো আর জানিতেন না যে, রোমিও কিসের জন্য আজি কপুলেট টাইবল্টের বন্ধুত্ব-ভিখারী। তিনি ভাবিলেন, রোমিওর এই অস্বাভাবিক নম্রতা কাপুরুষতাভিন্ন আর কিছুই নহে। মার্কুসিও টাইবল্টের সহিত অসিযুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিলেন,—রোমিও ও বেন্‌ভোলিও শতসহস্র চেষ্টাতেও তাঁহাদিগকে নিবৃত্ত করিতে সক্ষম হইলেন না; কিন্তু মার্কুসিওকে অধিকক্ষণ যুদ্ধ করিতে হইল না শীঘ্রই টাইবল্টের প্রচণ্ড অস্ত্রাঘাতে তাঁহাকে ধরাশায়ী হইতে হইল।

মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়া বন্ধু রোমিওর মুখের দিকে কাতর নয়নে চাহিয়া, জড়িত কথায় মার্কুসিও বলিলেন, বন্ধু অন্ততঃ বন্ধুতার খাতিরে ইহার প্রতিশোধ লও।

রোমিও আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। বন্ধুশোক ও তদীয় শেষ প্রার্থনা তাঁহাকে উন্মত্ত করিয়া তুলিল। তিনি অসি-গ্রহণে টাইবল্টের সহিত যুদ্ধারম্ভ করিলেন এবং অচিরেই টাইবল্টের বক্ষস্থল দ্বিধা বিভক্ত করিয়া বন্ধুত্বের অনুরোধ রক্ষা করিলেন।

দিবা দ্বিপ্রহরের সময় রাজপথে এই হত্যাকাণ্ড ঘটাতে নগরমধ্যে ভারি একটা গোলযোগ বাধিয়া গেল। নগর শুদ্ধ লোক সেখানে উপস্থিত হইল। বৃদ্ধ মণ্টেগ ও কপুলেট সদলবলে এবং সস্ত্রীক তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই বিষম গোলযোগের কথা শুনিয়া কয়েক জন রাজপুরুষ-সমভিব্যহারে ভেরোনাধিপতিও তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। টাইবল্টকে হত্যা করিয়া রোমিও তৎক্ষণাৎ ফ্রায়ার লরেন্সের নিকট গমন করিলেন। তখন কেবল ঘটনা-স্থলে একমাত্র বেন্‌ভোলিও দণ্ডায়মান। রাজা আসিয়া বেন্‌ভোলিওর সাক্ষ্য গ্রহণে যতদূর বুঝিতে পারিলেন,—আর কাহারও অনুরোধ না রাখিয়া, কাহারও কথা না শুনিয়া ভেরোনা হইতে রোমিওর নির্ব্বাসন দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিয়া চলিয়া গেলেন।

৪

এই ঘটনার কিয়ৎক্ষণ পরেই জুলিয়েট তাঁহার ধাত্রীর নিকট শুনিতে পাইলেন, টাইবল্ট ও রোমিওতে রাজপথে অসিযুদ্ধ বাধিয়াছিল,—রোমিওর অস্ত্রাঘাতে টাইবল্ট ইহজীবনের মত অস্তমিত হইয়াছে। রাজা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া ভেরোনাহইতে রোমিওর নির্ব্বাসন দণ্ড আজ্ঞা করিয়াছেন।

জুলিয়েট এই সম্বাদ শ্রবণে প্রথমতঃ ভ্রাতৃশোকে অধীর হইয়া রোমিওকে "পয়োমুখ-বিষকুম্ভ" প্রভৃতি বাক্যে নিন্দা করিলেন; কিন্তু পরক্ষণেই আবার তাঁহার হৃদয়ে অন্যভাবের আবির্ভাব হইল,—প্রেমের নিকট ভ্রাতৃস্নেহ পরাভব মানিল। জুলিয়েট বলিলেন, উঃ! যখন অসিযুদ্ধ বাধিয়াছিল, তখন একজনের জীবনতো নিশ্চয়ই যাইবার কথা—যদি টাইবল্ট নিহত না হইয়া রোমিও হত হইতেন!—জুলিয়েটের দেহ কণ্টকিত হইয়া উঠিল।

জুলিয়েট ভাবিলেন, ধাত্রী যদি আমাকে সম্বাদ দিত যে, "তুমি টাইবল্টের সহিত পিতা কি মাতাকে হারাইয়াছ—তাহা হইলে, দিবারাত্র কাঁদিয়া নয়ন জলে সে শোক নির্ব্বাপিত করিতাম;

কিন্তু হায়! আমার রোমিও নির্ব্বাসিত! আমি তাঁহাকে না দেখিয়া কেমন করিয়া থাকিব। রোমিওকে না দেখিলে যে আর জুলিয়েটের প্রাণ একদণ্ড স্থির হইতে পারে না।" জুলিয়েটের বুকের মধ্যে যেন শত বৃশ্চিক দংশন করিতে লাগিল। তিনি তখনই নির্ব্বাসন দণ্ডাজ্ঞাগ্রস্ত রোমিও কোথায়, কি ভাবে কালাতিপাত করিতেছেন জানিবার জন্য ধাত্রীকে পাঠাইয়া দিলেন।

এদিকে রোমিও নির্ব্বাসন দণ্ডাজ্ঞা শ্রবণ করিয়া ফ্রায়ার লরেন্সের নিকট অনেক কাঁদিয়া কাটিয়া বলিলেন, "গুরুদেব, এখন কি করি। হায়, আমার অদৃষ্ট কি এমনই অপ্রসন্ন! আমি জুলিয়েট শূন্য কোন্ দেশে গিয়া অবস্থান করিব? যেখানে জুলিয়েট নাই, আমাকে সেখানে যাইতে না আজ্ঞা করিয়া কেন আমাকে একেবারে যমালয়ে যাইতে আজ্ঞা করিলেন না! হায়! এখন কি করিব।"

ফ্রায়ার লরেন্স তত্ত্ব-কথায় রোমিওর হৃদয় ভার অপনোদন করিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু রোমিও তাহাতে বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "ঠাকুর! রাখিয়া দিউন, আপনার তত্ত্ব-কথা। তত্ত্ব-কথায় কি করিতে পারে? রাজাজ্ঞা খণ্ডন করিতে পারে না? আমি যে দেশে যাইব, সে দেশে জুলিয়েট সৃজন করিতে পারে? আপনি যদি জুলিয়েটের মত প্রেমপূর্ণ নব পরিণীতা পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবার জন্য নির্ব্বাসন-দণ্ডের অধীন থাকিতেন, তবে আমার হৃদয়জ্বালা বুঝিতে পারিতেন।" যে সময়ে রোমিও এইরূপ দুঃখ-যন্ত্রণায় পড়িয়া আকুল হইতেছিলেন, সেই সময়ে জুলিয়েটের ধাত্রী আসিয়া উপস্থিত হইল।

ফ্রায়ার লরেন্স তখন রোমিওকে ডাকিয়া বলিলেন, "তুমি কিছুমাত্র দুঃখ করিও না। অদ্য রাত্রে তোমার প্রিয়তমা জুলিয়েটের নিকট বিদায় লইয়া, কল্য প্রত্যূষে মান্তুয়া নগরে গমন কর। তোমাদের দম্পতির মধ্যে যাহাতে চিঠি যাওয়া আসায় সুবিধা হয়, আমি তাহা করিয়া দিব। আর কৌশল করিয়া তোমাদিগের এই বিবাহ বার্ত্তা প্রকাশ পূর্ব্বক যত সত্বর পারি তোমাকে আনয়ন করতঃ উভয় বংশের সৌহার্দ্দতা সংস্থাপন করিয়া দিব।" তপস্বীর আশ্বাস বচনে রোমিও কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন। রোমিও জুলিয়েটের সহিত রাত্রে সাক্ষাৎ করিতে যাইবেন, এই সম্বাদ লইয়া ধাত্রী চলিয়া গেল। এদিকে রজনীও আসিয়া সমাগত হইলেন।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেলে, রোমিও কপুলেট-ভবনস্থ প্রাচীর উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক অন্তঃপুর সংলগ্ন উদ্যানে প্রবেশ করিলেন,—জুলিয়েটের গৃহে রোমিওর গোপনে গমন করিবার সুবিধার জন্য ধাত্রী পূর্ব্ব হইতেই রজ্জুময়ী অধিরোহণী আনিয়া রাখিয়াছিল,—রোমিও তদ্দ্বারা প্রিয়তমার গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন।

এই সম্মিলনের হর্ষে তাঁহারা ভূত ভবিষ্যৎ ভুলিয়া গেলেন। বর্ত্তমানের আনন্দ উচ্ছ্বাসে তাঁহারা স্ফীত—উচ্ছলিত; কিন্তু তাঁহাদিগের অদৃষ্টে সে আনন্দ উপভোগ অধিকক্ষণ ঘটিল না। তাঁহাদিগের উপর বাদ সাধিয়াই যামিনী যেন শীঘ্র প্রভাত হইলেন।

দিবাগমসূচক পক্ষিরব শুনিয়া রোমিও চমকিত হইলেন। আর কিরূপে সেখানে থাকেন? একদিকে কপুলেট, অন্যদিকে রাজদণ্ড। তাঁহার শরীর শিহরিয়া উঠিল। আর সেখানে বিলম্ব করিলে, মৃত্যুকে ডাকিয়া আনা হয়। কাতরকণ্ঠে প্রিয়তমা জুলিয়েটকে বলিলেন,—প্রাণাধিকে, আমাকে বিদায় দাও, ভোর হইয়াছে;—ঐ শুন চাতক ডাকিতেছে।

স্বামীকে আর রাখিলে, কি কাণ্ড ঘটিবে, তাহা তাঁহার মনে উদয় হইল। তিনি কণ্টকিত দেহে তখন স্বামীকে যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। রোমিও বিদায় লইবেন,—কি বলিয়া বিদায় লইতে হয়, সে ভাষা তিনি খুঁজিয়া পাইলেন না। রোমিওর দুই চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া উঠিল।

জুলিয়েট রোমিওর গলা জড়াইয়া ধরিয়া, চক্ষুজলে রোমিওর বক্ষঃস্থবসন ভিজাইয়া কাতর কণ্ঠে কহিলেন,—"নাথ, অভাগিনীর হৃদয় সর্ব্বস্ব! তবে কি এমনই করিয়াই যাইবে?"

রোমিও আর বিলম্ব করিতে পারিলেন না। সেই মধ্যাহ্নের পূর্ণ শতদলবিনিন্দিত বদনে পুনঃ পুন চুম্বন করিয়া রুমালে চক্ষুজল মুছিতে মুছিতে বিদায় হইলেন।

৫

পূর্ব্বদিবস বিবাহের পর এই সকল গোলযোগ বশতঃ জুলিয়েটের হৃদয় একেবারে অস্থির ও অধৈর্য্য হইয়া পড়িয়াছিল, তাই তিনি আর শয়ন গৃহের বাহির হয়েন নাই; কিন্তু তাঁহার মাতা তাঁহাকে না বাহির হইতে দেখিয়া একমাত্র টাইবল্টের মৃত্যু শোকই জুলিয়েটের অসুস্থতার কারণ ভাবিয়া, আজি প্রভাত হইবামাত্র কন্যাকে সান্ত্বনা করিতে শয়ন গৃহে আগমন করিলেন। আসিয়া তিনি যাহা দেখিলেন, তাহাতে বুঝিলেন, টাইবল্টের শোকে জুলিয়েটকে একেবারে আকুল করিয়াছে। তিনি দেখিলেন, শোকে জুলিয়েট সমস্ত রাত্রি নিদ্রা যায় নাই—সে পদ্ম-পলাশবৎ নয়নযুগল রক্তাভ ধারণ করিয়া কিঞ্চিৎ স্ফীত হইয়াছে। সে সর্ব্বদা হাস্যময়ী মুখকান্তি বিষণ্ণতায় সমাচ্ছন্ন—তাঁহার বেশ আলুথালু। চাহনি উদ্ভ্রান্ত। মাতা অত্যন্ত দুঃখিত হৃদয়ে বলিলেন, "বাছা, শোক পরিহার কর। রোমিও যেমন টাইবল্টের প্রাণ সংহার করিয়াছে, রাজাও তাহাকে যথোচিত শাস্তি প্রদান করিয়াছেন।"

জুলিয়েট—রোমিওগতপ্রাণা জুলিয়েট মাতার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "মা যদি জগদীশ্বর অবলা হৃদয়ের যন্ত্রণা অনুভব করেন, তবে নিশ্চয়ই তিনি ইহার জন্য উচিত শাস্তি প্রদান করিবেন।"

জুলিয়েটের মাতা এই স্বার্থক কথার প্রকৃত অর্থ বুঝিলেন না। তিনি বলিলেন, "জুলিয়েট, ঠিক বলিয়াছ। রাজার রাজ-ধর্ম্মোচিত কার্য্য হয় নাই। রোমিওর উচিত শাস্তি হয় নাই,—তাহার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা করাই ভাল ছিল।

জুলিয়েট। সে কথা আর বলিতে! রাজা রোমিওর নির্ব্বাসন দণ্ড হইতে কেন আমার প্রাণবধাজ্ঞা প্রদান করিলেন না? আর আমি যদি সেখানে উপস্থিত থাকিতাম, তবে দেখিতাম অবলার বাহুতে কত বল। যুগল বাহুদ্বারা রোমিওকে ধরিয়া রাখিতাম, কখনই অমন দণ্ডে দণ্ডিত হইতে দিতাম না।

মাতা। বাছা, তুমি আর সেজন্য শোক করিও না; তবে সে যেমন টাইবল্টকে হত্যা করিয়াছে, তেমনি তাহাকে হত্যা না করায় কপুলেট কুলে সকলেই দুঃখিত; কিন্তু যাবে কোথা—মান্তুয়ার ওদিকেতো নহে। আমি কৌশলে তাহার নিকট এমন বিষ পাঠাইব, যাহা সেবনে তাহার নিশ্চয় মৃত্যু।

জুলিয়েটের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। তখন সে বুদ্ধিমতী হৃদয়ভাব গোপন করিয়া বলিল,—"মা, আমার নিকট সত্য কর, যখন তুমি বিষ পাঠাইবে, আমাকে না দেখাইয়া পাঠাইবে না। আমি তাহাতে আরও কোন জিনিষ মিশ্রিত করিয়া দিব, যাহাতে ভ্রাতা টাইবল্টের মৃত আত্মার তৃপ্তি বিধান হইতে পারিবে—রোমিও এমন কষ্ট পাইয়া নিশ্চয় মরিবে।"

মাতা স্বীকৃত হইয়া বলিলেন, "তাহাই করিব। এখন তুমি শোক পরিহার কর। দেখ স্ত্রীলোকের স্বামীই সকল, আমি তোমার বিবাহ দিব। স্বামীসেবা করিয়া ভ্রাতৃশোক বিস্মৃত হইতে পারিবে।"

জুলিয়েটের চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হইল, আর নিবৃত্তি করিয়া রাখিতে পারিলেন না। তিনি রুমালে চক্ষুজল মুছিয়া বলিলেন, "মা, আমার আর একটি অনুরোধ রাখিতে হইবে; যতদিন রোমিওর নাম জগতে বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন তোমরা আমার বিবাহের উদ্যোগ করিবে না।"

"তাই হবে" তখন এই কথা বলিয়া মাতা চলিয়া গেলেন। বিষাদ-প্রতিমা জুলিয়েট করতলে কপোল বিন্যাস করিয়া রোমিওর মধুর মূর্ত্তি ধ্যান করিতে লাগিলেন।

৬

জুলিয়েটের অনুরোধ রক্ষিত হইল না। তাঁহার পিতা কাউণ্ট পারিসের সহিত তাঁহার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিলেন, বিবাহের দিন সমাগত। এখন উপায় কি? কেমন করিয়া জুলিয়েট সতীত্ব রক্ষা করিবে? সে কতপ্রকার আপত্তি উত্থাপিত করিয়া দেখিয়াছে—তাহার পিতা কাউণ্ট পারিসের মত ধনী, মানী, বিদ্বান ও সুরূপ পাত্র পরিত্যাগ করিতে স্বীকৃত হইলেন না। আগামী পরশ্ব বিবাহের দিন। জুলিয়েট নিরুপায়। হায়! সে এসময় কাহার শরণাগত হয়? কে তাহাকে সদুপায় বলিয়া দেয়? এ কথা কি কাহারও নিকট বলিবার উপায় আছে? এক ধাত্রী আর ফ্রায়ার লরেন্স ভিন্ন একথা কেহই জানে না,—কাহারও নিকট বলিবারও উপায় নাই।

জুলিয়েট ধাত্রীর নিকট পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিল; বলিল, "তুমিই আমার একমাত্র গতি, বলিয়া দাও—এ বিপদে আমি কি উপায় করি?"

ধাত্রী বলিল "তা বাছা, চির নির্ব্বাসিত রোমিও যে, আর কখনও ভেরোনায় ফিরিয়া আসিয়া তোমার উপর বিবাহ দাওয়া করিবেন, সে আশা করিও না। আর ফ্রায়ার লরেন্সও সে প্রকৃতির লোক নহেন যে, তোমাদিগের সেই গোপন বিবাহের কথা প্রকাশ করিয়া তোমাকে লোকসমাজে অপদস্থা করিবেন। পিতা যখন পীড়াপীড়ি করিতেছেন, তখন কাউণ্ট পারিসের মত পাত্রকে ফিরাইও না। উহার সহিত বিবাহ করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে ঘর সংসার কর।

জুলিয়েট। আমি যে, ঈশ্বর সাক্ষী করিয়া বিধিপূর্ব্বক মন্ত্রপাঠ করতঃ তাঁহাকে স্বামীত্বে বরণ করিয়াছি,—আমি যে তাঁহার হস্তে আমার জীবন যৌবন সকলি সমর্পণ করিয়াছি।

ধাত্রী। সংসারে থাকিতে হইলে অত ধর্ম্ম গণিয়া চলিলে কি আর চলে মা! লুকিয়ে লোকে কি না করে?

পুচ্ছ-বিমর্দ্দিতা ভুজঙ্গীর ন্যায় গর্জ্জন করিয়া, হাঁপাইতে হাঁপাইতে জুলিয়েট বলিল, "পোড়ার মুখী, মহাপাতকী,—তুই এখন আমার নিকট হতে দূর হ। আমি ধর্ম্মনষ্ট করিব? প্রাণাধিক রোমিওকে বিস্মৃত হইব? অন্য কোন উপায় না থাকুক—বাজারেতো বিষও বিক্রয় হয়।"

অতঃপর জুলিয়েট গোপনে ফ্রায়ার লরেন্সের নিকট গমন করিলেন, তাঁহার নিকট সমস্ত কথা বলিয়া এখন কি উপায় করিবেন, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন।

তপস্বী অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া শেষ বলিলেন; "জুলিয়েট আজিও তোমাদিগের বিবাহ-বার্ত্তা প্রকাশ করিবার সময় ও সুবিধা করিয়া উঠিতে পারি নাই। উপস্থিত বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার অন্য কোন সদুপায়ও দেখিতেছি না; তবে একমাত্র উপায় আছে, যদি তোমার সাহসে কুলায়।"

জুলিয়েট। সতীত্ব রক্ষার জন্য আমাকে জলন্ত আগুণে ঝাঁপ দিতে বলিলেও আমি প্রস্তুত আছি।

লরেন্স। ইহাও প্রায় সেইরূপ। আমি তোমাকে একরূপ ঔষধ দিব, তুমি পান করিলে ঠিক মৃতার ন্যায় হইয়া বিয়াল্লিশ ঘণ্টা অচেতন থাকিবে। তোমার মৃত্যু হইয়াছে, স্থির করিয়া তোমার আত্মীয় স্বজন তোমাকে প্রাথিত করিয়া রাখিবে, আমি এদিকে মান্তুয়া হইতে ঐ সময় মধ্যে রোমিওকে আনাইয়া তাঁহাদ্বারা তোমাকে তোলাইয়া তোমার চৈতন্যোৎপাদন হইলে, উভয়কে পুনরায় মান্তুয়ার প্রেরণ করিব।

কথাটা শুনিয়া প্রথমে জুলিয়েটের মনে ভয়ের সঞ্চার হইল। শেষে স্থির করিলেন, ইহা না হইলেও যখন মৃত্যু নিশ্চয়—তখন ইহাই করিব। জুলিয়েট ঔষধ লইয়া গৃহে গমন করিলেন, এবং নিশীথ সময়ে সে ঔষধ পান করিয়া শয্যায় অচেতন হইয়া পড়িলেন।

পরদিন বিবাহ। প্রত্যুষেই কাউণ্ট পারিস বর সজ্জায় সজ্জীভূত হইয়া আসিলেন; কিন্তু

হায়! তাঁহার আশালতা সমূলে নির্ম্মূল হইয়াছে। সকলে দেখিলেন,—জুলিয়েট আর ইহ জগতে নাই। বিবাহোৎসবের পরিবর্ত্তে শোকের উচ্ছ্বাস প্রবাহিত হইল। জুলিয়েটের জনক জননী একমাত্র কন্যার মৃত্যু জানিয়া আকুল হইলেন। শেষে সকলে কাঁদিতে কাঁদিতে চিরাগত নিয়মানুসারে কপুলেটদিগের সমাধিক্ষেত্রে জুলিয়েটের দেহের সমাহিত করিয়া আসিলেন।

৭

ফ্রায়ার লরেন্স জুলিয়েটের কল্পিত মৃত্যু সংবাদ লিখিয়া রোমিওর নিকট লোক প্রেরণ করিলেন। কিন্তু বিধাতা যাহা ঘটাইবেন, মানুষের সাধ্য কি যে, যত্ন ও চেষ্টা করিয়া তাহার অন্যথা করিতে পারে?

ফ্রায়ার লরেন্স যে উদ্দেশ্যে যাহা করিতে গেলেন তাহা সুসিদ্ধ হইল না। তাঁহার প্রেরিত লোক মান্তুয়া নগরে পৌঁছিবার পূর্ব্বে রোমিও ভেরোনা নগরহইতে সমাগত অন্য কোন লোকের মুখে জুলিয়েটের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করিয়া একেবারে উন্মত্তবৎ হইলেন।

বাজারহইতে উৎকট বিষ ক্রয় করিয়া লইয়া রাত্রিকালেই মান্তুয়া হইতে ভেরোনা নগরে গমন করিলেন। সেখানে যাইয়া কপুলেটদিগের চিরনির্দ্দিষ্ট সমাধিক্ষেত্রে উপনীত হইলেন। তাঁহার নিকট আলোক ও খনিত্র ছিল, তিনি তৎসাহায্যে জুলিয়েটের সমাধি খনন করিতে লাগিলেন। তিনি সমাধি খনন করিতেছেন, এমন সময় তথায় কাউণ্ট পারিস আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কাউণ্ট পারিস উৎকট অনুরাগ বশত জুলিয়েটের সমাধির উপর পুষ্প বরিষণ করিতে আসিয়াছিলেন।

রোমিওকে জুলিয়েটের সমাধি খনন করিতে দেখিয়া কাউণ্ট পারিস ভাবিলেন, এই নির্ব্বাসিত মণ্টেগ যুবার ইহাতে অবশ্যই কোন অসদভিপ্রায় আছে। তিনি রোমিওকে অযথা তিরস্কার করিতে লাগিলেন। রোমিও নিঃশব্দে থাকিতে পারিলেন না। উভয়ে ক্ষিয়ৎক্ষণ বাক্‌যুদ্ধ হইল—শেষ অসি যুদ্ধ বাধিল। উভয়েই কোষ হইতে অসি বাহির করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু প্রিয়শোকন্মত্ত রোমিওর নিকট পারিস পারিলেন না, অল্পক্ষণ মধ্যেই রোমিওর অসি তাঁহার বক্ষস্থ শোণিত পান করিল। কপুলেটদিগের সমাধি ক্ষেত্রে পারিস চিরজীবনের মত নিদ্রিত হইলেন। পারিসের সঙ্গে একজন ভৃত্য ছিল, সে এই কাণ্ড দেখিয়া ছুটিয়া নগর মধ্যে প্রবিষ্ট হইল।

রোমিও আবার সমাধিক্ষেত্র খনন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ খুঁড়িতেই শবাধারোপরি শায়িতা জুলিয়েটের দেহ বাহির হইল। রোমিও তাহা উপরে তুলিলেন, নির্নিমেষ নয়নে অনেকক্ষণ সে মূর্ত্তি দেখিলেন। তখনও সে দেহ অবিকৃত রহিয়াছে। আর সহ্য হইল না। রোমিও সর্ব্বসন্তাপহারী মৃত্যুর ক্রোড়ে আশ্রয় লইবার জন্য নিজ পকেটস্থ হলাহল বাহির করিয়া পান করিলেন। সে বিষ গলাধঃকরণ হইবামাত্র, তাঁহার প্রাণপাখী অসময়ে উড়িয়া গেল।

যে সময় রোমিওর প্রাণ বিয়োগ হইল, সেই সময়ে জুলিয়েটের শরীরে ধীরে ধীরে চৈতন্য আসিতেছিল। এদিকে ফ্রায়ার লরেন্স মান্তুয়া নগরে যে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন, সে তথায় গিয়া রোমিওর সাক্ষাৎ না পাইয়া লরেন্সকে সম্বাদ দিল। সন্ন্যাসী আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তখনই খনিত্র ও আলো লইয়া নিজেই সমাধিক্ষেত্রে গমন করিলেন। কেননা জুলিয়েটের মোহাপগমের আর অধিক সময় নাই। ফ্রায়ার লরেন্স সমাধিক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে বিস্ময়রসে উহাঁর শরীর শিহরিয়া উঠিল। জুলিয়েটও তখনি চক্ষুরুন্মীলন করিলেন। ক্রমে সকল কথা জুলিয়েটের স্মৃতিপথে উদিত হইল। তিনি চাহিয়া দেখিলেন, সম্মুখে ফ্রায়ার লরেন্স।

জুলিয়েট উঠিয়া দাঁড়াইয়া বিনয়নম্র বচনে বলিলেন "দেব! রোমিও—আমার প্রাণাধিক রোমিও কি আসিয়াছেন?"

এই সময় অদূরে মনুষ্য কোলাহল শুনিতে পাইয়া ব্যগ্রভাবে ফ্রায়ার লরেন্স বলিলেন "বৎসে! মানুষে ইচ্ছা ও যত্ন করিয়া কিছুই করিতে পারে না। অভিলষিত কর্ম্ম-সাধনে সহস্র যত্ন ও চেষ্টা করিলেও ভবিতব্য যাহা ঘটায়, তাহাই ঘটে। আমার পত্র না পাইতে পাইতে, অন্য কাহার নিকট তোমার মৃত্যুসংবাদ-শ্রবণে রোমিও এখানে আসিয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন। যাহা হউক এক্ষণে পলায়ন কর, ঐ মনুষ্যকোলাহল শব্দ ক্রমেই নিকট হইতেছে।" সন্ন্যাসী আর বিলম্ব করিতে পারিলেন না; জুলিয়েটকে অনুসরণ করিতে বলিয়া তিনি পলায়ন করিলেন।

জুলিয়েট কি শুনিল? সে আর কোথায় যাবে? কোথায় আর তাহার জুড়াইবার স্থান আছে? সে উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিতে, পার্শ্বেই প্রিয়তমের মৃতদেহ দেখিতে পাইল। আসল কথা বুঝিতে আর তাহার কিছুমাত্র বাকি থাকিল না। মৃত পতির গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাতর কণ্ঠে কাঁদিতে লাগিল—"নাথ! আমি মরিয়াছি বলিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছ। প্রাণাধিক, হতভাগিনী এখনও মরে নাই, একটু দাঁড়াও, সঙ্গিনীকে পরিত্যাগ ক'রে একা যেও না। এই আমিও আসিতেছি—।"

এই কথা বলিয়া জুলিয়েট রোমিওর পার্শ্বস্থিত ছুরিকা গ্রহণে নিজবক্ষে বিদ্ধ করিলেন। হায়! রোমিও জুলিয়েট, এ পৃথিবীতে আর নাই।

পারিসের ভৃত্য নগরমধ্যে গমন করিয়াছিল, তাহার চীৎকারে নগরের অধিকাংশ লোকই জাগিয়া পড়িল। শেষ ভৃত্যের নিকট ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করায়, সে কিছুই বলিতে পারে না, কেবল "পারিস, রোমিও—জুলিয়েট" অসম্বদ্ধভাবে এই কথাগুলি বলিতে লাগিল। সকলেই তাহাতে বুঝিয়া লইলেন, শ্মশানে একটা বিষম কাণ্ড ঘটিয়াছে। মণ্টেগ ও কপুলেটের দলবল সাজিল,—গোষ্ঠীপতিদ্বয়ও সেই সঙ্গে আসিলেন, সম্বাদ পাইয়া বিনিদ্র হইয়া রাজাও সেই সঙ্গে আসিয়া জুটিলেন। তাঁহাদেরই কোলাহল শ্রবণ করিয়া ফ্রায়ার লরেন্স পলায়ন করিতেছিলেন, কিন্তু পারিলেন না। তাঁহাকে পলায়নপর দেখিয়া প্রহরীগণ আটক করিয়া ফেলিল।

পরহিতব্রতে ব্রতী ফ্রায়ার লরেন্সকে সকলেই জানিতেন, কাজেই রাজা তাঁহাকে ভক্তিভরে ব্যাপার জিজ্ঞাসা করিলেন। লরেন্স কম্পিতকণ্ঠে আদ্যোপান্ত সমস্ত প্রকাশ করিয়া বলিলেন শুনিয়া সকলে ঘটনাস্থলে উপনীত হইলেন। সেখানে গিয়া দেখিলেন, মাধবীসহ সহকার ধরাতলশায়ী। রোমিওর বসনাগ্রে এক খণ্ড কাগজ বাঁধা ছিল, তাহা খুলিয়া লইয়া সকলে পাঠ করিয়া দেখিলেন, তাহাতে লরেন্সের কথার মিল হইল। রোমিও জুলিয়েটের গুপ্ত প্রণয়ের কথা তাহাতে স্পষ্ট ভাবে লেখা ছিল।

বৃদ্ধ মণ্টেগ ও কপুলেট অপত্যশোকে কাঁদিয়া ব্যাকুল হইলেন। রাজা তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আজি তোমাদের চিরবৈরিতার ফল ফলিয়াছে। বোধ হয়, তোমাদিগের চৈতন্যোৎপাদন করিবার জন্যই বিধাতা এই প্রেমের সঞ্চার করিয়া দিয়া অকালে তোমাদিগের হৃদয়রত্ন কাড়িয়া লইলেন।"

বৃদ্ধদ্বয় প্রতিজ্ঞা করিলেন, আর তাঁহারা এ বিবাদ রাখিবেন না; আরও কপুলেটপতি রোমিওর হিরণ্ময় মূর্ত্তি স্থাপন এবং মণ্টেগপতি জুলিয়েটের পূর্ণপ্রেমের জ্বলন্ত মূর্ত্তি কাঞ্চনে নির্ম্মাণ করিয়া একত্রে স্থাপন করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

বহুদিনের বিবাদ আজি দুইটি পবিত্র-প্রাণ যুবক যুবতীর হৃদয়-বলিদান লইয়া শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিল।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য

বাঙ্গালা বর্ণমালা ও বানান-সংস্কার *

বাঙ্গালা ভাষা এখন যে প্রকার কার্য্যকারিণী হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে বর্ত্তমান সময়ে এই ভাষায় ফনোগ্রাফী বা রেখা-শব্দাভিজ্ঞান বিদ্যার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। গত বর্ষের সাহিত্য-কল্পদ্রুমে সে সম্বন্ধে কয়েকটি যুক্তি দেখান হইয়াছিল। বলিতে পারি না, সাধারণে সে সম্বন্ধে কিরূপ ধারণা করিয়াছেন; কারণ, সাহিত্য-কল্পদ্রুমের সেই প্রবন্ধ দেখিয়া, কোন সমালোচকও এ পর্য্যন্ত কোন কথা বলিলেন না। † যাহাহউক, আমাদিগের মনে যখন ঐ বিদ্যাটির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে একান্ত আবশ্যকতা বোধ হইয়াছে, তখন আমরা উহার প্রবর্ত্তনের জন্য, যাহা কিছু কর্ত্তব্য, তাহার প্রস্তাব করিয়া চাই; সময় হয়, বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিগণ এবং সমালোচকগণ সে সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন।

বাঙ্গালায় ফনোগ্রাফী বা রেখা-শব্দাভিজ্ঞান বিদ্যা প্রবর্ত্তিত করিতে হইলে, বাঙ্গালা ভাষার বর্ণমালা ও বানান-প্রণালীর কতকটা সংস্কার আবশ্যক; কিন্তু এক রেখা-শব্দাভিজ্ঞান বিদ্যার জন্য সে সংস্কার বৈয়াকরণিক ও সাহিত্যসেবীরা অনুমোদন করিবেন কি না, জানি না। আমাদের বিশ্বাস যে, যদি বাঙ্গালা বর্ণমালা ও বানান-প্রণালী যুক্তিগত উপায়ে সংস্কৃত হয়, আর সেই নবসংস্কৃত বর্ণমালা ও বানান প্রণালীর সাহায্যে বাঙ্গালায় পুস্তকাদি লিখিত হয়; তাহা হইলে, রেখা-শব্দাভিজ্ঞান বিদ্যা-প্রচারের সুবিধা তো হইবেই, তৎ সঙ্গে সঙ্গে নিম্নলিখিত কয়েকটি উপকারও হইবে;—

১। বহু বিষয়ের পুস্তক প্রচারই জ্ঞানোন্নতির মূল। যে ভাষায় যত অধিক পুস্তক প্রণীত হইবে, সে ভাষারও তত শ্রীবৃদ্ধি হইবে ও সেই ভাষা যাহাদের মাতৃভাষা, তাহাদের তত জ্ঞানোন্নতি হইবে। ভাষায় বহু পুস্তক রচিত হইলেই যে, সকলে সেই মূল পুস্তক দেখিয়া, প্রতিলিপি করিয়া লইয়া, পাঠ করিবে বা সমস্ত পুস্তকেরই প্রতিলিপি লওয়া সহজ হইবে, তাহা নহে। পুস্তকের বহু প্রচারের জন্য মুদ্রাঙ্কন একান্ত আবশ্যক। আমরা দেখিতে পাই যে, ইংরাজী ভাষা অক্ষর সংখ্যায় অল্প ও যুক্তাক্ষর শূন্য বলিয়া ‡ ইংরাজী ভাষায় পুস্তকাদি ছাপাইতে অল্প ব্যয়, অল্প সময় ও অল্প পরিশ্রম লাগে; আর অল্পাক্ষর বলিয়া উক্ত ভাষার পুস্তকাদি মুদ্রাঙ্কনে ভুলও হয় না বলিলেই চলে; কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় অক্ষর সংখ্যাও বেশী, যুক্তাক্ষরও যথেষ্ট, সুতরাং এ ভাষায় পুস্তকাদি ছাপিতে যেমন বেশী ব্যয়, বেশী সময়, বেশী পরিশ্রম লাগে, তেমনই মুদ্রিত পুস্তকে ভুলও যথেষ্ট থাকে। § যদি যুক্তিযুক্ত উপায় অবলম্বনে এই ভাষার

* এই প্রবন্ধটি গত চৈত্রমাসে (১২৯৮) আমাদের হস্তগত হইয়াছে, কিন্তু সাহিত্য-কল্পদ্রুমের মুমূর্ষু অবস্থা ঘটিয়াছিল বলিয়া, ইহা এত দিন প্রকাশিত হয় নাই। সাঃ কঃ সং।

† লেখকের ইহা উদ্দেশ্য নহে যে, সমালোচকগণ তাঁহার প্রবন্ধদ্বয়ের সুখ্যাতি করেন। তাঁহার উদ্দেশ্য যে, তাঁহার প্রস্তাবটি এখন কার্য্যে পরিণত হইবার উপযুক্ত কিনা, তাহাই বিবেচনা করা সমালোচকগণের একটা কর্ত্তব্য নয় কি?

‡ ইংরাজি বর্ণমালাও যে একবারে যুক্তাক্ষর শূন্য তাহা নহে;—fi, fl, æ, œ, lb, &c.

§ ব্যাকরণবিৎ ও বাঙ্গালা ভাষার জন্মদাতা বিদ্যাসাগর মহাশয়ও আক্ষেপ করিয়া বলিতেন, যে, "একটা ফর্ম্মার প্রুফ ৫।৭ বার দেখিয়া দিয়াও ছাপিবার পর দেখিয়াছি যে, তাহাতে "ব" স্থানে "র" "র স্থানে ব" হইয়া আছে।"

বর্ণমালা ও বানান-প্রণালীর সংস্কার করা যায় ; তাহা হইলে, বাঙ্গালা ভাষার পুস্তক ছাপাইবার কত সুবিধা হয় ও ভুলের জন্য "ছাপখানার ভূতের।" চিরানন্দার হাত এড়াইতে পারে।

২। আদালত সমূহে যে সকল সিকস্তা বা পাকা লেখা চলিত আছে, তাহা এত কদর্য্য যে, তাহা হইতে অর্থগ্রহ হওয়া দুরূহ। প্রথমতঃ সিকস্তা লেখায় বর্ণশুদ্ধি বানানশুদ্ধি, এসকল কিছুই দেখে না, তাহার উপর অক্ষর এত ভাঙ্গিয়া বিকৃত করিয়া লেখা হয় যে, অনেক মুহুরীকেও পাড়বার সময় "কোন শালা লিখা হায় রে" বলিয়া ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিতে হয়। বিদেশীয় হাকিমেরা (যাঁহারা ছাপার বর্ণমালা পাঠ করিতে পারেন, তাঁহারতো কোন) জন্মেই সিকস্তা লেখায় দন্তস্ফুট করিতে পারেন না, কাজেই বিচারকালে আরজী ও দলিলাদি পড়িবার আবশ্যক হইলে, সেরেস্তাদার বা পেস্কারের উপর নির্ভর করেন। ইহাতেই অনেক মোকদ্দমায় তদ্বিরের গুণে রামের বিষয়ে শ্যামের অধিকার জন্মে। যদি যুক্তিযুক্ত উপায় অবলম্বনে এই সিকস্তা লেখকদিগকে বর্ণ-বিভ্রাট ও বানান-বিভ্রাটের হাত হইতে উদ্ধার করা যায় এবং ছাপাতেও যে বানান, সিকস্তাতেও সেই বানান চলিত হয় ; তাহা হইলে বিদেশী হাকিমেরা ও সিকস্তা লেখকেরা কার্য্য করিতে সুবিধা পান।

৩। আজকাল যাঁহারা বাঙ্গালা-সাহিত্যের পরিচালক, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে লিখিবার সময় বর্ণ-বিভ্রাট ও বানান-বিভ্রাটে পড়িয়া লিখিবার সময় এত কদর্য্য বানান লিখেন যে, দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। যদিও ছাপিবার সময় তাঁহারা সাবধান হইয়া সেগুলি সংশোধন করিয়া দেন, তবুও, কতকগুলি মারাত্মক ভুল চক্ষু এড়াইয়া যায়। ছাপার পর দেখা গিয়াছে, কোন একটি শব্দের বানান একস্থানে এক প্রকার লিখিয়াছেন, আবার ঠিক তাহার চারি পংক্তি নিম্নে আর এক প্রকার লিখিয়াছেন! যুক্তিযুক্ত উপায়ে বর্ণমালা ও বানান-প্রণালীর সংস্কার হইলে এ আপদ্ হইতে অনেকেই উদ্ধার পাইবেন।

৪। বাঙ্গালা ভাষায় একবিধ উচ্চারণের দুইটি তিনটি করিয়া বর্ণ আছে। বুদ্ধিমান বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের কথা ধরি না ; সুকুমারমতি বালকেরা ঐ গোলযোগের মধ্যে পড়িয়া অতি পরিচিত কথাও সহস্রবার অভ্যাসের পর, লিখিবার সময়ে বানানে ভুল করে। যুক্তিযুক্ত উপায়ে ঐ সকল বিষয়ের সংস্কার করিতে পারিলে সহজে বানান শিক্ষা দেওয়া ও শিক্ষা করা যাইতে পারিবে।

৫। বিদ্যাসাগর ও অক্ষয় কুমার দত্ত মহাশয় বাঙ্গালা ভাষার যেরূপ আকার গঠন করিয়া গিয়াছিলেন, বাঙ্গালায় এখন আর সে ভাষার প্রচার নাই। এক্ষণে বঙ্কিম বাবু, অক্ষয় বাবু ও চন্দ্রনাথ বাবু প্রভৃতির স্থিরীকৃত আকারই অনেকে ব্যবহার করেন। এই আকারের বাঙ্গালা লিখিতে গেলে, অনেক সময়ে অনেক শব্দ লেখা দুরূহ হয় ; কাজেই যুক্তিযুক্ত উপায়ে বানান-সংস্কার হওয়া আবশ্যক।

৬। বাঙ্গালায় এক্ষণে যেরূপ বানান-প্রণালী চলিত আছে ; তাহা ব্যাকরণানুমোদিত। যদি ব্যাকরণ রাখিতে হয় ; তবে বানান বা বর্ণমালা-সংস্কার করা চলে না ; কিন্তু, যাঁহারা এই মতটি ধরিয়া বানান বা বর্ণমালা-সংস্কারে অস্বীকৃত হইবেন, তাঁহাদিগকে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, আজকাল, যে ব্যাকরণ নামে প্রচলিত আছে, তাহা বাস্তবিক বাঙ্গালা-ব্যাকরণ নহে, সংস্কৃত ব্যাকরণের রূপান্তরমাত্র। বর্ত্তমান সময়ের ভাষানুসারে একখানি প্রকৃত বাঙ্গালা ব্যাকরণও রচিত হওয়া আবশ্যক। যুক্তিযুক্ত উপায়ে বর্ণমালা ও বানান-প্রণালী সংশোধিত হইলে ব্যাকরণ-রচনাও সহজ হইবে।

এইতো গেল উপকারের কথা। তৎপরে সংস্কার-সম্বন্ধে আমরাই যে প্রথম প্রস্তাব করিতেছি, তাহা নহে। সর্ব্বপ্রথমে ১২৮৫ সালে বঙ্গদর্শনে এ বিষয়ের প্রথম প্রস্তাব হয়। সেই প্রস্তাবের নাম "বাঙ্গালা বর্ণমালা-সংস্কার"। উক্ত প্রবন্ধ-লেখক বলেন, "আমাদের

বর্ণমালা-সংস্কারের প্রধান উদ্দেশ্য মুদ্রাঙ্কনের সৌলভ্য-সাধন ; অর্থাৎ ভাষার উচ্চারণের কোন হানি না হয় অথচ মুদ্রাঙ্কনের সৌলভ্য হয় ; ইহাই আমাদের অভিপ্রেত।" তৎপরে তিনি যে সকল স্থলে সংস্কারের প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহার মুখবন্ধে বলিয়াছেন, "আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি প্রার্থনা করি, কিন্তু বাঙ্গালা বর্ণমালার বিস্তার আমাদের অল্পমাত্রও অভীপ্সিত নয় ; কারণ, বর্ণমালার বিস্তারের সহিত মুদ্রণবিষয়ে প্রয়াস এবং ব্যয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, মুদ্রণ-ব্যয় অনুসারে পুস্তকের মূল্য বর্দ্ধিত হয়। পুস্তকের মূল্যাধিক্যই সাধারণের জ্ঞানলাভের প্রতি একটি মহৎ অন্তরায়। এই নিমিত্ত আমরা বাঙ্গালা বর্ণমালার সেইরূপ সংস্কারে প্রবৃত্ত হইলাম, যাহাতে পুস্তক মুদ্রণ-সম্বন্ধে ব্যয় এবং আয়াসের লাঘব হয়, অথচ ভাষার উচ্চারণাদিসম্বন্ধে কোন ক্ষতি না হয় এবং বিদেশীয় ও অস্মদ্দেশীয় প্রথম-শিক্ষার্থীরা সহজে বর্ণ-পরিচয় করিতে পারেন। * * * এস্থলে ইহাও বলা যাইতেছে, আমরা যে সকল সংস্কার করিব, তাহা কেবল বাঙ্গালা ভাষার নিমিত্ত। যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিবেন, তাঁহাদিগের সংস্কৃত অক্ষর লিখিতে ও পড়িতে শিক্ষা করা উচিত ; কারণ, তাঁহাদের সংখ্যা অতি অল্প, সুতরাং তাঁহাদের জন্য অধিক লোকের ক্ষতি সহ্য করা উচিত হয় না।" তৎপরে উক্ত প্রবন্ধলেখক যে সকল যুক্তি দেখাইয়া যে সকল স্থলে যেরূপ সংস্কার করিয়াছেন, তাহা নিম্নে সংক্ষেপে† প্রকটিত হইল ;—

১। বাঙ্গালায় (তন্ত্রমতে) অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, ৠ, ঌ, ৡ এ, ঐ, ও, ঔ, এই চতুর্দ্দশ স্বরের ব্যবহার হয়। সংস্কৃত ব্যাকরণের মাহেশ্বর সূত্রানুসারে অ, ই, উ, ঋ, ঌ, এ, ও, ঐ, ঔ এই নয়টি স্বরের হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত এই তিন প্রকার ভেদ আছে। তাহার পর প্রত্যেকটি আবার উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত এই তিন প্রকারে বিভক্ত হওয়ায়, এক একটি স্বরের ভেদ হইয়াছে। অনন্তর সানুনাসিক এবং নিরনুনাসিক ভেদে প্রত্যেক স্বর অষ্টাদশবিধরূপ ধারণ করিয়াছে। পরন্তু ঌ কারের দীর্ঘ নাই এবং এ, ঐ, ও ঔ, ইহাদের হ্রস্ব না থাকায়, ইহারা প্রত্যেকে দ্বাদশবিধমাত্র। অবশিষ্ট অ, ই, উ, ঋ ইহারা প্রত্যেকে অষ্টাদশবিধ। সকল মিলিত হইয়া স্বরের ভেদ এক শত বত্রিশ। ক্রমশঃ কালবশে এই উচ্চারণ ভেদে ১৩২ রকম স্বরবর্ণের মধ্যে বাঙ্গালা বর্ণমালায় কেবল হ্রস্ব ও দীর্ঘ এই দুইটি ভেদমাত্র ব্যবহৃত হয়। সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণে নাগোজী ভট্টের মতে * যখন ঌ ব্যবহার নাই বলিয়া ৡ কারকে পরিত্যাগ করা হইয়াছে, তখন বাঙ্গালায় ব্যবহার নাই বলিয়া ৠ, ঌ, ৡ এই তিনটিকে ত্যাগ করিতে পারি। বাকি রহিল, অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, ৠ, এ, ঐ, ও, ঔ—১১টি। ইহাদের মধ্যে 'অ' ব্যঞ্জনবর্ণে যুক্ত হইলে, ইহার কোন চিহ্ন থাকে না বা এতৎ সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণটীরও আকারের পরিবর্ত্তন হয় না ; অপর কতকগুলি ব্যঞ্জনের সহিত যোগ হইলে নিম্নলিখিত আকার ধারণ করে ;—া, ি, ী, ু, ূ, ৃ, ে, ৈ, ো, ৌ—১০টি। এক্ষণে এই মোট ২১টি স্বরচিহ্নের মধ্যে কিছু বাদ দেওয়া যায় কিনা? 'অ'এর সহিত 'া' যোগ করিলেই 'আ' হয়, তখন 'আ'কে তুলিয়া দিতে পারা যায়। এই রূপে এক 'অ'এর সাহায্যে অন্য স্বরগুলিও চিহ্নযোগে প্রকাশিত হইতে পারে ;—অা, অি, অী, অু, অূ, অৃ, অে, অৈ, অো, অৌ ;—এরূপ আকৃতি

* "ঋদিত্বং অইউঋ এষাং বর্ণানং প্রত্যেকমষ্টাদশভেদাঃ। ঌ বর্ণস্য দ্বাদশ, তস্য দীর্ঘাভাবাৎ, এতামপি দ্বাদশ, তেষাং হ্রস্বাভাবাৎ।"—নাগোজীভট্টঃ।

† পাঠকের মনে রাখা উচিত যে, বঙ্গদর্শনের লেখকের মূল উদ্দেশ্য,—ছাপার সীসাক্ষর (টাইপ) সংখ্যা হ্রাস করিয়া ভাষার উচ্চারণ বজায় রাখিয়া, ছাপার সুলভতা সম্পাদন করা।

আপাততঃ দেখিতে কিছু বিকৃত বটে, কিন্তু উচ্চারণে বা আসলে কোন হানি হয় না। হিন্দীপ্রভৃতি ভাষায় 'ঔর' কথাটি প্রায়ই 'অৌর' এইরূপে লিখিতে হয় এবং অদ্যাপি নাগরাক্ষরে হস্ত-লিখিত অনেকানেক পুথিতে 'ও' স্থলে 'অো', ঋ স্থানে 'অৃ' লিখিতে দেখি। * যাহা হউক, প্রস্তাবিত পদ্ধতি অবলম্বনে আমরা দেখিতেছি পূর্ব্বোক্ত তন্ত্রলিখিত ১৪টী স্বর ও চিহ্ন দশটীর মধ্যে অ, া, ি, ী, ু, ূ, ৃ, ে, ৈ, ী,—মোট এই দশটি রাখিলেই সকল কার্য্য চলিতে পারে। † আরও একটি কথা এই যে, 'ই' ঈ' প্রভৃতি বর্ণগুলি এক সময়ে 'অি' 'অী' ছিল, কালে আকার বদলাইয়াছে, মনোযোগপূর্ব্বক উহাদের গঠন-ভঙ্গী দেখিলেই, তাহা বুঝা যায়।

২। বাঙ্গালায় (তন্ত্রমতে) ক, খ, গ, ঘ, ঙ। চ, ছ, জ, ঝ, ঞ। ট, ঠ, ড, ঢ, ণ। ত, থ, দ, ধ, ন। প, ফ, ব, ভ, ম। য, র, ল, ব, শ, ষ, স, হ।—(৩৩)এই তেত্রিশটি ব্যঞ্জন বর্ণের ব্যবহার আছে; কিন্তু দেখা যায় ব্যবহারে ৎ, ড়, ঢ়, য়, ং, ঃ, ঁ এই কয়েকটিও ব্যঞ্জনের মধ্যে ব্যবহৃত হয়। পূর্ব্বে "ক্ষ"টিও হইত; কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দ্বিতীয় ভাগের কৃপায় উহা এখন যুক্তবর্ণ বলিয়া স্বীকৃত হয়। এই কয়টি ব্যঞ্জনের মধ্যে "ঙ" ও "ঞ"কে বাদ দেওয়া যাইতে পারে; কারণ, বাঙ্গালা ভাষায় ইহাদের স্বতন্ত্র ব্যবহার দেখা যায় না। ‡ ঙ্ক, ঙ্গ ও ঞ্চ, ঞ্জ প্রভৃতি সংযুক্ত বর্ণ স্থলেও স্বতন্ত্র উপায় অবলম্বনে "ঙ" ও "ঞ"কে পরিত্যাগ করা যাইতে পারে § ড়, ঢ়, য়, ৎ এই চারিটি "ড" "ঢ" "য" ও "ত"এর উচ্চারণভেদমাত্র; সুতরাং এগুলিকে অনায়াসেই বাদ দেওয়া যায়, আর সংস্কৃতে এরূপ বিন্দুযুক্ত স্বতন্ত্র বর্ণ নাই, ব্যাকরণের সূত্রানুসারে স্থানভেদে ড, ঢ,

---

* আমরা কিন্তু দেখি নাই। সা-ক সং।

† বঙ্গদর্শনের লেখক এই স্থলে প্রস্তাব করিয়াছেন যে, মুদ্রাকারেরা া, া, ে, ে, ৈ, ৈ, ী, ী, এইরূপ সমাত্রিক ও নিম্মাত্রিক আকারের বর্ণ রাখিয়া থাকেন, তাহার আবশ্যকতা নাই; কারণ 'দেখ' ও 'দেখ' এরূপ লেখায় আসল কথার কোন হ্রাস বৃদ্ধি নাই, কেবল দুইটি "ে"কারের আকার-ভিন্নতা-হেতুক ঈষৎ শোভার হ্রাস বৃদ্ধির খাতিরে বৃথা এতগুলি অক্ষর সংখ্যা বাড়াইয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় ও অক্ষর সাজাইবার সময়ে বৃথা সময় ব্যয় হয়;—একথা আমরাও স্বীকার করি।

‡ যখন বঙ্গদর্শনে এই প্রবন্ধটি লিখিত হয়, তখন "ঙ" ও "ঞ" বর্ণের স্বতন্ত্র ব্যবহার বাঙ্গালায় বিশেষ চলিত হয় নাই; কিন্তু এখন বড় অভাব নাই;—"রাঙা" "ভাঙা" "কাঙাল" এবং "মিঞা" "গোসাঞি" ইত্যাদি। "গোসাঞি" শব্দ চৈতন্যচরিতামৃতে ও অন্যান্য প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্যে যথেষ্ট ব্যবহৃত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে ঐ শব্দটি "গোঁসাই"রূপে বানান করা ও লেখা হইয়া থাকে; কিন্তু মূল শব্দ "গোস্বামী" ধরিয়া বিবেচনা করিলে, "গোঁসাই" অপেক্ষা "গোসাঞি" লেখা যুক্তিযুক্ত বলিয়া প্রতীত হইবে।

§ বঙ্গদর্শনের প্রবন্ধ-লেখক "ঙ"কে বাদ দিয়াছেন; কিন্তু "ঞ"কে বাদ দেন নাই; কারণ,—"যাচ্ঞা" শব্দ। লেখক এই যাচ্ঞা শব্দ লইয়া একটু রহস্য করিয়া বলিয়াছেন যে, যাচ্ঞা শব্দে "ঞ" "চ"এর পর (নীচে) সংযুক্ত আর এ শব্দটি বাঙ্গালীর ভরসাস্থল। "ঞ" উঠাইবার জন্য যদি এই প্রধান ভরসার কথা 'যাচ্ঞা' শব্দটি উঠাইতে হয়, তাহা হইলে বঙ্গভাষার লোপ হওয়া ভাল; অর্থাৎ লেখকের উদ্দেশ্য এই যে, এমন বর্ণ পরিত্যাগ করা যাইতে পারে, যাহা গেলে ভাষার সামান্য শব্দটিও লিখিতে অভাবে পড়িতে না হয় কিন্তু তিনি যুক্তাক্ষর যেরূপে ভাঙ্গিয়া লিখিবার প্রস্তাব করিয়াছেন, তদনুসারে "যাচ্ঞা" শব্দটি "যাচংঞা"এইরূপে লেখা যাইতে পারে। "জ"এর নীচে "ঞ" যোগ করিলে "জ্ঞ" এইরূপ আকার হয়, এটিকে তিনি রাখিয়াছেন।

ত, ষ, যথাক্রমে ড় ঢ়, ৎ, য়, হইয়া থাকে ও তদনুরূপ উচ্চারিত হয়। বাঙ্গালাতেও সংস্কৃতের এই বিধিটুকু লইলেই চলিতে পারে।

৩। দুইটি 'ব' এর প্রয়োজন নাই। সংস্কৃতে দুইটি "ব" এর উচ্চারণ ভিন্ন, ব্যবহার ভিন্ন, আকার ভিন্ন; কিন্তু বাঙ্গালায় ব্যাকরণানুসারে ব্যবহার ভিন্নতা স্বীকার করা ভিন্ন আর কোন ভিন্নতা নাই, সুতরাং একটা 'ব' রাখিলেই চলিবে।

এইরূপে বঙ্গদর্শনের লেখক বর্ণমালার সংস্কার করিয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় ইনি দুইটা জ (জ ও য), দুইটা ন (ণ ও ন) বা তিনটা শ (শ, ষ, ও স) সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নাই। তাঁহার মতে বাঙ্গালা বর্ণমালা সংশোধিত হইয়া এইরূপ হইয়াছে;—

স্বরবর্ণ—অ, া, ি, ী, ু, ূ, ৃ, ে, ৈ, ী = ১০

ব্যঞ্জন বর্ণ—ক, খ, গ, ঘ চ, ছ, জ, ঝ, ঞ। ট, ঠ, ড, ঢ, ণ। ত, থ, দ, ধ, ন। প, ফ, ব, ভ, ম। য, র, ল, ব, শ, ষ, স, হ। = ৩১

তৎপরে বঙ্গদর্শনের লেখক স্বতন্ত্ররূপে বানান সংস্কার-বিষয়ে কোথাও কিছু বলেন নাই, কেবল যুক্তাক্ষরগুলিসম্বন্ধে নিম্নলিখিত সংস্কার করিয়াছেন,—

১। ব্যাকরণে সূত্র আছে "অজ্ঝলীনং পরেণ" অর্থাৎ অচ্ (স্বর) রহিত ব্যঞ্জনবর্ণ অচ্‌যুক্ত (স্বরযুক্ত) পরবর্ত্তী ব্যঞ্জনের সহিত যুক্ত হইবে, পূর্ব্বের সহিত নহে। এই সূত্রানুসারে সংযুক্ত অক্ষর অসংখ্য হইতে পারে; কিন্তু ল্ক, ল্প, ল্ল=৩টি 'ল' যুক্ত বর্ণ, ঙ্ক, ঙ্খ, ঙ্গ, ঙ্ঘ, ঙ্ক্ষ=৫টি 'ঙ' যুক্ত বর্ণ; ঞ্চ, ঞ্ছ, ঞ্জ, ঞ্ঝ, জ্ঞ, ঞ্জ=৬টি 'ঞ' যুক্ত বর্ণ; ণ্ট, ণ্ঠ, ণ্ড, ণ্ঢ=৪টী 'ণ' যুক্ত বর্ণ, ন্ত, ন্থ, ন্দ, ন্ধ,=৪টি 'ন' যুক্ত বর্ণ; ম্প, ম্ফ, ম্ভ=৩টি 'ম' যুক্ত বর্ণ; স্ক, স্খ, স্ত, স্থ, স্প, স্ফ=৬টি 'স' সংযুক্ত বর্ণ; ষ্ক, ষ্ট, ষ্ঠ, ষ্প, ষ্ফ=৫টি 'ষ' সংযুক্ত বর্ণ; শ্চ, শ্ছ=২টি 'শ' যুক্ত বর্ণ; দ্গ, দ্ঘ, দ্দ, দ্ধ, দ্ভ—৫টি 'দ' যুক্ত বর্ণ; গ্ধ=১টি 'গ' যুক্ত বর্ণ; ক্ষ, ক্ত, ক্ট=৩টি 'ক' যুক্ত বর্ণ; জ্জ=১টি 'জ' যুক্ত বর্ণ; চ্চ, চ্ছ=২টি 'চ' যুক্ত বর্ণ; ট্ট=১টী 'ট' যুক্ত বর্ণ; ত্ত=১টি 'ত' যুক্ত বর্ণ; ত্থ=১টি 'থ' যুক্ত বর্ণ; ড়্গ=১টি 'ড়' যুক্ত বর্ণ; প্ট, প্ত, প্স=৩টি 'প' যুক্ত বর্ণ; ব্জ, ব্দ, ব্ধ=৩টি 'ব' যুক্ত বর্ণ; প্রভৃতি সংযুক্ত বর্ণ বাঙ্গালায় স্বতন্ত্র আকারে প্রচলিত আছে।

২। যে সকল বর্ণ স্বাভাবিক আকার পরিত্যাগ করিয়া বিশেষ আকার ও উচ্চারণের সহিত অপর বর্ণের নীচে যুক্ত হয়, সেই সকল বর্ণের পরিবর্ত্তিত আকারগুলিকে ফলা বলা যায়। প্রাচীনকাল হইতে বাঙ্গালা ভাষায় এই কয়টি ফলা আছে;—্য, ্র, ্ল, ্ব, ্ন, ্ম, ৃ, ৯ ৄ এই এই নয়টি। 'য' হইতে ্য, 'র' হইতে ্র ও র্, 'ল' হইতে ্ল, 'ব' হইতে ্ব, 'ন' হইতে ্ন, 'ম' হইতে ্ম, 'ঋ' হইতে ৃ '৯ হইতে ৯ ফলার উৎপত্তি হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৃ ও ৯ স্বরবর্ণের স্থলে লিখিত হইয়াছে এবং বাঙ্গালায় ৯ নাই বলিয়া ৯ ফলাও নাই। ্য, ্ন, ্ব, ্র প্রভৃতি যোগ হইলে কতকগুলি বর্ণের আকৃতির পরিবর্ত্তন হয়;—শ্ব, স্ত, স্ন, হ্ন, ষ্ণ, ন্ধ, ক্ব, ধ্ব, ব্ব, স্ব, ক্র, ত্র, ন্ত্র, স্ত্র, ম্র ইত্যাদি। * ইহাদের সহিত ভিন্ন ভিন্ন স্বর-চিহ্ন ও ফলাযুক্ত হইলে আরও নানারূপ ভিন্নাকার হয়; যথা,—ষ্ণু, ক্রু, দ্রু ইত্যাদি।

---

* হস্তে লিখিতে হইলে, যে বর্ণে ফলা যোগ করিতে হইবে, তাহার নিম্নে ফলা লিখিয়া দিলেই চলে। অক্ষর-যোজনা কার্য্যের সুবিধার জন্য '্য'ফলা ভিন্ন অন্য ফলাযুক্ত বর্ণ স্বতন্ত্রবর্ণ-হিসাবে ঢালাই হইয়া থাকে। এইরূপে অচ্ যুক্ত (স্বরচিহ্নযুক্ত) গু, রু, রূ, হৃ, স্তু, স্তু, গ্রু, শ্রু, শ্রূ ক্রু, দ্রু প্রা; কতকগুলি বর্ণের আকার পরিবর্ত্তন হয় বলিয়া এবং ৃকারযুক্ত বর্ণগুলিও সীসাক্ষরে স্বতন্ত্র বর্ণ হিসাবে ঢালাই হয়। এতদ্ভিন্ন আরও কতকগুলি যুক্তাক্ষর স্বতন্ত্র ঢালাই হইয়া থাকে:—র্দ্ধ, র্দ্ধ, র্ত্ত, ত্ত্ব, জ্জ্ব, দ্ব ইত্যাদি। কতকগুলি আবার শোভার এবং যোজনা-

পূর্ব্বোক্ত কয়েক প্রকার সংযুক্ত বর্ণস্থলে বঙ্গদর্শনের লেখক প্রস্তাব করিয়াছেন যে ;—

১। গু, রু, রূ, শু প্রভৃতি রূপান্তরিত অচ্ যুক্ত বর্ণগুলি ছাপার কার্য্য সৌকর্য্যার্থে গ্ু, র্ু, র্ূ, শ্ু প্রভৃতি সহজ সংযুক্ত আকারে লিখিলে, ব্যাকরণ, উচ্চারণ, ভাষা কিছুরই দোষ হয় না, সুতরাং পূর্ব্বোক্ত যুক্তরূপগুলি ত্যাগ করা যাইতে পারে।

২। যে যে বর্ণের পূর্ব্বে বর্গের পঞ্চম বর্ণ যুক্ত আছে, সে গুলিকে (অর্থাৎ ঙ্ক, ঞ্চ, ন্ত, ম্ব প্রভৃতিকে) অনায়াসে বিদায় দেওয়া যায় ; কারণ, ন্ন, ণ্ণ, ম্ম এই তিনটী বর্ণব্যতীত অপর সকলগুলির সংযোগস্থলে পঞ্চম বর্ণটীর স্থানে ং ব্যবহার করিলে চলিতে পারে, যেমন ;—'পর্য্যঙ্ক' 'পঞ্চ', 'কণ্ঠ', 'দন্ত', 'কম্প' প্রভৃতি স্থলে পর্য্যংক, পংচ, কংঠ, দংত ও কংপ লিখিতে পারা যায়। যে প্রাকৃত ভাষাহইতে বাঙ্গালার উৎপত্তি, সেই ভাষায় ও তদুৎপন্ন হিন্দী প্রভৃতি ভাষায়ও ঐরূপ 'ং' দিয়াই লিখিত হয় ; কারণ, ওরূপ লিখিলে ভাষার কোন ক্ষতি নাই অথচ উচ্চারণানুরূপ লেখা হয়। কেহ কেহ আশঙ্কা করিতে পারেন, 'দন্ত'কে দংত, 'লম্ফ'কে লংফ লিখিলে উচ্চারণ ভেদ হইতে পারে। তাহা কতকটা স্বীকার্য্য বটে ; কারণ, 'দন্ত' যেরূপে উচ্চারিত হয়, তাহা সংস্কৃত উচ্চারণ আর দংত যেরূপে উচ্চারিত হয়, তাহাই মানুষের প্রকৃত উচ্চারণ। বৈদিক মন্ত্রে ঐরূপ স্থলে ং দিয়া লেখা হয়। অনেক বাঙ্গালা পুস্তকে আজিও 'অসংখ্য', 'সংপ্রতি', 'সংবৎ' প্রভৃতি লিখিত হয়। তবে যাঁহারা নিতান্ত সংস্কৃত উচ্চারণের পক্ষপাতী তাঁহারা পঞ্চম বর্ণটির নীচে (্) হস্ চিহ্ন দিয়া লিখিবেন, যেমন ;— দন্‌ত, কণ্‌ঠ, কম্‌প ইত্যাদি।

৩। অন্যান্য ব্যঞ্জন যুক্ত ব্যঞ্জন গুলিকে (্) হস্ চিহ্ন-ব্যবহারে ভাঙ্গিয়া লিখিয়া বিকটাকার সংযুক্ত বর্ণগুলিকে বাদ দেওয়া যাইতে পারে, যেমন ;—'বুদ্ধি' স্থলে বুদ্‌ধি, 'কপিত্থ' স্থলে কপিৎথ * ইত্যাদি। ইহাতে আরও একটা সুবিধা হয় এই যে, কোন বর্ণের সহিত কোন বর্ণের যোগ হইতেছে, তাহাও সহজে বুঝা যায়, নতুবা 'ত্থ' দেখিলে কোন্ কোন্ বর্ণের যোগে উহা উৎপন্ন, তাহা বুঝা যায় না।

৪। ফলাযুক্ত বর্ণস্থলে ঐ নিয়ম অবলম্বন করিলে কোন হানি হয় না, বরং 'ু' ফলাযুক্ত কতকগুলি যে অস্বাভাবিক আকৃতিবিশিষ্ট বর্ণ আছে, তাহাদিগকে স্বাভাবিক করিয়া লইতে হয় ;—ক্র, ত্র, ন্ত্র, স্ত্র ইহাদিকে ক্‌্র, ত্‌্র, ংত্‌্র, স্‌ত্‌্র এইরূপ লিখিতে হয়। রেফযুক্ত বর্ণের দ্বিত্ব-আদেশ সংস্কৃতেও বিকল্পে হয়, সুতরাং তাহা ত্যাগ করা যায়, 'কর্ম্ম'কে কর্ম লিখিলে কোন দোষ হয় না।

বঙ্গদর্শনের এই সংস্কারকের প্রস্তাবমতে সকল প্রকারের যুক্তবর্ণ লিখিবার জন্য এই কয়টি ফলা ও চিহ্নের আবশ্যক ;—(্)হস্, ং, ঃ, ঁ, ্য, ্ব, ্র, ৃ, এবং ক্ষ ও জ্ঞ এই দুইটি যুক্ত বর্ণও প্রয়োজন †

কার্য্যের সুবিধার জন্য অব্ চিহ্নের সহিত ঢালাই হয় ; যথা টি, টী, ঠি, ঠী, ষ্টী। এতদ্ভিন্ন ৎ, ', ্ন, ্ন, ্ব, ্ল, ্ন প্রভৃতি যুক্ত বর্ণ ও তৎসংযুক্ত অন্য অচ্ চিহ্নযুক্ত বর্ণগুলিও স্বতন্ত্র ঢালাই হয়।

* এই নিয়ম বাঙ্গালায় যে একেবারে নাই তাহা নহে, যেমন,—উৎপন্ন, উৎস, কুঞ্জ্ঝটিকা, ঝনৎকার, চমৎকার প্রভৃতি স্থলে 'ৎপ' 'ৎস' 'ঞ্ঝ' ও ৎক প্রভৃতি যুক্তাক্ষর একটী বর্ণরূপে একত্রে ভিন্নাকারে লিখিবার উপায় নাই বলিয়া, একটি স্বতন্ত্র বর্ণরূপে ঢালাই করা অক্ষরও নাই ; কাজেই হস্-ব্যবহারে যুক্তাক্ষতা প্রকাশ করিতে হয়।

† বঙ্গদর্শনের সংস্কারক ফলার মধ্যে 'ন' ফলা বাদ দিয়াছেন। বোধ হয় 'ন' ফলাযুক্ত বর্ণ

তৎপরে বাবু দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর (বাঙ্গালা ফনোগ্রাফীর জন্য) রেখাক্ষর বর্ণমালার উদ্ভাবন অভিপ্রায়ে ১২৯২ সালের বালকের ৪র্থ সংখ্যায় পদ্যে কতকটা চেষ্টা করেন।

সেই প্রবন্ধে তিনিই বর্ণমালা সংস্কারের প্রস্তাব করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই এস্থলে উদ্ধৃত হইল ;—

অথ হলবর্ণের সংখ্যা।

চৌত্রিশটী হলবর্ণ, তার মধ্যে দুটি,
কোন কাজ নাহি করে বার মাস ছুটি॥
দুই ব'র এক এক ব' তো কিছুই না করে,
অথচ অন্তঃস্থ বলি খ্যাত চরাচরে॥
আছেন আর একজন পালোয়ান মিঞা,
নাম খুব জাঁকাল—পিঠে পালান ঞ॥
পালানে হেলান দিয়া পাকাইয়া ল্যাজ,
ঝিমোয় রাত্তির দিন, এই তাঁর কাজ॥
গেরদা ঠেসান দিয়া, আলবোলা ফোঁকে,
ঢুলিয়া পড়েছে ঘাড় আফিমের ঝোঁকে॥
কোন কাজ যদি তারে দেখিনু করিতে,
যত তাঁর কেরামত "চৈতন্য চরিতে"॥
ঞ আর অন্তঃস্থ ব—মিছে এক দায়!

এইরূপে দ্বিজেন্দ্র বাবুর ব ও ঞ দুইটী বাদ দিয়াছেন আর কোন পরিবর্ত্তন করেন নাই, তৎপরে বাবু ইন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় ১২৯৭ সালে প্রতিমার ২য় সংখ্যায় "লেখায় ব্যাঘাত" বলিয়া একপ্রবন্ধে তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সুরে নিম্নলিখিত কয়েকটী স্থলে সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা দেখাইয়াছেন ;—

১। বাঙ্গালায় স্বতন্ত্র বর্ণমালা নাই, যাহাদেরদ্বারা কাজ চলে, তাহারা সংস্কৃত ভাষার বর্ণমালা ; সুতরাং "পরের পোষাক গায়ে ঠিক না হইবারই কথা। যে পরে, কোন রকমে তাহার কাজ সারা হয় হয় বটে, কিন্তু তাহার মন খুঁৎ খুঁৎ করিতে থাকে," অর্থাৎ সংস্কৃতের বর্ণমালা-দ্বারা বাঙ্গালা ভাষার কাজ ঠিক চলিতেছে না। এসম্বন্ধে ইন্দ্রনাথ বাবু বলেন, "বাঙ্গালার বর্ণমালা নাই, ইহা নূতন কথা কি না জানি না ; কিন্তু ইহা যে প্রকৃত কথা, তাহা একটু বুঝাইয়া বলিব। একটি একটি বর্ণ একটি একটি পৃথক ধ্বনির দ্যোতক চিহ্ন মাত্র। কোন একটি ভাষায় যত গুলি পৃথক্ পৃথক্ ধ্বনি উচ্চারিত এবং ব্যবহৃত হয়, ততগুলি পৃথক্ পৃথক্ চিহ্নের প্রয়োগ থাকিলে, তবে সে ভাষার সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন বর্ণমালা আছে, বলা যায়। মিশ্রভাষার এই ধ্বনির সংখ্যা একান্ত অনিশ্চিত ; কখন বাড়ে, কখন কমে কিছুই বলা যায় না। এই জন্য মিশ্র ভাষাতেই বর্ণ-বিড়ম্বনা উপস্থিত হয়। বাঙ্গালা মিশ্র ভাষা। বাঙ্গালায় কতক সংস্কৃত, কতক হিন্দী, কতক উর্দ্দ, কিছু ফারসী, আজকাল আবার কিছু ইংরাজীও জুটিয়াছে এবং জুটিতেছে। এই জন্যই বাঙ্গালাকে মিশ্রভাষা বলি। যতগুলি ভাষার শব্দ, এই বাঙ্গালা ভাষায় আসিয়া স্থানলাভ করিতেছে ততগুলি ভিন্নজাতীয় ধ্বনিও বাঙ্গালায় প্রয়োগ করা আবশ্যক হইতেছে। অথচ দেশের প্রকৃতিবশতঃ সেই সকল ভিন্ন ভাষার ধ্বনি অবিকলরূপে তিষ্ঠিতে পারে না।

গুলি ঢালাই হইয়াছে বলিয়া, উহার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন না। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে, অনেক অক্ষরইতো ঢালাই হইয়াছে, তাহাদেরই বা দূর করিবার আবশ্যক কি?

ধ্বনির অল্প বিস্তর বিকৃতি ঘটিয়া থাকে। তাহার ফল, এই হয় যে, কোন এক ভাষার বর্ণমালাই যথাযথরূপে এই মিশ্র ভাষার প্রয়োজন-সাধন করিতে পারে না এবং সকল ভাষার বর্ণমালা একত্র করিলেও সে প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে না।

২। সংস্কৃত বর্ণমালাই বাঙ্গালার বর্ণমালা বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে। জ, য, ও শ, ষ, স, প্রভৃতি বর্ণগুলির আকৃতিগত প্রভেদ থাকিলেও ধ্বনির দ্যোতকতা বিষয়ে একেবারে অভেদ। বর্গীয় 'ব' ও অন্তঃস্থ 'ব' এর কেবল নামেই প্রভেদ, নহিলে উচ্চারণ বা আকার কিছুতেও কোন প্রভেদ নাই।

৩। স্বরবর্ণের আরও গোলযোগ। বাঙ্গালাভাষায় উচ্চারণে হ্রস্ব-দীর্ঘের প্রভেদ নাই, অথচ সংস্কৃতের "হ্রস্ব-দীর্ঘ" বাঙ্গালায় আসিয়া আপনিও বিব্রত, আমাদিগকেও বিপদ্‌গ্রস্থ করিয়াছে। যেমন "ঘোষেদের হরি" আর "বোসেদের হরি" বলিয়া একনামের দুই প্রতিবেশীকে চিনিতে এবং চিনাইতে হয়, বাঙ্গালায় এই হ্রস্ব দীর্ঘ দেখিয়াও ঠিক সেইরকম করিতে হয়, যেমন "হ্রস্ব-ই, দীর্ঘ-ঈ, হ্রস্ব-উ, দীর্ঘ ঊ ইত্যাদি। ই, ঈ, উ, ঊ, যদি বস্তুতঃ বাঙ্গালায় পৃথক পৃথক ধ্বনির দ্যোতক হইত তাহাহইলে এরূপ হ্রস্ব, দীর্ঘ বলিয়া বিশেষণ দিয়া পরিচিত করিতে হইত না। ইন্দ্রনাথ বাবু বলেন "অক্ষয়দাদার তাড়নায় আর তাঁহার ছাপাখানার অনুরোধে আমাদের অনেক 'ঈ' কে হ্রস্ব করিতে হইয়াছে। অক্ষরের মাথা ভাঙ্গিবে বলিয়া দাদা ভয় দেখাইতেন, কাজেকাজেই ভয়ে আমরাই মাথা খাটো করিয়া লইতাম।"

৩। ঋ ও ঌ স্বরবর্ণ বলিয়া বাঙ্গালায় পরিচিত কিন্তু 'ঋ' কে 'রি' করা যাইতে পারে; কিন্তু 'ঌ' এর সঙ্গে খাঁটী বাঙ্গালা ভাষার বর্ণপরিচয়ের সময়ব্যতীত আর জন্মেও দেখা হয় না।

৪। "বধু-ঠাকুরাণী" সংস্কৃত শব্দ; কিন্তু খাঁটি বাঙ্গালায় উহা 'বউ' না 'বউ' হইবে, তাহা আমরা জানি না, আমাদের পণ্ডিত মহাশয়রাও জানেন না; ব্যাকরণ-অভিধানেও নাই। কেমন করিয়া 'ঐ' লিখিব? 'ঐ' না 'অই' না 'ওই'?

৫। 'য-ফলা' ও 'ব-ফলা' দ্বিতীয়ভাগ বর্ণ পরিচয়ে আছে, কিন্তু প্রভেদ কি? "নিত্য" ও "সত্ত্ব" একই উচ্চারণ। আবার "সদ্য" ও "সোদ্দ" লিখিতে বানান ভিন্ন হয়। "দ্বারা" শব্দে 'ব' এর বাজে খরচ কেন? "আত্মার" শব্দে 'ম' থাকা না থাকা; তবে চন্দ্রবিন্দু দিয়া যে 'তঁ' হয়, 'ত্ম' র 'ম' ও সেইরূপ নিজত্ব পরিত্যাগ করিয়া ঐ রকমে ব্যাগার দেন।

৬। অকারান্ত কি হলন্ত বর্ণের মূর্ত্তি দেখিয়া কিছুই চিনিবার যো নাই। এক 'কর' শব্দের উচ্চারণ অর্থ বিশেষে 'কর' (উভয়ই অকারান্ত), 'কর্' (যেমন 'তুই কর্'), 'কোরো' (করিও অর্থে) 'করো' (তুমি করো) প্রভৃতিরূপে উচ্চারিত হয়, কিন্তু প্রয়োগস্থলের অর্থ না বুঝিলে লেখা দেখিয়া উচ্চারণ করিবার উপায় নাই। এই শ্রেণীর গোলমাল যথেষ্ট আছে, যথা,—'তুমি বস', 'তুমি বোসো', 'চুল খাট' কি 'চুল খাটো' 'কাল কি বার' ও 'কাল জল', 'আজ বার দিন' একই রূপ লিখিত হয়।

৭। 'এক' লিখিয়া 'এ' যেরূপে উচ্চারণ করি, এবং লিখিয়া 'এ'র উচ্চারণ তেমন করি না।

এতদ্ভিন্ন বিদেশীয় শব্দগুলির অনেক কথাও ইন্দ্রনাথ বাবু দৃষ্টান্ত দিয়া দেখাইয়াছেন যে, সকল স্থলে আরও গোল ঘটে।

এতদ্ভিন্ন বাঙ্গালায় আর কয়টী কথার উল্লেখ করিয়া আমরা বক্তব্য বিষয়ের অনুসরণ করিব।

ইন্দ্রনাথ বাবু যে সকল স্থলে সংস্কার প্রার্থী আমরাও সেই সকল স্থলে সংস্কার চাহি। তদ্ভিন্ন বাঙ্গালায় রেফযুক্ত বর্ণ ও যুক্ত বর্ণ লইয়া বড় গোল ঘটে, যথা,—

১। বর্জ্জন, মর্ম্মর, বর্দ্ধিত প্রভৃতি কথা লিখিতে ব্যাকরণের নিয়মানুসারে রেফযোগে জ, ম, ও ধ এর দ্বিত্ব বিকল্পে লিখিত হয়; কিন্তু দ্বিত্ববর্ণের উচ্চারণে কিছুই ভেদ দেখা যায়না। কতকগুলি

বর্ণ আবার বিকল্প নিয়ম অতিক্রম করিয়া রেফযোগে নিত্য দ্বিত্ব হয়, যেমন, বর্দ্ধিত, কর্ম্ম, কার্য্য, অর্জ্জন ইত্যাদি। "বঙ্গাধিপ-পরাজয়কার" এই দ্বিত্ব ত্যাগকরাইবার জন্য চেষ্টা করেন ও নিজেও বঙ্গাধিপ-পরাজয়ে ত্যাগ করেন।

২। 'সত্য', 'সত্ত্ব' 'স্বত্ব' ইত্যাদি যুক্তবর্ণবিশিষ্ট কথাগুলির বানান বিভিন্নতা বড়ই কষ্ট-বোধ্য। 'সংকল্প' ও 'সঙ্কল্প'—এই দুয়ে লিখিতে যে প্রভেদ ও ব্যাকরণোক্ত যে প্রভেদ, উচ্চারণে বা অর্থে তাহার কিছুই বুঝা যায় না। 'উজ্জ্বল' ও 'প্রজ্বলিত', 'ভদ্র' ও 'দারিদ্র্য'', জ্বল' ও 'জ্বালা' 'অর্থ' ও 'যাথার্থ্য'; 'লক্ষ্য' ও বক্ষ' ইত্যাদি স্থলে ব্যাকরণ ঘটিত যে বিভিন্নতা আছে। তাহা উচ্চারণে বিন্দুমাত্রও ধরিবার উপায় নাই।

এই সকল স্থলে যাঁহারা ব্যাকরণে ব্যুৎপন্ন নহেন, তাঁহারা যাহা ইচ্ছা লিখিয়া থাকেন সুতরাং এসকল বিসদৃশ বানান ভাষা হইতে দূর করিতে পারিলেও সুবিধামতে নবগঠিত শব্দ শাস্ত্র লইয়া ব্যাকরণ পড়িতে পারিলে ভাষা সহজবোধ্য সহজ, লেখ্য ও বিদেশীয়দিগের মধ্যে বহুল প্রচারিত হইতে পারে। ইন্দ্রনাথ বাবুর মত এই পর্য্যন্ত।

Dr Hayward বলেন "Now language is the means of mental communication between individuals and between peoples, and all irregularities, difficulties, anomalies, and uncertainties in a language, form stumbling blacks in the way of easy mental intercommunication and so far impede the progress of mental advancement; and so of social and national elevation and improvement: for it is quite as true in the mental as in the material world that the means of intercommunication are the means of progress."

দেশের মানসিক উন্নতি যদি পরস্পরের মানসিক ভাব পরস্পরের মধ্যে ত্বরিত জ্ঞাপনের উপর নির্ভর করে—আর দেশের ভাষাই যখন মানসিক ভাব জ্ঞাপনের একমাত্র উপায়—তখন ইহা নিশ্চিত যে সে ভাষা অতি প্রাঞ্জল ও বোধগম্য হওয়া উচিত এবং সেই নিমিত্ত সকল প্রকার প্রকার কঠিন, অনিশ্চিত বানানগুলি পরিহার করা সর্ব্ববিধায় কর্ত্তব্য। বঙ্গভাষার হিতৈষীদিগের ও বিদ্যালয়ের অধ্যাপকদিগের সহানুভূতি এ সম্বন্ধে একান্ত স্পৃহনীয়। তাঁহাদের সহায়তা ব্যতিরেকে এ কার্য্যে লিপ্ত হওয়া অতিশয় গুরুতর ব্যাপার। আমাদের ভাষা সহজে কেহ শিখিতে পারেন না; এবং বানানের কাঠিন্য বশতঃই কেহ অগ্রসর হন না। বোধ করি কেহই একথা অস্বীকার করিবেন না। বিদেশীয়ের কথা ছাড়িয়া দিন, অনেক বাঙ্গালীও বঙ্গভাষায় সম্যক্‌রূপে ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে সমর্থ হন না। আমাদিগের বানানের একাধীভূত অবস্থার হানিজনক ফল অসংখ্য। পণ্ডিতবর মুলার সরল ভাষার প্রশংসার্থ বলেন, "I hold that language is meant as an instrument of communication, and that in the struggle of life the most efficient instrument of communication must certainly carry the day; (Fortinightly Review April 1875 P. 558). আমাদিগের বিসদৃশ বানানের দোষ এই যে অত্যল্প লোকেই প্রকৃত বানান লিখিতে সক্ষম; এই নিমিত্ত প্রকৃষ্ট প্রকারে সাহিত্যের উন্নতি হইতেছে না। আয়াসসাধ্য বলিয়া অনেকে যৎসামান্যই শিখিয়া থাকেন এবং সে শিক্ষা এমনি ভাসা-ভাসা যে, সময়ে সময়ে তাঁহারা নিজের ভাবই সুন্দররূপে ব্যক্ত করিতে স্বর্ম্মাক্ত কলেবর হন। তৎপরে আমাদের বাঙ্গালায় যে প্রকার বানান-প্রণালী চলিত আছে, তাহাও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর নহে; কারণ, বঙ্গভাষায় অধিকাংশ শব্দের অন্ত 'অ'কার প্রায় উচ্চারিত হয় না; শব্দের শেষে 'অ' থাকিলেও হসন্ত

বর্ণের ন্যায় উচ্চারিত হয়। যথা ; রাম, শাল, হাত, তাপ ইত্যাদি। যদি তাহাই হইল, তবে যে সকল অকারান্ত শব্দ ওকারান্ত শব্দের ন্যায় উচ্চারিত হয়, তাহাতে ওকার যোগ করিলে বিশেষ ক্ষতি কি ? বরং ঐ সকল শব্দ ঐরূপ লিখিলে আরও সহজ হইয়া আইসে, বিশেষতঃ বিদেশীয়েরা বিনা আয়াসে অসন্দিগ্ধ চত্তে ঠিক উচ্চারণ করিতে সক্ষম হইবে। পূর্ব্বোক্ত স্থল ব্যতীত আরও কতকগুলি স্থলে পরিবর্ত্তন আবশ্যক. যথা—

(১) বাঙ্গালার চলিত বানান-প্রণালীতে ও বর্ণমালায় কতকগুলি যুক্তবর্ণ আছে যাহার উচ্চারণ পরিবর্ত্তিত হয় যেমন "হ+য=হ্য (ঝ্য)", "হ্+ম=হ্ম (ম্হ)", জ্+ঞ=জ্ঞ (গ্গঁ), ক্+ষ=ক্ষ (ক্খ)" দ্+ব=দ্ব (ইহার উচ্চারণ ৩ প্রকার, যথা, দ=দ্বার ; দ=বিদ্বান ও দ্ব=উদ্বিগ্ন)" ইত্যাদি। এইরূপ বিসদৃশ বানান ও উচ্চারণ-প্রথা পরিবর্ত্তন করিয়া সরল করিতে পারিলে ক্ষতি কি ?

(২) বাঙ্গালার অক্ষর লিখন কোনমতেই দ্রুত হয় না ; কারণ, ইহার বর্ণগুলি বহুকোণ-বিশিষ্ট ও একটা শব্দের মধ্যে হয়তো তিন চারিটা অক্ষর জড়াইয়া লিখিতে হয়। ইহা লিখিতে যত অধিকবার কলম কাগজ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া লইতে হয়, দেবনাগর অক্ষর ব্যতীত আর কোন অক্ষরে এত হয় কিনা সন্দেহ। লিখিবার পক্ষে ইংরাজী বর্ণমালা অতি সহজ, কেবল উপর নীচে টানিয়া গেলেই হয়, এক টানে এক লাইন লেখা হয়। বাঙ্গালা বানানের মধ্যে অক্ষর সংযোগ কত বিষম তাহা দেখাইতেছি। যথা—"ঊর্দ্ধ" "কর্ত্তৃক" "তদ্রূপ" "দর্দ্দুর" "উজ্জ্বল" "কৃচ্ছ্র" "তার্ক্ষ্য "বক্ত্র" "স্নিগ্ধ" দংষ্ট্রা" ইত্যাদি। এই সকল ত্যাগ করিবার উপায় হইলে ক্ষতি কি ?

উল্লিখিত স্থলে সংস্কার অবলম্বন করিলে ক্ষীণ মেধাশালী ব্যক্তিগণও বিনা আয়াসে অল্প সময়ে সকল শব্দ কণ্ঠস্থ করিয়া লইতে পারেন ; অথচ চিরকালই স্মৃতিপৃষ্ঠে প্রস্তর-খোদিত অক্ষরের ন্যায় প্রকৃত বানান অঙ্কিত রহিবে। বয়ঃপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী বালকবালিকারা যখন জানিতে পারিবে যে, একটি বই 'জ' নাই একটি বই 'ন' নাই, একটি বই 'শ' নাই, একটি বই 'ত' নাই ; 'ঞ' ও 'ক্ষ' নাই ('ব'র কথা ধরি না ; কারণ, উহা এক প্রকারই উচ্চারিত হয়)—তখন বানান করিবার সময় তাহাদের আর কোন প্রকার কষ্টানুভব করিতে হইবে না এবং গুরুমহাশয়ের বেত্রাস্ফালন বা রোষ-কষায়িত-লোচনদ্বয় দেখিতে হইবে না ; প্রত্যুত সঙ্গত ও সহজ বানান করিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিবে—উৎসাহিত হইবে। আবার যখন তাহারা দেখিবে যে একটি বই 'ই' নাই ; একটি বই 'উ' নাই, একটি বই 'ঋ' নাই '৯' নাই ; তখন তাহাদের আর আহ্লাদের পরিসীমা থাকিবে না।

যখন বানান সংস্কারের এই সকল গুণ দেখা যাইতেছে, তখন উহা কি আমাদের প্রার্থনীয় নহে ? অবশ্যই প্রার্থনীয়। কোন সহৃদয় পাঠকের নিকটে ইহা অননুমোদনীয় হইতে পারে ? আমাদের চক্ষু অনভ্যস্ত, কর্ণ অনভ্যস্ত, তাই এরূপ বানান দেখিলে ও যুক্তি শুনিলে প্রাণে আঘাত লাগিবে। অনভ্যস্ততার জন্য আঘাত লাগিবে বলিয়া কি মানব, সমাজের হিতকর, উন্নতিকর, অল্প-আয়াসকর সংস্কার গ্রহণ করিবে না ? পুরাতন বলিয়া, ভালবাসি বলিয়া, পূর্ব্বপুরুষগণ ব্যবহার করিতেন বলিয়া, উন্নতি বিরুদ্ধ, অসংস্কৃত, পদার্থ কি মস্তকে তুলিয়া রাখিতে হইবে ? কদাপি না। এই সমাচান বানান সংস্কারের বিষয় অধিক কথায় বুঝাইতে চেষ্টা করিলে পাঠকগণের বিরক্তিকর হইবে বলিয়া সংক্ষেপে কতকগুলি প্রধান প্রধান কথা উল্লিখিত হইল মাত্র। এক্ষণে বিদ্যান্মণ্ডলী সমীপে সানুনয়ে নিবেদন, তাঁহারা যেন সকলে সমাবিষ্ট হইয়া এ বিষয় আলোচনা করেন এবং বানান-সংস্কার করিবার আবশ্যকতা নির্ণয় করেন।

নিম্নে বানান সংস্কারের উদাহরণ দিয়া বিদায় লইব।

স্বরবর্ণ।

অ আ ই ঈ উ ঊ এ ঐ ও ঔ।*

ব্যঞ্জনবর্ণ।

ক খ গ ঘ ঙ। চ ছ জ ঝ †। ট ঠ ড ঢ। ত থ দ ধ ন। প ফ ব ভ ম। র ল হ। ড় ঢ় য় ঁ। ফলা—্য, ্র, ্ল, ্ব, ্ম, া, ি, ী, ু, ূ, ে, ৈ, ৌ। যুক্তবর্ণ—রু, শু, গু, ক্র, ত্র, ভ্র, ইত্যাদি

শিখ্খা।

জাহার প্রোভাবে শোরির ও মোন্ উভয়ের্ জড়োতা অপোনিত হইয়া শজিবতা সম্পাদিত হয় এবং উভয়েই ক্রমে ক্রমে অ্যাক্ অপূর্ব্ব নব বলে বলিয়ান্ হইয়া অ্যাক্ অপূর্ব্ব নব সৌন্দর্জ বিভুশিত হোইতে থাকে তাহার নাম্ শিক্খা। জে শিক্খায় শোরিরের মাংসপেশি সোমুহ দ্রিঢ় ও বোলিশ্ঠ হোইয়া শোরির্কে শোক্তিময় করে এবং শুশ্থতা ও অংগ শৌশ্ঠব প্রোভ্রিতি সম্পন্ন হয়, তাহার্ নাম্ শারিরিক্ শিক্খা আর্ জে শিক্খায় চিত্য শুদ্ধি, মোনের উন্নোতি শন্তোশ এবং হ্রিদয়ের্ বল্ ও ব্রিদ্ধি ও প্রাণে নবশোক্তির আবির্ভাব্ হয়, তাহার নাম্ মানসিক্ শিক্খা। শিক্খা সম্পূর্ণ না হোইলে, মানুশ যেন ভাঙা ভাঙা বোলিয়া বোধ হয়।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ, এম্ এন্ পি, এল্ (লণ্ডন)
ফনোগ্রাফী বা রেখা-শব্দাভিজ্ঞানবিদ্যার অধ্যাপক
(কলিকাতা)

মনের প্রতি।

উধাও উধাও মন ! উধাও উধাও
ধূলায় লুটায়ে কেন আর ?
একবার ধরা ছেড়ে তাঁর কাছে যাও,
প্রণিপাত কর একবার।

এতদিন ভুলে ছিলে সে লজ্জায় নাকি
এক দিন তেমনিই যাবে ?
আপনার দোষে যদি অন্ধ এক আঁখি
সাধ করে অপর হারাবে ?

বটে বটে ঝরা ফুল ফোটেনাতো আর
প্রতিক্ষণে শোভা তার ক্ষীণ।
তা বলে কি নবফুল সেই গাছে আর
ফোটে না শোভে না পর দিন ?

ভুলের উপর ভুল কর না কর না
টানে তোমা অকূল প্রবাহ,—
তা বলে বাঁচিতে যেন ভুজঙ্গ ধর না
বেশী ভাগ বিষের প্রদাহ !

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র ঘোষ

---

* আমি বঙ্গদর্শনের লেখকের অি, অী, অু, অূ ইত্যাদি লিখিতে প্রস্তুত নহি। তবে যদি সকলে উহাই সুবিধাজনক বোধ করেন, আমার আপত্তি নাই ; আমরা প্রস্তাবের প্রধান উদ্দেশ্য, যে পন্থা সমস্ত সহজ, সরল ও সুবিধাজনক হইবে. তাহাই গ্রহণ করা আবশ্যক।

† অতি অল্পমাত্র কথার জন্য "ঞ" রাখিবার আবশ্যক নাই। "গোঁসাঞি" যখন গোঁসাঁই লিখিলে চলে তখন বর্ণমালার বোঝা বাড়াইবার আবশ্যকতা নাই।

মোহিনী

গ্রামের সীমায় ক্ষেতের নিকট
একটী কৃষক করিত বাস।
পরিবারে শুধু দুটী ছেলে মেয়ে
জীবিকাও শুধু ক্ষেতের চাষ।
ছেলেটীর নাম রেখেছে মদন
মেয়েটি তাহার দুহিতা নয়,
এক কুটুম্বিনী তাহারি আলয়ে
প্রসবি মেয়েটি মরিয়ে যায়;
তদবধি বুড়া মেয়েটিরে নিয়ে
আপনার মত পালিছে ঘরে,
বুড়া বয়সের নয়ন-পুতলী
কখন চোখের আড় না করে।
বুড়ার সংসারে নাহিক গৃহিণী
ছেলেটি মেয়েটি মায়ার ডোর,
তাহাদেরি তরে এত বয়সেও
চাষবাসে বুড়া করয়ে জোর।
মেয়েটির রূপ দেখিয়ে কৃষক
আদরে রেখেছে মোহিনী নাম,
ক্ষেতে ফলে ধান, ঘরে ছেলে মেয়ে
বুড়ার হৃদয় আনন্দ-ধাম!

[২]

প্রতিদিন বুড়া ছেলেটিরে নিয়ে,
ক্ষেতে গিয়ে করে চাষের কাজ,
ঘরে যত কাজ করয়ে মোহিনী
বিরাম নাহিক সকাল সাঁঝ।
চাষের সকলি শিখেছে মদন
মোহিনী শিখেছে গৃহের পাট,
প্রতিবেশী সবে বাখানে তাহারে
দেখে ঝর্‌ঝরে আঙ্গিনা-বাট।

মদন মোহিনী সদা দুইজনে
চোখে চোখে থাকে বুড়ার কাছে,
দুজনের মুখ দেখিয়া সদাই
সুখে দুখে বুড়া আনন্দে আছে।
বিবাহের কাল হয়েছে দোঁহার
থেকে থেকে তাই একটু ভাবে;
ভাল ঘরবর দেবেথোবে কিছু
ঘরে মোটা ভাত কাপড় পাবে;
না হ'লে কেমনে মোহিনীরে দিয়ে
প্রাণধরে বুড়া বাঁচিবে কত?
কোথা পাবে বর কোথা মেয়ে পাবে
জামাই বধূটি মনের মত!

[৩]

শেষে একদিন ভাবিল আপনি
মদনে মোহিনী করিব দান,
সুখের উপরে সুখ উছলিবে
ছেলে বউ দেখে নাচিবে প্রাণ।
ঠিক হল তাই; ডাকিয়া মদনে
মনের বাসনা বলিল তায়,
আড়ালে থাকিয়া শুনিল মোহিনী
ছুটীল বিদ্যুৎ তাহার হিয়ায়।
কে যেন তখনি হৃদয়ে থাকিয়া
তাহারে ডাকিয়া বলিয়া দিল,
মদনই তার এজীবনে পতি
যেন বালিকাও তাই বুঝিল।
তখন অমনি কি জানি কি এক
ভাবের প্রভাবে গেল ভুলিয়া।
এজনমের মত ক্ষুদ্র হৃদিখানি
মদনের পায়ে দিল তুলিয়া।

নিমেষের মাঝে এ পরিবর্ত্তন
বুঝিল না বালা কেন ঘটিল?
মদনই তার আজি হ'তে পতি
শুধু এইটুকু হৃদে ফুটিল।

[৪]

চমকিল যুবা শুনিয়ে বচন,
মোহিনীরে বিয়ে করিতে হবে!
"ভগিনী বলিয়া স্নেহ করি যারে
পত্নী হ'বে সেই, লোকে কি কবে?
নীরবে ক্ষণেক ভাবিল মদন
কিছুতেই স্থির হ'ল না মন,
মোহিনী ভগিনী দাদা বলে ডাকে
পত্নী হবে সে! সম্ভব কখন?
বৃদ্ধকালে পিতা ছন্নমতি হয়ে
অসঙ্গত কথা কহেন আজ,
পারিব না আমি এ বিয়ে করিতে
লাজের মাথায় হানিয়ে বাজ।"
নীরব দেখিয়া সুধায় কৃষক
"কি ভাবিস্ বাবা, চুপটী করে?
এ বুড়া বয়সে শুধু এক সাধ
মনোমত বধূ আনিব ঘরে;
মোহিনীর মত কোথা পাব আর
ঘর-আলোকরা গুণের মেয়ে,
নিজ কন্যামত পালন করেছি
বউ করে তারে জুড়াব হিয়ে।
ভাগ্যে যদি থাকে হরির কৃপায়
দেখিয়ে একটি নাতির মুখ,
মরিব সুখেতে এ বুড়া বয়সে
ঘুচিবে আমার সকল দুখ।"

[৫]

পিতার বচন শুনিয়ে আবার
ধীরে ধীরে যুবা বলিল তবে,
"মোহিনীরে বিয়ে কেমনে করিব
দাদা বলে ডাকে, লোকে কি কবে?
পালিতা ভগিনী ভগিনীর মত
বিয়ে করা তারে উচিত নয়।
আমিতো কখন পারিব না তাহা
অধর্ম্মের কাজ করা কি হয়?
হইয়াছে বটে বিবাহের কাল
মোহিনীর বিয়ে উচিত বটে,
দুইজনে মিলে খুঁজিতে হইবে
ত্বরিত যাহাতে সুপাত্র ঘটে।
মাঝের পাড়ার মাধবের ছেলে
দেখিতে শুনিতে খারাপ নয়,
ঘরে ভাত আছে, জমাজমী মেলা
লাঙ্গল চলে খান পাঁচ ছয়।
কথাবার্ত্তা কয়ে ঠিক করে ফেল
মাধব হবে না অমত তাতে,
চিরসুখে রবে দেখে হবে সুখ
মোহিনীরে দাও তাহার হাতে।

[৮]

ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা কৃষক তখন
গাল দিয়ে বলে যা' আসে মনে,
"বটে হতভাগা এতই সাহস
সমান উত্তর আমার সনে?
রাজী যদি নও অধঃপাতে যাও
আমার বাড়ীতে পাবে না স্থান,
অবাধ্য সন্তানে স্নেহ নাই মোর
অন্নবস্ত্র তারে করি না দান।
কপালে তোমার বহুকষ্ট আছে,
তাই এ দুর্ব্বুদ্ধি ঘটিল আজ,
পিতৃবাক্য হেলা দূর হয়ে যাও
অবাধ্য সন্তানে নাহিক কাজ।

বড় বুদ্ধিমান্ বুদ্ধি লয়ে য'ও
থাকিতে পাবে না আমার কাছে।
ঘু'রে এস বাবা দেথ এস গিয়ে
কটা ধানে কটা চাউল আ'ছে।"
নিরুত্তরে যুবা আনত-বদনে
অশ্রুভরা-চোখে বিদায় হল,
নিষ্ঠুর কৃষক ডাকিল না আর
মদনও আর ফিরে না এল।

[৯]

বহুকষ্ট পেয়ে কিছু দিন গেল
আছয়ে মদন খেয়ে না খেয়ে,
আরতো চলে না আরতো পারে না
মজুরী স্বীকার করিল যেয়ে।
যার ক্ষেতে চষে, তার (ই) কাছে খায়
রাতে শুয়ে থাকে তাহারি ঘরে,
মজুরীর কড়ি যাহা কিছু পায়
জমাইল তাহা বছর ধরে।
সেই কড়ি দিয়া করিলেক বিয়া
মনোমত এক চাষার মেয়ে,
সুশীলা মেয়েটি কুমুদিনী নাম
ঘর বেঁধে র'ল তাহারে নিয়ে।
বিবাহ-বারতা বধূটির কথা
বুড়াও সকলি শুনিল ক্রমে,
তথনও তার রাগ পড়ে নাই,
সন্তানের নাম না করে ভ্রমে।
এ বারতা শুনে মোহিনীরে ডাকি,
বলিলেক রাগে অধীর হয়ে,
"শুনেছ মোহিনী হতভাগা ছোঁড়া
করিয়াছে বিয়ে মধুর মেয়ে।
তুমি সাবধান ভুলেও কখন
বউটার সাথে কথা কয়োনা,
যদি কথা কও তা হ'লে তোমায়
এ বাড়ীতে স্থান আর দিব না।"

শুনিয়া মো'হিনী নিশ্বাস ফেলিল
স্বীকার করিয়া সরিয়া এল,
আড়ালে আসিতে কি জানি কি দুখে
আঁখি-জলে বুক ভাসিয়ে গেল।

[১০]

ওদিকে মদন জীবিকার তরে
মজুরী করিত নিকটে যার,
কালক্রমে তারে কালে লয়ে গেল
কাজেই মজুরী ঘুচিল তার।
ঠিকে-ঠাকা খেটে মাসে মাসে কিছু
আনয়ে মদন উপায় করে,
বিধাতার সাথে ঝগড়া করিয়া
তাতেই বউটী ব্যবস্থা করে।
দুজনের মত না হয় উপায়
শতক্লেশ পুন ঘিরিল তারে ;
তথাপি মদন ভুলেও কখন
ফিরিয়ে এল না পিতার দ্বারে।
ক্ষেতভরা ধান, গোলাভরা চাল
বুড়ার বাড়ীতে অপরে খায়,
আর অন্নাভাবে ঔরস সন্তান
দিবানিশি হোথা জ্বলিয়ে যায়।

[১১]

জ্বালার উপরে বিধি দিল জ্বালা
কুমুদ গর্ভিণী হইল কালে,
দশমাস পরে চাঁদপানা ছেলে
ষষ্ঠীর কৃপায় পাইল কোলে।
শত্রুর বদনে ছাই ঢেলে দিয়ে
দিন দিন খোকা বাড়িল তার,
দিনে দিনে স্তনে দুধ গেল মরে
খোকার পেটটি ভরে না আর।

ঘরে অন্ন নাই দুধ কোথা পাবে ?
সারাদিন ঘুরে মদন আসে,
পতি পত্নী মিলে কোলে নিয়ে ছেলে
তিনজনে আঁখি জলেতে ভাসে।
কিছুদিন গেল এইরূপে কেটে
মদন পড়িল পীড়িত হয়ে,
দারিদ্র্য-যাতনা কত সবে আর ?
পীড়াতেই প্রাণ গেল ফুরায়ে।
কাঁদিল কুমুদ ছেলেটিরে নিয়ে
অনাহারে তার কাটিল দিন,
শ্বশুর তাহার শুনিল সকলি
এখনও রাগ হয়নি ক্ষীণ,
পৌত্র-পুত্রবধূ মরুক শুকায়ে
কিবা ক্ষতি হবে তাহাতে তার,
অবাধ্য সন্তান তার ছেলে বউ
তাহাদের পরে দয়া কি আর ?

[১২]

মোহিনী শুনিল দুই দিন আজ
কুমুদ শুকায় খোকারে লয়ে,
আঁখি ফেটে তার বাহিরিল জল
সহিবে কেমনে রমণী হয়ে।
বুড়া মাঠে গেছে গোপনে অমনি
বাটি ভরে দুধ হাতেতে লয়ে,
দ্রুতপদে বালা চলিল ছুটিয়ে
উছলয় জল নয়ন বয়ে।
ঘরে গিয়ে দেখে বুকে নিয়ে ছেলে
ভূমিতে কুমুদ আছয়ে শুয়ে,
ঘুমাইছে শিশু কাঁদিছে কুমুদ
আঁখিজলে নদী বহিছে ভুঁয়ে।
"বউ দিদি শোন্ আমি রই তরে
এতই দুর্দশা তোদের আজ,
ক্ষমা কর্ বোন্, ভুলে যা সে সব
এথানে থাকিয়ে নাহিক কাজ ;

অভিমানে র'লে খোকার কি হবে
এখন ভাবিতে উচিত তাই,
যা হয়, হইবে আমার কপালে
আজিকে খোকারে লইয়ে যাই।"
এতেক বলিয়া মোহিনী ত্বরিতে
আপনি খোকারে তুলিয়ে নিল,
কোলে শোয়াইয়া কতই যতনে
দুধটুকু সব খাইয়ে দিল।

[১৩]

ক্ষুধা শান্তি হতে শিশুটি তথন
সুধাহাসি হেসে করিল খেলা,
বলিল মোহিনী তথন আবার
"চল দেখিগে বোন্, এই বেলা।
মানা ছিল মোরে, আসতে এখানে
আসি নাই তাই এতেক দিন,
অনশনে দিন তোদের গিয়েছে
শুনে আঁখিজলে কেটেছি দিন।
সয়ে ছিনু সব সেও বেঁচেছিল,
ভেবে ছিনু, কালে সকাল হবে,
কিন্তু বিধাতার বিধান বিষম
এমন হইবে কে জানে কবে ?
এই বজ্রাঘাত শুনিনু যখন
ভাবিলাম বুঝি মিটিল সব,
কিন্তু একি হায় ! কিছুই হোল না
কিসে গড়া মন কেমনে কব ?
আজিকে যখন শুনিনু সকল
বুক ফেটে গেল সকল স্মরি,
মাঠে গেলে পিতা এনু পলাইয়া
চল তাঁর পায়ে দুজনে ধরি।"

[১৪]

মাঠ হতে বুড়া বাড়াতে এসেছে
এহেন সময়ে খোকারে লয়ে,

মোহিনী কুমুদ দুজনে আসিয়ে
দাঁড়াইল তার সুমুখ হয়ে।
সুমুখে মোহিনী পিছনে কুমুদ
জিজ্ঞাসিল বুড়া "ছেলেটি কার।"
শিশু চাঁদমুখ দেখিয়া যাহার
কোলে নিতে নাহি বাসনা হয়,
এই ধরাধামে কি নাম তাহার ?
মানুষ সে জন কখন নয়!
হাত বাড়াইয়া ডাকিলেক বুড়া
হাসিয়া শিশুটি ঝাঁপিল কোলে—
যেন কতকাল পরিচয় আছে
ছাঁদিয়ে ধরিল বুড়ার গলে।
সুধা-হাসি দেখে বুড়াও গলিয়া
চুম্বিল আদরে চাঁদ-বদনে।
তখন মোহিনী ধীরে ধীরে বলে
"এর মুখ দেখে পড়ে কি মনে—
যারে একদিন আমারই কারণে
করেছিলে পর নিঠুর হয়ে,—
সে জন এখন গিয়াছে চলিয়ে
তোমারই হাতে ইহারে দিয়ে।
আজ দুই দিন সে গেছে চলিয়া
দুই দিন শিশু শুকায়ে আছে,
যার পরে রাগ সেতো আর নাই
এর দোষ কি ? একে রাখ কাছে।
তোমার আদেশ অমান্য করিয়া
আমিই এনেছি এদের আজ!
দূর হয়ে যাব তব কথামত
অবাধ্য কন্যার নাহিক কাজ ;
কিন্তু পায়ে পড়ি পিতাগো আমার
শিশু-মুখ পানে চেয়ে দেখিও,
অনাথা বিধবা তব কুলবধূ
কোথা তাড়াইবে ? ঘরে রাখিও।

[১৫]

শুনিয়ে কুমুদ বলিলেক ধীরে
"কাজ নাই বোন এতটা করে,
ছেলে কোলে নিয়ে ভিক্ষা করে খাব
তুমি কেন যাবে মোদের তরে ?
যেমন ছিলাম থাকিব তেমনি
কাজ নাই মোর হেথায় থেকে
অগতির গতি হরি দয়াময়
তিনিই লবেন চরণে ডেকে।"
কুমুদের কথা পশিতে শ্রবণে
পাষাণ ফাটিয়া পড়িল জল,
কাঁদিলেক বুড়া নিজ কার্য্য ভাবি
শোক ভারে যেন পাগল হল।
কিছুক্ষণ পরে বলিলেক বুড়া
"চূড়ান্ত শাসন করেছি তায়!
শাসন করিতে শাসিত হইনু
আর কেন ? তোরা বুকেতে আয়।
এ দগ্ধ হৃদয় কিসে জুড়াইব
কেমনে এ স্মৃতি ভুলিয়ে রব ?
আয় মা জননী গৃহলক্ষ্মী মম
আমারে চাহিয়ে ভুলে যা সব।
মোহিনী—মোহিনী! জননী আমার!
কোথা যাবি তুই আমায় ফেলে ?
তোমারই তরে দিছি বিসর্জ্জন
অবাধ্য বলিয়া সুবোধ ছেলে!
তুই গেলে বাছা বাঁচিব কি আর ?
তো'হতে সবারে পেলাম ফিরে।
তোরি তরে শুধু আজো বেঁচে আছি,
তোরি মুখ চেয়ে ভুলেছি তারে।"

[১৬]

সকল বিবাদ সকল যাতনা
আজিকার দিনে হইল শেষ।
শ্বশুর আলয়ে রহিল কুমুদ
খোকাটি নাচিয়া খেলিছে বেশ!
নাতি বউ মেয়ে লইয়ে কৃষক
কাটাইল কাল পরম সুখে,
মাসেক না যেতে বিসূচিকা রোগে
চলে গেল বুড়া অপর লোকে!
কেবা দেয় বিয়ে ? কাজেই তখন
মোহিনীর বিয়ে আর হল না।
বঙ্গ-বিধবার সমান আচার
এ জীবনে কভু, সে ছাড়িল না।*

* টেনিসনের "ডোরা" অবলম্বনে লিখিত।

সদাশিব রাও

[২]

পূর্ব্ব-প্রবন্ধে আমরা বলিয়াছি যে, ভারতবর্ষহইতে মুসলমান-প্রভুতার মূলোচ্ছেদ করিয়া হিন্দু-সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে সদাশিব সংকল্প করিয়াছিলেন। দুরাণী শাহকে দূরীভূত করিয়া, দিল্লীর মোগল-সিংহাসনে বিশ্বাস রাওকে বসাইতে তিনি স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন। হিন্দুস্থান ও দক্ষিণাত্য একছত্রাধীন করিয়া সর্ব্বতোমুখী মহারাষ্ট্রীয়-প্রভুতা প্রতিষ্ঠিত করাই, তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য হইয়াছিল। আমরা ইহাও বলিয়াছি যে, একমাত্র সংগ্রামসিংহ ভিন্ন অপর কোন হিন্দুই হিন্দু-সাম্রাজ্য স্থাপনে বদ্ধপরিকর হন নাই। সদাশিবের পরে মাধোজী সিন্ধিয়া প্রবল হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু যে কারণেই হউক, তিনি এ বিষয়ের চেষ্টা করেন নাই; সুতরাং, মহারাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যে একমাত্র সদাশিবকেই হিন্দু-সাম্রাজ্য স্থাপনের উদ্যোক্তা বলিতে হইতেছে। সদাশিবের চেষ্টা ফলবতী না হইলেও, ইতিহাস তাঁহার নামের আদর ও গৌরব করিতে ভুলিবে না। যে সকল প্রতিকূল ঘটনাবশতঃ তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই বা তাঁহার উদ্দেশ্য-সিদ্ধির পক্ষে বাধা দিয়াছিল, এস্থলে তাহাই এক একটী করিয়া বিবৃত করা আমাদের অভিপ্রেত।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, নর্ম্মদা পার হইয়া, সদাশিব সৈন্যমধ্যে শাসন ও সুশৃঙ্খলা স্থাপন করিলেন অর্থাৎ যাহাতে তাঁহার সেনাদল বিচ্ছিন্নভাবে বিচরণ না করে, অনিয়মিক সৈন্যের ন্যায় না চলিয়া, সুশিক্ষিত সেনাদলের আবশ্যকীয় নিয়ম পালন করিতে বাধ্য হয়, সেনাপতিগণকে সদাশিব এইরূপ আদেশ দিলেন এবং যেমন উত্তরদিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, তেমনই মালব, ঝান্সীপ্রভৃতি স্থানহইতে সহকারী সৈন্যসংগ্রহ করিয়া এক এক জন বিশ্বাসী আমিনের প্রতি ঐ সকল সৈন্য-পরিচালনের ভার অর্পণ করিলেন। ইহাতে মল্হর রাও প্রভৃতি সেনাপতিগণ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। কেননা, তাঁহারা জানিতেন যে, হিন্দুস্থানসম্বন্ধে তাঁহাদের বিশেষ অভিজ্ঞতা আছে; সুতরাং, আবশ্যকীয় পরামর্শ ও কর্ত্তব্য-কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য সদাশিবকে তাঁহাদের উপর নির্ভর করিতেই হইবে; কিন্তু, তাঁহাদের মনোগত ভাব বুঝিয়া, পূর্ব্বহইতেই সদাশিব তাঁহাদিগকে মন্ত্রণা-সমিতি হইতে অপসৃত করিয়া দিয়াছিলেন। সদাশিব রাও বিলক্ষণ অবগত ছিলেন যে, হোলকারপ্রভৃতি সর্দ্দারগণ আপন স্বার্থের জন্য অর্থাৎ কিসে তাঁহারা নিজে সুখে স্বচ্ছন্দে বৃদ্ধবয়সে কাল কাটাইবেন ও প্রথম বয়সের অর্জ্জিত সম্মান ও সম্পত্তি ভোগ করিবেন, কিসে তাঁহারা ছলে, বলে, কৌশলে দুর্ব্বলের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিবেন, তজ্জন্য সর্ব্বদাই ব্যস্ত। তাঁহাদের নিকট তাঁহার মহৎ উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিলে সহানুভূতি পাইবার আশা ছিল না; বরং মন্ত্রণা শত্রুপক্ষের কর্ণগোচর হইবারই সম্ভাবনা ছিল। এই আশঙ্কায় সদাশিব তাঁহাদের নিকটে তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহার এই আশঙ্কা পরিণামে কতদূর কার্য্যকরী হইয়াছিল, তাহা ক্রমে প্রকাশিত হইবে। অতঃপর সেরঙ্গা নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া সদাশিব হিন্দুস্থানের শাসন-প্রণালীর সুব্যবস্থা স্থাপন করিবার অভিপ্রায়ে উত্তর ভারতের প্রধান প্রধান সর্দ্দারগণের নিকট দূত পাঠাইলেন ও তাঁহাদের সাহায্য ও সহানুভূতি প্রার্থনা করিয়া, তাঁহার সহিত মিলিত হইতে অনুরোধ করিলেন। অনেক সর্দ্দারই সদাশিবের সহিত মিলিত হইলেন। এইরূপে শাসন-বিষয়ে সুশৃঙ্খলা স্থাপন করিতে করিতে সদাশিব দিল্লী-অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। চম্বল সহরের নিকট উপস্থিত হইয়া তিনি জাঠরাজ সূর্য্যমল্লের নিকট দূত পাঠাইলেন। হিন্দুস্থানের শাসন-ব্যবস্থা আপনা-

দিগের সহকারিতা ভিন্ন সমাহিত হইতে দেখিয়া, মলহার রাও প্রভৃতি সন্তাপিত হইতে লাগিলেন এবং অপরাপর সর্দ্দারগণের মধ্যে অসন্তোষের বীজ ছড়াইতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারই উৎসাহে সূর্য্যমল্ল স্পষ্টতঃ উত্তর পাঠাইলেন যে, সিন্ধিয়া ও হোলকার মধ্যস্থ হইলে মহারাষ্ট্রীয়-দিগের সহিত তাঁহার মিলিবার আপত্তি নাই। সদাশিব ছাড়িবার পাত্র ছিলেন না। অগত্যা উক্ত সর্দ্দারদ্বয়ের মধ্যস্থতা স্বীকার করিলেন। সূর্য্যমল্লও আগ্রা নগরীতে সসৈন্যে রাওয়ের সহিত মিলিত হইলেন। অতঃপর কি প্রণালীতে উপস্থিত যুদ্ধ নির্ব্বাহ করা কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে সদাশিব সমবেত সর্দ্দারগণের মত জিজ্ঞাসা করিলেন; কিন্তু, তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য কি, তাহা এখনও কাহাকে বলিলেন না। তিনি ভাবিলেন; সকলকে স্বমতে আনিয়া, সমান উৎসাহে উৎসাহিত করিয়া, পরে তাহাদের নিকট মনোভাব ব্যক্ত করিবেন। এই জন্য সকলের পরামর্শাজিজ্ঞাসু হইলেন। সূর্য্যমল্ল বলিলেন মহারাষ্ট্রীয় সেনার সহিত যে অতিরিক্ত দ্রব্য-সামগ্রী ও লোকজন এবং ভারী তোপসকল রহিয়াছে, সে সমুদয় চম্বল নদের অপর পার্শ্বে ঝান্সী বা গোয়ালিয়র দুর্গে কিম্বা ভরতপুরে রাখিয়া অগ্রসর হওয়াই কর্ত্তব্য। মলহার রাও এই মতের পোষকতা করিয়া বলিলেন যে, বড় বড় তোপ লইয়া যুদ্ধ যাত্রা করা সম্রাটেরই শোভা পায়, মহারাষ্ট্রীয়দিগের চিরন্তন প্রণালীতে যুদ্ধ করাই উচিত, বিশেষতঃ, বর্ষাগমে দুরাণীরা ভারতবর্ষে তিষ্ঠিতে না পারিয়া স্বদেশে পলাইতে বাধ্য হইবে।

সদাশিব বর্ষাপর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে স্বীকৃত হইলেন, কিন্তু সর্দ্দারগণের অন্যান্য কথায় এক মত হইতে পারিলেন না। সৈন্যদল হইতে তোপ সকল পৃথক করিতে অথবা সহকারী লোকদিগকে বহু দূরে ফেলিয়া যাইতে তাঁহার ইচ্ছা ছিল না; কেননা, পাশ্চাত্য প্রণালীতে শিক্ষিত পদাতিক সৈন্য অতর্কিতভাবে শত্রুকে আক্রমণ করিলে বা শত্রুহইতে আক্রান্ত হইলে, তোপের সাহায্য ব্যতীত ফললাভ করিতে পারে না এবং সম্মুখ যুদ্ধে বৃহৎ তোপ থাকিলে যেরূপ কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা, বিনা তোপে সেরূপ নহে; শত্রুর দেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া অনিয়মিক যুদ্ধ করাও কল্যাণ-কর নহে। উত্তর ভারতের সমস্ত মুসলমান শত্রুপক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল, সুতরাং শত্রুরাজ্যে বাসের ন্যায় মহারাষ্ট্রীয়দিগের হিন্দুস্থানে অবস্থান করিতে হইবে। প্রবল শত্রু উপস্থিত থাকিতে সকল সময়েই আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা; সুতরাং ক্ষুদ্র দলগুলি একেবারে নির্ম্মূল হইবার সম্ভাবনা। অনুমিত হইতেছে, এইরূপ বিবেচনা করিয়াই সদাশিব রাও সর্দ্দারগণের সহিত একমত হইতে পারেন নাই এবং ইহা যে তাঁহার অত্যন্ত সুবিবেচনার কার্য্য হইয়াছিল, তাহা আধুনিক ইতিহাস-পাঠকমাত্রেই স্বীকার করিবেন। যাহা হউক, এই সূত্রে মলহার রাও ও সূর্য্যমল্ল বিলক্ষণ বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। সূর্য্যমল্ল মহারাষ্ট্রীয় পক্ষত্যাগ করিতে মনস্থ করিয়া অবসর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। আক্ষেপের বিষয় এই যে, মলহার প্রভৃতি সর্দ্দারগণ তাঁহার সহায়তা করিতে লজ্জিত হইল না। বিচক্ষণ সদাশিব পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলেন যে, সূর্য্যমল্ল বিরক্ত হইয়াছেন। যাহাতে সে চলিয়া যাইতে না পারে, তজ্জন্য একদল প্রহরী সৈন্য স্থাপন করিলেন।

অতঃপর, সদাশিব দিল্লী অধিকার করিয়া তথায় তাঁহার প্রধান আড্ডা স্থাপন করিতে উদ্যোগী হইলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, বাদশাহের রাজধানী এখনও উত্তর ভারতীয়গণের নিকট ভারতবর্ষেরই রাজধানী; বিশেষতঃ, দিল্লী অধিকার করিতে পারিলে তাঁহার সৈন্য-গণের উৎসাহ বৃদ্ধি হইবে, তাহাদের বর্ষার জন্য আবাস নির্দ্দিষ্ট হইবে, রসদাদি সংগ্রহের অসদ্ভাব হইবে না এবং শত্রুগণের নিকটবর্ত্তী হইয়া তাহাদের কার্য্যকলাপ পরিদর্শনের সুবিধা হইবে; কিন্তু, ইতিপূর্ব্বেই দুরাণীরা দিল্লী অধিকার করিয়াছে এবং দুরাণীশাহের একজন প্রধান কর্ম্মচারী উপযুক্ত সৈন্যদল লইয়া দিল্লী রক্ষা করিতেছে এবং স্বয়ং আমেদ-শাহ দিল্লীর কয়েক ক্রোশ দূরে অবস্থান করিতেছেন। সদাশিব সমগ্র সৈন্যদল লইয়া

দিল্লীতে উপস্থিত হইলেন এবং বাদশাহের আবাস-দুর্গ বেষ্টন করিয়া শত্রুপক্ষের উপর গোলা বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াও দুরাণী-সেনাপতি দুর্গ রক্ষা করিতে পারিলেন না। সদাশিব তাঁহাকে দুর্গ পরিত্যাগ করিবার অনুমতি পাঠাইলেন। দুরাণী শাহের উজীর শাহা বুন্নি খাঁর মত লইয়া সেনাপতি য়াকুব আলী সদাশিবের হস্তে দুর্গ সমর্পণ করিলেন। সদা-শিব ও বিশ্বাস রাওকে সঙ্গে লইয়া দুর্গে প্রবেশ করিলেন। বাদশাহের সভাগৃহে রৌপ্যনির্ম্মিত চন্দ্রাতপ ছিল, সদাশিব তাহা ভঙ্গ করিয়া তদ্দ্বারা ১৭ লক্ষ মুদ্রা প্রস্তুত করাইলেন। বাদশাহের আর যাহা কিছু সম্পত্তি পাইলেন, তৎসমস্তই অধিকার করিয়া লইলেন। এক্ষণে তাঁহার মনোভাব বুঝিতে আর কাহারও বাকি রহিল না। সদাশিব বিশ্বাস রাওকে ভারত সাম্রাজ্যের অভিষিক্ত করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। তিনি মনে করিলেন; যুদ্ধ ঘটিবার পূর্ব্বেই বিশ্বাস রাওয়ের অভিষেক সম্পন্ন করিলে হিন্দুস্থানের সর্দ্দারগণ ও মহারাষ্ট্রীয় সৈন্য দ্বিগুণতর উৎসাহিত হইবে। বিশেষতঃ, যে সকল প্রধান ব্যক্তি অভিষেককালে শপথ গ্রহণ করিবে, তাহারা ন্যায়তঃ ও ধর্ম্মতঃ শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে গমন করিতে বাধ্য হইবে। শত্রুরাও এ কার্য্য-দ্বারা সহসা ইতিকর্ত্তব্য স্থির করিতে পারিবে না এবং সন্ধি করিবার আবশ্যক হইলে শত্রু-পক্ষের উপর অনেক দাবি চলিবে। আপাততঃ মহারাষ্ট্রীয়দের হিন্দুস্থানের উপর যে দাওয়া, আমেদশাহেরও তাহাই; কিন্তু দিল্লীর সিংহাসনে বিশ্বাস রাও উপবেশন করিলে মারহাট্টা আধিপত্য ভারতে বদ্ধমূল হইবে। এইরূপ ভাবিয়া সদাশিব উপস্থিত অভিষেক-সম্বন্ধে স্বপক্ষীয়গণের মত জিজ্ঞাসু হইলেন; কিন্তু স্বার্থপর সর্দ্দারগণের ইচ্ছা ছিল না যে, দুর্ব্বল মোগল সম্রাটের আসনে প্রবল মহারাষ্ট্রীয় সম্রাট উপবেশন করেন; কেন না তাহা হইলে তাহাদের স্বেচ্ছাচারিতার ব্যাঘাত ঘটে, বর্ত্তমানে তাহারা যেরূপ কার্য্যতঃ স্বাধীন আছে, সদাশিবের নিকট তাহাদের সে প্রভুত্ব থাকিবে না। এইরূপ চিন্তা করিয়া তাহারা সদাশিবকে বুঝাইল যে, দুরাণীশাহকে ভারত হইতে বিদূরিত করিয়া এই কার্য্য সমাহিত করা কর্ত্তব্য। অন্যথায়, তাবৎ মুসলমানই বিপক্ষপক্ষে যোগ দিতে পারিবে এবং অযোধ্যার নবাবকেও তৎপক্ষ অব-লম্বন করিবার অবসর দেওয়া হইবে। সদাশিব অনেক তর্কবিতর্কের পর ইহাতে সম্মত হইলেন। সর্দ্দারদিগকে আর অধিক অসন্তুষ্ট করিতে তিনি ইচ্ছুক হইলেন না। তিনি ভাবিলেন,—সর্দ্দারগণ হিন্দুসাম্রাজ্য স্থাপনে অনুদ্যোগী নহে, তবে প্রবল শত্রু উপস্থিত থাকিতে সাহস করিয়া এ কার্য্যে সম্মত হইতে পারিল না। সদাশিব মনে মনে তাহাদের এই ভীরুতার নিন্দা করিলেন বটে, কিন্তু ঘটনাচক্রে পড়িয়া নিজেও তাহাতে মত দিতে বাধ্য হইলেন। এইবার স্বপক্ষীয়-গণের মতে মত দিয়া সদাশিব অতিশয় ভ্রমে পতিত হইলেন। তিনি বুঝিয়াও বুঝিলেন না যে, তাঁহার এই গূঢ় উদ্দেশ্যের বিষয় কোনও গতিকে শত্রুগণের কর্ণগোচর হইলে তাহাদের মনে কি ভাব দাঁড়াইবে। কার্য্যতঃ তাহাই ঘটিল। অসন্তুষ্ট সর্দ্দারগণ অযোধ্যার নবাবের নিকট এই সংবাদ পাঠাইল। সুজাউদ্দৌলা এত দিন কোন পক্ষ অবলম্বন করিতে ইচ্ছুক হন নাই। পিতৃ-শত্রু আমেদশাহের পক্ষগ্রহণে তাঁহার ইচ্ছাও ছিল না; কিন্তু যুদ্ধের অবসানে বিশ্বাস রাও ভার-তের সম্রাট হইবেন শুনিয়া, তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না। রোহিলা-সর্দ্দার নজিবউদ্দৌলার যুক্তিতে এবং আমেদশাহের আশ্বাসবাক্যে মুগ্ধ হইয়া তিনি দুরাণীপক্ষ অবলম্বন করাই কর্ত্তব্য মনে করিলেন এবং সসৈন্যে শাহের সহিত মিলিত হইলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, উপস্থিত যুদ্ধে মহারাষ্ট্রীয়েরা পরাজিত হইলে, পুনরায় ভারতবর্ষের সাম্রাজ্য হিন্দু স্থাপন তাহাদের পক্ষে অনায়াস-সাধ্য হইবে না। তিনি আরও বুঝিয়াছিলেন যে, সদাশিবের অধীনস্থগণের মধ্যে অনেকে তাঁহার উপর বিরক্ত; সুতরাং অনৈক্য ঘটাইয়া সহজেই তাহাদের কার্য্যে ব্যাঘাত ঘটাইতে পারি-বেন; কিন্তু মহারাষ্ট্রীয়দিগকে একেবারে অসন্তুষ্ট করিতে তিনি সাহসী হন নাই, মৌখিক

বন্ধুত্ব বজায় রাখিয়া চলিলেন। যাহা হউক, সদাশিব দিল্লী দখল করিয়াই শুভদিনে যদি বিশ্বাস রাওকে ভারতবর্ষের সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিতেন, তাহা হইলে বিপক্ষেরা অন্ততঃ ইহা ভাবিত যে, সহজে মহারাষ্ট্রীয়েরা হিন্দুস্থান ছাড়িবে না, ঘটনাক্রমে একটী যুদ্ধে পরাজিত হইলেও সামর্থ্য থাকিতে তাহারা মুসলমানদিগকে নিরুপদ্রবে ভারত সাম্রাজ্য ভোগ করিতে দিবে না এবং তাহাদের সহিত যুদ্ধও শীঘ্র শেষ হইবে না; সুতরাং, সদাশিবের একটীমাত্র ভ্রমের জন্যই যে এই বিষম অনিষ্ট ঘটিয়াছিল, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছে।

এক্ষণে একবার দুরাণী-শিবিরে দৃষ্টিপাত করা যাউক। আমেদশাহ ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তাঁহার আগমনের পূর্ব্বেই মহারাষ্ট্রীয়েরা পুনার্য্য প্রতিগমন করিয়াছিল, কেবল একমাত্র জয়জী সিন্ধিয়া হিন্দুস্থানের রক্ষক ছিলেন। আমেদ-শাহ সহজেই পঞ্জাব হস্তগত করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার আগমনে রোহিলাগণ তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল। নজীবউদ্দৌলা জয়জী সিন্ধিয়ার সহিত অনেক যুদ্ধ করিয়াছিল; কিন্তু বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারে নাই। অবশেষে আমেদশাহকর্ত্তৃক সহসা আক্রান্ত হইয়া জয়জী নিহত হন। তদনন্তর আমেদশাহ দিল্লী অধিকার করিলেন এবং উপযুক্ত সৈন্য তথায় রাখিয়া, দিল্লীর অনেক দূরে অসুপ-সহর নামক স্থানে ছাউনী স্থাপন করিয়াছিলেন এবং নজীব উদ্দৌলার সাহায্যে ভারতীয় মুসলমানগণকে স্বপক্ষে আনয়নের জন্য চেষ্টা করিতে ছিলেন। বস্তুতঃ যেরূপ চেষ্টা, যত্ন ও উৎসাহের সহিত নজীবউদ্দৌলা মুসলমানগণকে জাতীয় ভাবে উৎসাহিত করিতেছিলেন, যেরূপ অর্থব্যয় করিয়া দুরাণী সৈন্যের অতিরিক্ত খরচ যোগা-ইতেছিলেন, যেরূপ সাহস, সহিষ্ণুতা ও মন্ত্রণা-কৌশল দেখাইয়া মহারাষ্ট্রীয় ক্ষমতানাশের চেষ্টা করিতেছিলেন, তাহাতে আমেদশাহ অপেক্ষাও নজীবের সুখ্যাতি করিতে হয়। নজীব হিন্দুদিগের শত্রু হইলেও প্রসংসার যোগ্য। ইতিহাস নজীবের গুণ-কীর্ত্তন ক'রতে কখনই ভুলিবে না। বাস্তবিক নজীব আমেদশাহের পক্ষ গ্রহণ না করিলে এবং অপরাপর মুসলমানগণ দুরাণী-দিগের সহিত যোগ না দিলে, আমেদসাহ ভারতবর্ষে তিষ্ঠিতে পারিতেন না এবং মহারাষ্ট্রীয়-দিগের যুদ্ধে কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন না। নজীবের চেষ্টায় হিন্দুস্থানের মুসলমানেরা দুরাণী-পক্ষ না হইলে সিন্ধু-পারে ফিরিয়া যাওয়া আমেদশাহের ঘটিত কি না সন্দেহ। স্বয়ং শাহও তাহা বুঝিয়াছিলেন। তজ্জন্যই তিনি দিল্লীতে থাকিয়া সদাশিবকে বাধা দিতে সাহসী হন নাই, অগ্রসর হইয়াও মহারাষ্ট্রীয় সেনার গতিরোধ করিতেও তিনি উদ্যোগী হন নাই। যত দিন ভারতীয় মুসলমানগণ তাঁহার সহিত মিলিত না হইয়াছিল, ততদিন মহারাষ্ট্রীয়দিগের সম্মুখীন হওয়া দুরাণীদিগের পক্ষে নিরাপদ জ্ঞান করেন নাই। অতঃপর, নবাব সুজা তাঁহার পক্ষ গ্রহণ করিলে, তিনি আত্মপক্ষকে বলিষ্ঠ মনে করিলেন এবং সুজার সহিত পরামর্শ করিয়া মহা-রাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যে আত্মবিচ্ছেদ ঘটাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, জাঠ-সর্দ্দার সূর্য্যমল্ল সদাশিবের পক্ষত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইয়া, কেবল অবসর প্রতীক্ষা করিতেছিল। এক্ষণে মলহর রাওয়ের পরামর্শে সুজাউদ্দৌলার নিকট দূত প্রেরণ করিলেন; মলহর রাও নিজেও দূত পাঠাইয়াছিলেন। সদাশিব এ সকল চক্রান্তের কিছুই অবগত হইতে পারেন নাই। সুজার পরামর্শ মতে সূর্য্যমল্ল শিবির পরিবর্ত্তন ব্যপ-দেশে সসৈন্যে স্বদেশাভিমুখে পলায়ন করিল। মলহর তাহার সহায়তা করিলেন। সদা-শিব পূর্ব্বহইতে প্রহরীসৈন্য রাখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সাবধানতার ফল হইল না। সূর্য্যমল্ল অনেক দূর চলিয়া গেলে, তবে রাওয়ের নিকট এই খবর পৌঁছিল। ভাও ইহাতে মনে মনে চিন্তিত হইলেন এবং মলহর রাও প্রভৃতি কোনরূপ চক্রান্ত করিতেছে, তখন বুঝিতে পারিলেন। এই অবধি কোন বিষয় তিনি স্বপক্ষদিগের নিকট ব্যক্ত করিতে ক্ষান্ত

থাকিলেন। যাহা হউক, পাছে সৈন্যগণ নিরুৎসাহ হইয়া পড়ে, এই জন্য তিনি সূর্য্যমল্লের পক্ষত্যাগ প্রাহ্যই করিলেন না; বরং বলিলেন যে, কোন আবশ্যকীয় কার্য্যের ভার দিবার পূর্ব্বেই যে, সে দলত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, সে ভালই হইয়াছে। পাণিপথের যুদ্ধে জয়ী হইলে বোধ হয়, অগ্রে রোহিলাদিগের উপর প্রতিশোধ না লইয়া, সদাশিব সূর্য্যমল্লকেই পদচ্যুত করিতেন। এই ঘটনার সময় হইতেই সদাশিব মনে মনে একটু অশান্তি ভোগ করিতে লাগিলেন। তাঁহার শত্রুগণ উত্তরোত্তর বল-সঞ্চয় করিতে লাগিল ও নিজপক্ষে বলক্ষয় ঘটিল। কোথায় বর্ষাগমে শত্রুগণ ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইবে, না তাহারা আরও প্রবল হইতে লাগিল। এই সকল কারণে সদাশিব আপাততঃ সন্ধি-স্থাপনে যত্নশীল হইলেন। সন্ধি হইলে দুরাণীরা স্বদেশে প্রতিবৃত্ত হইবে ও উত্তর ভারতে মহারাষ্ট্রীয় প্রভুতা দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে। অযোধ্যা বা রোহিলখণ্ড স্বাধীন বলিয়া স্বীকার করিলেও ক্রমে সেগুলি গ্রাস করিবারও সুযোগ উপস্থিত হইবে এবং তখন আমেদশাহ তাহাদের সাহায্যার্থ আসিলেও তাঁহাকে পরাজয় করা কিছুমাত্র কষ্টকর হইবে না। আপাততঃ, সন্ধি করিলে অনেক সুযোগ বিনা যুদ্ধেই পাওয়া যাইতে পারে, ইহা বুঝিয়া সদাশিব নবাব সুজার মধ্যবর্ত্তিতায় সন্ধির প্রস্তাব করিলেন এবং পাছে শত্রুগণ জানিতে পারে যে, সদাশিব আগ্রহের সহিত সন্ধি করিতে অগ্রসর হইতেছেন, এই জন্য সেই পত্রে নবাব সুজাকে লিখিলেন যে, সুজার পিতা সরদরজঙ্গের সময়হইতেই মহারাষ্ট্রীয়েরা তাঁহাদিগকে সাহায্য করিয়া আসিতেছে, এজন্য উপস্থিত যুদ্ধে মহারাষ্ট্রীয়দের সহিত যোগ দেওয়াই সুজার উচিত বা আপাততঃ দুরাণী পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া নিরপেক্ষ থাকাও কর্ত্তব্য আর মারহাট্ট-শিবিরে একজন দূত পাঠান বিধেয়। ভবানীশঙ্কর পণ্ডিত নামক একজন বিচক্ষণ মারহাট্টা ব্রাহ্মণ এই পত্র লইয়া সুজার নিকট উপস্থিত হইলেন।

নবাব সুজা সদাশিবের পত্র প্রাপ্তিমাত্র মারহাট্ট-শিবিরে তাঁহার বিশ্বস্ত অনুচর রাজা দেবীদত্তকে পাঠাইলেন এবং আমেদ শাহকে সন্ধির কথা বলিলেন। আমেদ শাহ বা তাঁহার উজীর শাহবুন্নিখাঁর সন্ধি স্থাপনে অমত ছিল না এবং নবাব সুজার মধ্যবর্ত্তিতায় যাহাতে সন্ধি স্থাপিত হয়, উজীর তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু নজিব-উদ্দৌলা সন্ধির বিরুদ্ধে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নজিব বুঝিয়াছিলেন যে, সন্ধি স্থাপিত হইলে, মহারাষ্ট্রীয়দেরই লাভ হইবে। আমেদ শাহের পঞ্চনদদেশ প্রভৃতি লাভ হইতে পারে, কিন্তু মহারাষ্ট্রীয়েরা শীঘ্রই সমস্ত হিন্দুস্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইবে। তাহা হইলে অযোধ্যা ও রোহিলখণ্ডের পরিণামে শোচনীয় দুর্দ্দশা হইবে। এই জন্য যাহাতে সন্ধি স্থাপিত না হয়, নজীব প্রাণপণে তাহা করিতে লাগিলেন। তাঁহারই উত্তেজনায় আমেদ শাহ অসঙ্গত দাবী করিয়া বসিলেন এবং সদাশিবও বিরক্ত হইলেন। পঞ্জাব ছাড়িয়া দিতে সদাশিবের অনিচ্ছা ছিল না, এমন কি সরহিন্দ পর্য্যন্ত ছাড়িতেও তিনি রাজি হইতে পারিতেন, যদি নিশ্চয় বুঝিতেন যে, সুদৃঢ় সন্ধি সম্বদ্ধ হইল। আমেদ শাহের সহিত মহারাষ্ট্রীয়দিগের একমাত্র পঞ্জাব লইয়াই বিবাদ, তাহা ছাড়িয়া দিলে বিবা-দের কারণ থাকিবার সম্ভাবনা নাই; না হয়, ক্ষতিপূরণস্বরূপ অন্য কোনও সামান্য জনপদ অর্পিত হইতে পারে; কিন্তু হিন্দুস্থানের আধিপত্য লইয়া আমেদ শাহের কথা কিছুই চলিতে পারে না, যেহেতু পূর্ব্বেই মহারাষ্ট্রীয়েরা সেখানে কার্য্যতঃ প্রভুত্ব করিয়া আসিতেছে; সুতরাং সে সম্বন্ধে তাঁহার কোন দাওয়া চলিতে পারে না। এই বিবেচনায় সদাশিব সন্ধি করিতে স্বীকৃত হইলেন না; কিন্তু এইখানে সদাশিবের প্রধান ভ্রম হইল। উত্তর ভারতের কিয়দংশ ছাড়িয়া দিয়াও যদি তিনি শত্রুকে নিরস্ত করিতে পারিতেন এবং একটীমাত্র অদৃষ্ট-পরীক্ষক যুদ্ধের ফলাফলের প্রতি নির্ভর না করিতেন, তাহা হইলে, সম্ভবতঃ হিন্দুস্থান হইতে মহারাষ্ট্রীয় প্রভুতা বিলুপ্ত হইত না।

নবাব সুজা সদাশিবকে উপদেশ দিয়াছিলেন যে, তিনি সম্মুখ সংগ্রামে প্রবৃত্ত না হইয়া যেন অনিয়মিক যুদ্ধকার্য্যে লিপ্ত হন। ইহাতে সদাশিব মনে করিয়াছিলেন, দুরাণী শাহের পরামর্শমতই সুজা এরূপ বলিতে সাহস করিয়াছেন; সুতরাং ভাল বুঝিতে পারিলেন যে, দুরাণীরা শিক্ষিত সৈন্যের সম্মুখীন হইতে ভীত হইয়াছে। সন্ধিভঙ্গের ইহাও একটী কারণ বলা যাইতে পারে।

পরে সন্ধির আশা ছাড়িয়া দিয়া আমেদ শাহকে আক্রমণ করিতে সদাশিব উদ্যোগী হইলেন। বর্ষাকালও প্রায় শেষ হইয়া আসিল। দুরাণী-সৈন্য যমুনার পরপারে সাদতেরা নামক স্থানে অবস্থিতি করিতেছিল। দিল্লীর কয়েক ক্রোশ দূরে কুঞ্জপুর নামক স্থানে দশহাজার দুরাণী-সৈন্য এবং অন্যান্য সেনা ছাউনি করিয়াছিল এবং মহারাষ্ট্রীয়দিগের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল। ঐ স্থান অধিকার করিতে না পারিলে যমুনা পার হইয়া দুরাণী-সৈন্য আক্রমণ করিবার সুবিধা হইবে না দেখিয়া, সদাশিব স্বয়ং পনর হাজার সৈন্য লইয়া কুঞ্জপুর আক্রমণ করিলেন। সময়মত সংবাদ পাইয়া আমোদ সাহ সাহায্য পাইতে সমর্থ হইলেন না। যমুনা তখন পর্য্যন্তও দুস্তরণীয়; সুতরাং রোহিলারা প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াও আত্মরক্ষা করিতে পারিল না। রোহিলা-সেনাপতি দুলেন খাঁ সসৈন্যে বন্দী হইলেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা ঐ স্থান লুণ্ঠন করিয়া দিল্লীতে প্রত্যাবৃত্ত হইল। (ক্রমশঃ)

শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

অতীতের আমি

বনে বনে করি ছুটাছুটি,
ফুলে ফুলে করি মধুপান
খেলিতাম কত খেলা রে,—
নিঝরে নিঝরে চুমি চুমি,
ইন্দ্রধনু আঁকি হেথা সেথা,
ভ্রমিতাম সারা বেলা রে!
বনপাখী ছুটিতাম বনে,
কুঞ্জে কুঞ্জে গাহি সুখগান,
কত সুখ কারে বলি রে!
কল কল তান তটিনীর,
মধুমাখা স্বর বিহগের,
শ্রবণে ঢালিত মধু রে!
লতায় পাতায় নাচানাচি,
বাতাসে কুসুমে হেলা দোলা,
নয়নে আনিত বঁধুরে,
চপল কুরঙ্গ সম কত—
গিরি-গায়, গিরি শিরে শিরে—
খেলিতাম মনোসুখে রে!

নদী জলে ঢেউয়ে ঢেউয়ে
উঠে নেমে আহা কতবার
ভাসিতাম নদী বুকে রে!
সে দিন আমার গেছে চলে,
আজি পায় সংসার শৃঙ্খল,
কেবা এ বাঁধন দিল রে?
কিবা দোষ করেছিনু কার?
কঠিন নিগড় দিয়ে তাই
সে সুখ হরিয়ে নিল রে!
বড় সুখে ছিনু যাহা নিয়ে,
সকলি তেমনি আজো আছে,
শুধু আমি তাই নাহি রে!
আমায় লইয়ে আজি যেই,
খেলা করে পুতুলের মত,
যদি দেখা তার পাই রে—
বারেক শুধাই তারে তবে, "
কেন সে এমন ক'রে ঘোরে
ঘুরাইছে ভব ঘোরে রে?

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র ঘোষ

কাশিকা-বৃত্তি

সংস্কৃতে পাণিনীর ব্যাকরণ অতি দুর্ব্বোধ্য গ্রন্থ। ইহার রীতিমত ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'কাশিকা-বৃত্তি'। কাশিকা-বৃত্তি ব্যতীত পাণিনীর ব্যাকরণ অধ্যয়ন করা একান্ত অসম্ভব; সুতরাং সকল ব্যাকরণ-পাঠীকেই প্রায় কাশিকা বৃত্তি দেখিতে হয়; কিন্তু এই মহদুপকারক বৃত্তিখানি কাহার রচিত, তাহা অনেক অধ্যাপক ও অনেক ছাত্র জানেন না। যাঁহারা বা জানেন, তাঁহাদেরও মধ্যে মতভেদ লক্ষিত হয়। এসম্বন্ধে আমরা যতদূর অনুসন্ধান করিতে পারিয়াছি তাহা যথাযথ উল্লেখ করিতেছি।

কাহারও মতে জয়াদিত্য ১ম চারি অধ্যায় ও বামন শেষ চারি অধ্যায় রচনা করেন। আবার কোন কোন প্রাচীন হস্তলিপিতে ১ম চারি অধ্যায়ের পুষ্পিকায় 'বামন-কাশিকা' লিখিত হইয়াছে। কোন কোন হস্তলিপির সমাপ্তি পুষ্পিকায় দেখা যায়—"পরমোপাধ্যায়বামনকৃতায়াং কাশিকায়াং বৃত্তৌ" ইত্যাদি।

ভট্টোজিদীক্ষিত, রায়মুকুট, মাধবাচার্য্য প্রভৃতি বৈয়াকরণেরা কাশিকা হইতে বিস্তর প্রমাণ তুলিয়াছেন, তাহাতেও গোলযোগ। অমরকোষে 'শর্করা' শব্দ সাধিবার কালে রায়মুকুট জয়াদিত্যের নামে (পা ৫। ২। ১০৫ সূত্রের) কাশিকা-বৃত্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন। আবার 'পাণ্ডুর' শব্দ সাধিবার কালে 'নগাচ্চ' এই বার্ত্তিকসূত্রে (৫। ২। ১০৭) ভাষাবৃত্তিকারের প্রতিবাদ হইতে জয়াদিত্যের পক্ষসমর্থন করিয়াছেন।

ভট্টোজদীক্ষিত পা ৫। ৪। ৪৩ সূত্রের বৃত্তিকালে জয়াদিত্যের মত এবং ৭। ১। ২০ সূত্রের বৃত্তিতে বামনের মত গ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপ রায়মুকুট 'অপ্সরস্' শব্দ সাধিবার কালে ৮। ৪। ৪৮ সূত্রের বামন-কাশিকা উদ্ধৃত করিয়াছেন। মাধবাচার্য্য ধাতুবৃত্তিতে জয়াদিত্য ও বামনের মত গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার উদ্ধৃত জয়াদিত্যের মত পা৩। ২। ৫৯ সূত্রের কাশিকায় এবং বামনের মত ৮। ২। ৩০ সূত্রের কাশিকায় দৃষ্ট হয়।

এখন দেখা যাইতেছে, ভট্টোজিদীক্ষিত, রায়মুকুট ও মাধবাচার্য্যের মতে ৩ হইতে ৫ম অধ্যায় জয়াদিত্য এবং ৭ম ও ৮ম অধ্যায় বামনকর্ত্তৃক বিরচিত।

রাজতরঙ্গিণীতে জয়াদিত্য কাশ্মীরের একজন বিদ্যোৎসাহী রাজা এবং বামন তাঁহারই মন্ত্রী বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন। যথা—

"দেশান্তরাদাগময্য ব্যাচক্ষাণঃ ক্ষমাপতিঃ।
প্রবর্ত্তয়ত বিচ্ছিন্নং মহাভাষ্যং স্বমণ্ডলে ॥ ৪৪৮ ॥
ক্ষীরাভিধাচ্ছব্দবিদ্যোপাধ্যায়াৎ সংভৃতশ্রুতঃ।
বুধৈঃ সহ যযৌ বৃদ্ধিং স জয়াপীড়পণ্ডিতঃ ॥ ৪৪৯ ॥
বিদ্বত্তয়াথক্রিয়াখ্যাস্তেন স্বীকৃত্য বর্দ্ধিতঃ।
ভট্টোঽভূদুদ্ভটস্তস্য ভূমিভর্ত্তুঃ সভাপতিঃ ॥ ৪৯৩ ॥
স দামোদরগুপ্তাখ্যং কুট্টনীমতকারিণম্ ॥ ৪৯৫ ॥
মনোরথঃ শঙ্খদত্তশ্চটক সন্ধিমাংস্তথা।
বভূবুঃ কবয়স্তস্য বামনাদ্যাশ্চ মন্ত্রিণঃ ॥ ৪৯৬ ॥"

(৪র্থ তরঙ্গ।)

রাজা জয়াদিত্য নানা দেশহইতে পণ্ডিতগণকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদিগকে মহাভাষ্য-সংগ্রহে নিযুক্ত করেন। তিনি শব্দশাস্ত্রবিদ্ ক্ষীরস্বামীর নিকট * ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। থক্রিয় প্রধান পণ্ডিত ও উদ্ভটভট্ট তাঁহার সভাপণ্ডিত ছিলেন। তিনি 'কুট্টনীমত' প্রণেতা দামোদরগুপ্ত কবিকে প্রধান মন্ত্রিত্ব প্রদান করেন। মনোরথ, শঙ্খদত্ত, চটক, সন্ধিমান্ প্রভৃতি কবিগণ তাঁহার সভা উজ্জ্বল করিতেন। বামন প্রভৃতি পণ্ডিতগণ তাঁহার অমাত্য ছিলেন।

কায়স্থরাজ জয়াপীড় ৬৬৭ শকে সিংহাসনারোহণ করেন।

[বিশ্বকোষে 'কাশ্মীর' শব্দ ও 'কায়স্থ' শব্দে ৫৮৪ পৃঃ দেখ।]

অধ্যাপক মোক্ষমূলর মতে "কাশিকাকার জয়াদিত্য একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি, তিনি কাশ্মীররাজ জয়াদিত্যের পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন। চীনপরিব্রাজক ইৎসিং ৬৯০ খৃষ্টাব্দে (৬১২ শকে) চীন-ভাষায় 'দক্ষিণ সমুদ্রযাত্রা' পুস্তকে জয়াদিত্য বিরচিত 'বৃত্তিসূত্রে'র উল্লেখ করিয়াছেন। ইৎসিং এর বিবরণ যদি প্রকৃত হয়, তাহা হইলে ৬৬০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে পাণিনি বৃত্তিকার জয়াদিত্যের মৃত্যু হয় †।"

এখানে চীনপরিব্রাজকের বিবরণ কতদূর সম্ভব ও তাঁহার প্রকৃত আবির্ভাবকাল কতদূর ঠিক, তাহা নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করা যায় না। এরূপ স্থলে, রাজতরঙ্গিণীর বর্ণিত ঘটনার উপর নির্ভর করিলে নিতান্ত অন্যায় বলিয়া বোধ হয় না। তবে কথা হইতেছে, যদি কাশ্মীররাজ জয়াপীড় কাশিকাবৃত্তি রচনা করিয়া থাকিবেন, তবে কহ্লণ পণ্ডিত তাহার কোন উল্লেখ করেন নাই কেন? সম্ভবতঃ রাজ্যাভিষিক্ত হইবার পূর্ব্বে যৌবনকালে জয়াদিত্যকর্ত্তৃক কাশিকাবৃত্তি রচিত হইয়া থাকিবে; কারণ, রাজা হইবার পূর্ব্বে জয়াদিত্য-সম্বন্ধে কোন কথা কহ্লণ লিখিয়া যান নাই। জয়াদিত্য নিজে একজন বৈয়াকরণ ও মহাপণ্ডিত ছিলেন, তাঁহারই সময়ে মহাভাষ্যের পুনরুদ্ধার সাধিত হয়। বামন তাহার একজন সচিব। এই সময় ললিতাদিত্যের অমাত্য লক্ষ্মণের পুত্র হেলরাজ বাক্যপদীয়বৃত্তি রচনা করেন। বাস্তবিক জয়াদিত্যের রাজত্বের সময়ে পাণিনি-ব্যাকরণ বিশেষ আদৃত হইয়াছিল; তাহা তৎসাময়িক কাশ্মীর ইতিহাস-পাঠে জানা যায়।

জয়াদিত্য কাশিকা-বৃত্তির ১ম পাঁচ অধ্যায় লিখিয়াছিলেন, তৎপরে তাঁহার মন্ত্রী বামন অবশিষ্ট ৩ অধ্যায় লিখিয়া সম্পূর্ণ করেন।

কাশিকাবৃত্তিপ্রকাশক পণ্ডিত বালশাস্ত্রী লিখিয়াছেন যে, 'কাশিকারচয়িতা জৈন বা বৌদ্ধ ছিলেন। এই জন্য অমরকোষের ন্যায় কাশিকার প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণ লিখিত হয় নাই। কাশিকাকার অনেকস্থলে পাণিনিসূত্রের পরিবর্ত্তন করিয়াছেন; ব্রাহ্মণ হইলে এরূপ করিতে সাহসী হইতেন না। পা ১।৩ ৩৬ সূত্রে নীঙ্ ধাতুর আত্মনেপদে সম্মান অর্থে কাশিকাকার 'চার্ব্বে-নয়মানে' অর্থাৎ 'লোকায়ত কর্ত্তৃক সম্মানিতে' এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। এখানে (বালশাস্ত্রীর মতে) চার্ব্ব (চার্ব্বাক ?) লোকায়ত কর্ত্তৃক সম্মানিত বুদ্ধ। ধর্ম্মানুরাগী স্বধর্ম্ম প্রতিপাদ্য গ্রন্থ হইতেই প্রমাণ উদ্ধৃত করেন, কখনও চার্ব্বাকমত গ্রহণ করেন না।'

কাশিকাপ্রকাশকের মত যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হইল না। কাশিকাকার অনেক স্থলে ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্র হইতে প্রমাণসংগ্রহ করিয়াছেন,—কেবল একস্থলে 'চার্ব্ব' ও 'লোকায়ত শব্দের উল্লেখ দেখিয়া বৃত্তিকারকে জৈন বা বৌদ্ধ বলা যায় না। জয়াদিত্য এক জন পরম হিন্দু

* ক্ষীরস্বামী অমরকোষের একজন প্রসিদ্ধ টীকাকার।

† Max Muller's India, what can it teach us? p. 342–346.

ছিলেন। রাজতরঙ্গিণীতে লিখিত আছে, তিনি বিপুলকেশব নামে এক বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন (১)। বিভিন্ন সময়ে রচিত কাশিকাবৃত্তির কয়েকখানি টীকা পাওয়া যায়; তন্মধ্যে এই কয়খানি প্রসিদ্ধ,—উপমন্যু বিরচিত 'তত্ত্ববিমর্শিনী,' জিনেন্দ্রবুদ্ধি বিরচিত 'কাশিকাবৃত্তি বিবরণ পঞ্জিকা', মৈত্রেয়রক্ষিতকৃত 'তন্ত্রপ্রদীপ', হরদত্তরচিত 'পদমঞ্জরী' ইত্যাদি।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু

৺কাশীপ্রসাদ ঘোষ

ইনি কলিকাতার এক বিখ্যাত জমীদার বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম শিবপ্রসাদ ঘোষ। ইঁহাদের আদি-নিবাস হুগলীজেলার অন্তর্গত হাবড়ার নিকটবর্ত্তী পৈতাল গ্রাম। ইহার পিতামহ তুলসীরাম ঘোষ ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে খাজাঞ্চী ছিলেন, এই কর্ম্মে থাকিয়াই তুলসীরাম প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করেন।

তুলসীরাম শেষ দশায় ঢাকার কর্ম্মহইতে অবসর লইয়া কলিকাতায় শ্যামবাজারে বৃহৎ বাটি নির্ম্মাণ করাইয়া, সপরিবারে তথায় আসিয়া বাস করেন। তুলসীরামের দুই পুত্র ছিল,—শিবপ্রসাদ ও ভবানীপ্রসাদ। জ্যেষ্ঠ শিবপ্রসাদের দুই পত্নী, জ্যেষ্ঠা স্ত্রীর গর্ভেই বঙ্গের মুখোজ্জ্বলকারী অসাধারণ গুণবিশিষ্ট সন্তান কাশিপ্রসাদ জন্মগ্রহণ করেন।

১২১৬ সালে ২২এ শ্রাবণ শনিবার ইংরাজী ৫ই আগষ্ট ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে খিদিরপুরে ৺ রামনারায়ণ বসু-সর্ব্বাধিকারীর বাটীতে কাশিপ্রসাদের জন্ম হয়। রামনারায়ণ সর্ব্বাধিকারী কাশীপ্রসাদের মাতামহ ছিলেন। কাশীপ্রসাদ (অকালে) সপ্তম মাসে ভূমিষ্ঠ হন। বাল্যকালে তিনি প্রায়ই মাতুলালয়ে থাকিতেন, কাজেই অতিশয় আদুরে হইয়া পড়েন। ১২ বৎসর বয়সে তাঁহার অক্ষর-পরিচয়পর্য্যন্ত লেখাপড়া হইয়াছিল মাত্র। এই ১২ বৎসর বয়সে তিনি এক দিন লেখাপড়ার জন্য পিতার নিকট তিরস্কৃত হন। এই তিরস্কারে তাঁহার মনে বড় ধিক্কার জন্মে। তিনি ভাবিলেন যে, যদি লেখা-পড়াই শিখিতে হয়, তাহা হইলে বাড়ীতে থাকিয়া আমার লেখা-পড়া হইবে না; কারণ বাড়ীতে নানাবিষয়ে মন বড় অন্যমনস্ক হইয়া পড়ে। এই ভাবিয়া তিনি তাঁহার মাতামহকে এ বিষয় জানাইলেন। রামনারায়ণ সর্ব্বাধিকারী জামাতাকে অনুরোধ করিয়া কাশিপ্রসাদের জন্য তখনকার হিন্দুকালেজে একবারে ৩০০ শত টাকা জমা দেওয়াইলেন। এই জমা দেওয়াতে কাশিপ্রসাদ অবৈতনিক ছাত্ররূপে ১৮২১ খৃষ্টাব্দের ৮ই অক্টোবর কালেজের ৭ম শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইলেন। ৩ বৎসরের মধ্যে কাশিপ্রসাদ ঈশ্বরের কৃপায় অসাধারণ মেধা ও শক্তিবলে সর্ব্বোচ্চ প্রথম শ্রেণীতে উঠিলেন। এই শ্রেণীতে তিনি আর ৩ বৎসর থাকিয়া অপরিসীম যত্ন ও অধ্যবসায়গুণে লেখাপড়া শিক্ষা করেন। তিনি প্রথম শ্রেণীতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বালক বলিয়া গণ্য হন ও প্রতিবৎসর বার্ষিক পরীক্ষায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

(১) "হতে জজ্জে জয়াপীড়ঃ প্রত্যাবৃত্ত্য নিজাং শ্রিয়ম্।
জগ্রাহ দোষ্ণা ভুভারং কৃত্যেন চ সতাং মনঃ॥
রাজা মহ্লাণপুরকৃচ্চক্রে বিপুলকেশবম্।"
রাজতরঙ্গিণী ৪। ৪৮২, ৪৮৪।

পুরস্কার পাইতেন। ১৮২৭ সালের শেষভাগে অধ্যাপক্ এচ্ এচ্ উইলসন্ (ইনি তখন উক্ত কালেজের পরিদর্শক ছিলেন) আসিয়া, প্রথমশ্রেণীর বালকদিগকে ইংরাজীতে পদ্য লিখিবার জন্য চেষ্টা করিতে বলেন। প্রথমশ্রেণীর বালকগণের মধ্যে একমাত্র কাশিপ্রসাদই ইংরাজীতে পদ্যরচনায় কৃতকার্য্য হন। ইঁহার প্রথম ইংরাজী পদ্য "The young poet's first attempt" * ১৭২৭ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে লিখিত হয়। তাঁহার পাঠশালায় লিখিত পদ্যের মধ্যে "Hope" নামক পদ্যটি কেবল মুদ্রিত দেখিতে পাওয়া যায়। যে সময় অধ্যাপক উইলসন প্রথমশ্রেণীর ছাত্রগণকে ইংরাজী পদ্য লিখিতে প্রবর্ত্তিত করেন, সেই সময়ে বার্ষিক পরীক্ষার কাল নিকটবর্ত্তী হওয়ায় রচনার পরীক্ষাস্বরূপ কোন একখানি ইংরাজী পুস্তকের সমালোচনা লিখিতে আদেশ দেওয়া হয়। কাশিপ্রসাদের তখন পূর্ণ সপ্তদশ বৎসর বয়স; তিনি মিলের লিখিত "History of British India"র (ভারত-ইতিহাসের) প্রথম চারি পরিচ্ছেদের সমালোচনা করিয়া ইংরাজীতে একটী প্রবন্ধ লিখেন। এই প্রবন্ধটী এত যুক্তিপূর্ণ ও উৎকৃষ্ট হইয়াছিল যে, ইহার একাংশ ১৮২৮ খৃষ্টাব্দের ১৪ ফেব্রুয়ারি তারিখে গবর্ণমেণ্ট গেজেটে ও তৎপরে এসিয়াটিক জর্ণালে পুনঃ প্রকাশিত হয়। ১৮২৮ সালের ১২ই জানুয়ারি তারিখে কাশিপ্রসাদ কালেজ হইতে প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হন।

তিনি ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে কালেজ ছাড়িয়া তখনকার সাময়িকপত্রে ইংরাজীতে পদ্যাদি লিখিতেন। এই সকল পদ্যে তিনি যত সহজ কথায়, অল্পের মধ্যে এদেশীয় ভাবগুলি ইংরাজীতে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা দেখিলে তাঁহার কবিত্বশক্তি ও বৈদেশিক ভাষায় ব্যুৎপত্তির প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। তাঁহার সমসাময়িক লোকেরাও (রাজা রাধাকান্ত দেব, ডেভিড্ হেয়ার, অধ্যাপক উইলসন প্রভৃতি) এই সকল কবিতা দেখিয়া বিমুগ্ধ হইতেন। খণ্ড কবিতাদি প্রকাশ করিয়া আশাতীত সুখ্যাতি লাভ করিয়া কাশিপ্রসাদ ৩ অধ্যায়ে "The Shair" নামে ইংরাজীপদ্যে একখানি ক্ষুদ্র কাব্য লিখেন। ইহার মধ্যে কয়েকটি সুন্দর ইংরাজী তালমান-সঙ্গত সঙ্গীতও আছে। 'সায়ের' পারসী শব্দ, ইহার অর্থ সন্ন্যাসী-গায়ক। এই ক্ষুদ্র কাব্যখানি তখনকার গবর্ণর জেনেরল লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিককে উপহার প্রদত্ত হয়। প্রথমে এই কাব্যখানির নাম হইয়াছিল 'The Minstrel', কিন্তু অনেকে ইহাকে ইংরাজীর অনুকরণ বোধে আদর করিবে না ভাবিয়া, কবি নাম পরিবর্ত্তিত করিয়া দেন।

১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই তাঁহার অধিকাংশ পদ্য রচিত হয়।

'সায়ের' কাব্যের আরম্ভে কালিপ্রসাদ যেরূপ বীণাস্তুতি ও বিনয় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা অতি সুন্দর। নিম্নে 'সায়ের' কাব্যের মঙ্গলাচরণ উদ্ধৃত হইল †;—

"Harp of my Country! Pride of my yore!
Whose sweetest notes are heard no more!
O! give me once to touch thy strings,
Where tuneful sweetness ever clings.

* কাশিপ্রসাদের যে সকল ইংরাজী পদ্য ছাপা দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে ইহা নাই; কারণ, কাশিপ্রসাদ নিজে ইহা মুদ্রিত করিয়া যান নাই। তাঁহার নিজের লিখিত তাঁহারই একখানি জীবনী আছে, তাহাতে এই পদ্যটি দৃষ্ট হয়।

† এই গ্রন্থ এখন সাধারণের অপ্রাপ্য।

Though hands that far superior were,
Once wake the sleeping sweetness there;
Yet if my scanty can make.
One note, however faint, awake,
My weak endeavour will not be
In vain—'tis all I wish from thee.
Unskilled, I strive to oar on wings
Of various wild imaginings,
Although my weary nerve I strain,
Yet find my labour end in vain;
My feeble limbs can scarcely keep
My flight unskilled through airy deep,
Prone to the earth I fall and vain,
I try to rise on high again.
Still, as by every effort new
The bird doth vigour fresh attain
Its course Aeriel to pursue;—
I strive to fly that I may gain
Perchance, by each attempt new strength
And safely soar on high at length."

"সায়ের" কাব্যের মধ্যাংশ;—ইহা হেনরি মেরিডিথ পার্কারকে উপহার দেওয়া হয়। ইহাতে সন্ধ্যাবর্ণনাটী অতি সুন্দর;—

"Tis evening—to the western heaven,
His golden car, the sun has driven;
And to the Ganges' water bright,
Weary directs his homeward flight.
Hail, brightest ornament of day!
Resplendent gem of ruby ray!
How rich with many a glittering hue
Of gold and purple, red and blue,
Yon flaming orb of heaven doth shine,
Made by thy parting ray divine!
How bright beneath thy various beam,
Wanders the sacred Ganges' stream!
But lo! beneath the waters now,
To rest from labour sinkest thou.
Bereft of them, so famed in lays,
The lotus of the ancient days.
Upon the holy wave behold,

Begin its petals now to fold.
The pale hue of dejectedness,
Its dropping head doth now express ;
And darkness growing in the rear,
Bereft of the doth eve appear ;
As if, in widowhood's despair,
A maiden rushed with loosened hair."

উপরের এই উদ্ধৃত অংশদ্বয় হইতেই কবি কাশিপ্রসাদের কবিত্ব, ভাবুকতা ও বিদেশীয় ভাষায় অসাধারণ ব্যুৎপত্তি অতি সহজেই বুঝা যায়।

কাশিপ্রসাদ "The Hindu Festivals" নামে আর একখানি কাব্য রচনা করেন; তাহাতে ইংরাজীপদ্যে দশহরা, ঝুলনযাত্রা, জন্মাষ্টমী, দুর্গাপূজা, কোজাগর-পূর্ণিমা, শ্যামা-পূজা, কার্ত্তিকপূজা, রাসযাত্রা, শ্রীপঞ্চমী, দোলযাত্রা, চড়ক ও অক্ষয়তৃতীয়ার ইতিহাস এবং উৎসব বর্ণিত হইয়াছে। এই পদ্যগুলিতে যেমন সংক্ষেপে বিষয়গুলির প্রকৃতি বর্ণিত হইয়াছে, তেমনি তাঁহার রচনাও স্বভাবসুলভ প্রাঞ্জলতা ও প্রসাদগুণবিশিষ্ট হইয়াছে; কতকগুলির স্থানে স্থানে বেশ পরিস্ফুট পরিহাস-রসও (Humour) আছে। এই কোষকাব্যখানির রচনাসম্বন্ধে কবি লিখিয়া গিয়াছেন যে, এক সময় তাঁহার কোনও একজন পরম মিত্র তাঁহার পদ্যগুলি ছাপাইবার জন্য অনুরোধ করেন। তাঁহারই সহিত কথায় কথায় এই বিষয়ের কথা উঠে; তিনি বলিলেন যে, কতকগুলি দেশীয় বিষয়, দেশীয় ভাব বজায় রাখিয়া ইংরাজীপদ্যে লেখা আবশ্যক। সে সময় অন্য কোন গুরুতর বিষয় লিখিবার উপযুক্ত না থাকায় কাশিপ্রসাদ এক একটি হিন্দুউৎসব লইয়া ৬। ৭। ৮। ৯। ১০টি কবিতায় (Stanza) এক একটি পদ্য রচনা করেন। ইহার প্রত্যেকটি স্বতন্ত্রভাবে "Calcutta Literary Gazette"এ প্রকাশিত হয়। তৎপরে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে যখন সায়ের ছাপা হয়, তখন তাহার সহিত প্রকাশিত হয়!

ইহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা হইতে নিম্নে দাঁড়ী-মাঝির একটি গান উদ্ধৃত হইল। বাঙ্গালার মাঝিরা নৌকা বাহিবার সময় সকলে মিলিয়া একপ্রকার গান গাহিয়া থাকে, তাহাকে সারিগান বলে। সারিগানে দেবস্তুতি ও গঙ্গাস্তুতি থাকে, অশ্লীল অকথ্য রসিকতাও থাকে। গানটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

"Gold river ! Gold river ! how gallantly now,
Our bark on thy bright breast is lifting her prow.
In pride of her beauty how swiftly she flies ;
Like a white-winged spirit thro' topaz-paved skies.
Gold river ! Gold river ! thy bosom is calm,
And o'er thee the breezes are shedding their balm ;
And nature beholds her fair features pourtrayed.
In the glass of thy bosom serenely displayed.
Gold river ! Gold river ! the sun to thy waves,
Is fleeting to rest in thy cool coral caves ;
And thence, with his tiar of light in the morn,
He will rise, and the skies with his glory adorn.
Gold river ! Gold river ! how bright is the beam,

That lightens and crimsons thy soft-flowing stream ;
Whose waters beneath make a musical clashing,
Whose waves as thy breast in their brightness are flashing.
Gold river ! Gold river ! the moon will soon grace,
The hale of the stars with her light-shading face ;
The wandering planets will over thee throng ;
And scraphs will waken thin music and song.
Gold river ! Gold river ! our brief course is done,
And safe in the city our home we have won.
And as the bright sun now dropped from our view,
So Ganga ! we bid thee a cheerful adieu."

এই গীতটি ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে ১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে লিখিত হয়। কাপ্তেন রিচার্ডসন্ তাঁহার "Selections from the British Poets" নামক কবিতাসংগ্রহে কবি কাশিপ্রসাদের অতুল ক্ষমতার অশেষ সুখ্যাতি করিয়া এই গানটি উদ্ধৃত করিয়াছেন *।

যাঁহার কবিত্ব সম্বন্ধে বিদেশী বিজ্ঞ কাপ্তেন রিচার্ডসন স্বদেশী কবিগণকেও হীনপ্রভ বলিয়া স্থির করিয়াছেন, তিনি যে কত প্রশংসার যোগ্য তাহা কে বলিবে! বাঙ্গালীর মধ্যে এরূপ একজন লোক ছিল, কয়জন বাঙ্গালী তাহা জানেন? কিন্তু গুণগ্রাহী বিদেশী পণ্ডিতেরা খুঁজিয়া খুঁজিয়া বাঙ্গালার এই মুখোজ্জ্বলকারী সন্তানটিকে আদর ও সম্মান করিয়া গিয়াছেন। অর্ম্মণ্ড এলিয়ট নামে একজন ইংরাজ "Views from India and China" নামক গ্রন্থে কলিকাতায় এতলোক থাকিতে কবি কাশিপ্রসাদের কার্ত্তিক নিন্দিত, মদনোপম সুন্দরমূর্ত্তির ছবি প্রকাশ করিয়া তাঁহার অসাধারণগুণের কথা মুক্তকণ্ঠে গাহিয়া গিয়াছেন। 'সায়ের' হইতে পার্কারের উপহারের কবিতার সন্ধ্যাবর্ণনাটুকু স্বীয় পুস্তকে তুলিয়া তাহার সুখ্যাতি যেন দশমুখে করিয়াছেন। †

ইনি যে কেবল ইংরাজী পদ্যই লিখিতেন তাহা নহে, ইংরাজী গদ্য রচনাতেও তাঁহার যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল। তিনি গদ্যে নিম্ন-লিখিত কয়েকখানি পুস্তক লিখেন—এগুলি বড় বৃহদাকারের নয়—

---

* "Let some of those narrow-minded persons, who are in the habit of looking down upon the natives of India with an arrogant and vulgar contempt, read this little poem with attention and ask themselves if they could write better verses *not in a foreign language*, but even in their own."

Editor (Capt. Richardson) Nov. 1st, 1834.

† এলিয়ট সাহেব কবি কাশীপ্রসাদ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"In English, in which he expressed himself with so much strength, grace and facility, as fastly to excite the surprise and admiration of all who judge of the great difficulties to be encountered in composing poetry in a foreign language. His 'Shair' established the reputation of his in India and favourably noted in England. *The Boatman's song to Ganga*' is perhaps the most beautiful of any productions from the same pen."

1. Memoir of Indian Dynasties containing (*a*) *The Scindhiah of Gowalior* (*b*) *King of Luckuow.* (*c*) *The Holkar of Indore.* (*d*) *The Nawab of Hydrabad.* (*e*) *The Gaekwar of Barada.* (*f*) *The Bhonslah of Nagpore.* (*g*) *The Nawab of Bhoopal.*
2. Sketches of Runjeet Singh.
3. ,, of King of Oudh.
4. On Bengalee poetry.
5 On Bengalee works and writers.
6. The Vision—a tale (উপন্যাস)।

এতদ্ভিন্ন "The poems" নামে আর একখানি খণ্ডকাব্য লিখেন, তাহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড-কবিতা প্রকাশিত হয়। "The poems" ছাপা হইবার পর Mookerjee's Magazineএ আরও কতকগুলি প্রবন্ধ গদ্যে পদ্যে লিখিয়াছিলেন, সেগুলি এখনও পুস্তকাকারে সংগৃহীত হয় নাই।

১৮৪৫।৪৬ খৃষ্টাব্দে কবি কাশিপ্রসাদ "The Hindu Intelligencer" নাম দিয়া একখানি বৃহৎ সপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। তিনি নিজেই ইহার সম্পাদক ও সত্বাধিকারী ছিলেন। অতি দক্ষতার সহিত এই পত্রখানি ১২ বৎসর কাল চলিয়াছিল, শেষে সিপাহী বিদ্রোহের সময় সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে আইন পাশ হওয়ায় (১৮৫৮) বন্ধ হইয়াছে। ইহাতে রাজনীতি ও সাহিত্য-লোচনা যথেষ্ট হইত।

ইঁহার "On Bengalee Works and Writers" নামক পুস্তকে প্রাচীন বাঙ্গালা কবিগণের (ভারতচন্দ্র, নিধুবাবু ইত্যাদি) গ্রন্থাদি সমালোচিত হইয়াছে। সমালোচনাকালে বাঙ্গালায় উদ্ধৃত অংশ সকলের যেরূপ ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছেন, তাহা অতি সুন্দর, দেখিলে মন যুগপৎ বিস্মিত ও চমৎকৃত হইয়া পড়ে!

বিদ্যাসুন্দরে আছে;—

"এবার মাসের মধ্যে বিষম ফাল্গুন,
মলয় পবনে জ্বলে মদন আগুন।
কোকিল ঝঙ্কার আর ভ্রমর ঝঙ্কার,
শুষ্ক তরু মুঞ্জরিবে কতেক প্রকার।"—

কবি কাশীপ্রসাদ অনুবাদ করিলেন —

"Sweet is the *Phalguna*, every month above,
When southern breezes fan the fire of love,
When round her cooling notes the cuckoo flings,
When in his humming tone black-bee sings,
And blighted plants of every kind display,
Reviving many a new born leaf spray".

"দেখি নগরের শোভা বাখানে সুন্দর।
সম্মুখে দেখেন সরোবর মনোহর॥
সানবান্ধা চারিঘাট শিবালয় চারি!
অবধূত জটাভস্মধারী সারি সারি॥

চারিপার্শ্বে সুচারু পুষ্পের উপবন।
গন্ধ লয়ে মন্দ বহে মলয়া পবন॥
কুহু কুহু কোকিলা কোকিলগণ ডাকে।
গুণ গুণ গুঞ্জরে ভ্রমর ঝাঁকে ঝাঁকে॥
টল টল করে জল মন্দ মন্দ বায়।
রাজহংস রাজহংসী খেলিয়া বেড়ায়॥"

কবির অনুবাদ

"The city's splendour struck *Sundara's* eyes,
And see! a charming lake before him lies.
With brick-built places four for men to land;
And on the banks four siva's temples stand.
In rows the mendicants are seated there,
Besmeared with ashes, waving matted hair.
With groves of flowery plants the banks are bound,
Where *Malaya's* soft gale wafts odours round
Where cuckoos sweetly sing their cooling song.
And humming soft the bees unnumbered throng.
Stirred by the breeze, the water's quivering stray
Where male and female swans together play."

"দেখিয়া সুন্দর হৃদে লাগে কামফাঁস।
স্মরিয়া বিদ্যার নাম ছাড়য়ে নিঃশ্বাস॥
জলেতে নিভায় জ্বালা সর্ব্বলোকে কয়।
এ জল দেখিয়া জ্বালা দ্বিগুণ বাড়ায়॥"

কবির অনুবাদ—

"As *Sundara* beheld it, instant chained
With bonds of love his captive heart remained,
Then from his core he fetched a sigh, as came
Within his recollection *Vidya's* name.
'Tis said that waters preserve quenches fire,
But loves flame which doubly doth expire.
As waters like the lakes"—

সঙ্গীততরঙ্গের গানগুলি সমালোচনাস্থলে যে সকল সঙ্গীতের অনুবাদ করিয়াছেন, তন্মধ্যে এখানে একটি গানের উত্তর সমেত অনুবাদ দেওয়া গেল—

"বিরহিণী হয়ে কর পবনের আরাধনা।
ভজ রিপুর সখারে এ আর কোন্ সাধনা॥
সহজে বিরহ হন,
প্রজ্বলিত হুতাশন,
আরো যে প্রবল হবে বুঝি রাধে তা জান না॥

আমি যা বলি তা কর,
প্রবোধ-সলিলে স্মর,
নিভিবে বিরহানল ঘুচিবে দাহ-যাতনা ॥"

কবির অনুবাদ—

'What dost thou invocate the gale ?
Thou who, thy absent love dost wail ?
What callest thou no passions friend ?
How strange does this invoking tend !
Even in its nature, lonely love,
A highly blazing fire doth prove,
Which by the gale still more will grow.
Ah *Radha !* this dost thou not know ?
Nay—do what thee I counsel – quench
The fire by cool persuasion's drench—
And then when'twill no longer be,
Thou from thy anguish shalt be free."

ঐ গীতের উত্তর—

"বিরহ অনলে তনু হোলো ত ভস্মরাশি,
তাই আরাধনারূপে সমীরণে সমভাসি,
যদি বায়ু সখা হয়্যা
এ ভস্ম কিঞ্চিৎ লয়্যা
দেয় শ্যামের শরীরে এই মনে অভিলাষী।"

কবির অনুবাদ—

"A heap of ashes soon will be
My frame by love's cremation ;
Wherefore upon the gale I call
By way of invocation,
That may it prove a friend to me
And some of the ashes bearing
Scatter it o'er my loved-one's form ;–
This wish my heart's declaring."

এই অনুবাদগুলি যেমন মূলানুযায়ী তেমনই সুন্দর !

কাশিপ্রসাদের ইংরাজী রচনার কথা বলা হইয়াছে, কিন্তু তিনি যে বাঙ্গালী হইয়া মাতৃভাষায় কিছু লিখেন নাই, এমন নহে। তাঁহার স্বরচিত তালমান সুসঙ্গত প্রায় ২৫০। ৩০০ গীত আছে। এই গানগুলি নিধুর টপ্পার ন্যায় মধুর ও ভাব-পূর্ণ, তবে তখনকার সামাজিক অবস্থা অনুসারে ইহার অধিকাংশই আদিরসঘটিত পরকীয়া-প্রেমবিষয়ক। যাহা হউক নিম্নে তাঁহার কয়েকটি বাঙ্গালা গীত উদ্ধৃত হইল—

কালেংড়া—মধ্যমান।

এত কি যাতনা পীরিতে সহে রে।
যে জানে না প্রেম, সেই সহিতে কয় রে।
পীরিতি পরমধন, যতনে হয় রক্ষণ,
তারে কেন অযতন, বিরহে করে রে।

কালেংড়া—কাওয়ালী।

ধনি পীরিতের কি হয় রীতি এমন।
আপনি জ্বলে না, পরে করে জ্বালাতন ॥
যেমন দীপোপরে, পতঙ্গ পড়িয়ে মরে,
সে দীপ তাহার তরে ত্যজে না জীবন ॥

কালেংড়া—যৎ।

আসি বলে গেল, সে যে ফিরে না এলো,
হল নিশি অবসান।
রজনী জাগিয়ে, সজনী কান্দিয়ে,
নয়ন অরুণ হলো সমান ॥

খাম্বাজ—আড়া।

কি দোষ আমার আছে।
নয়ন ভুলিয়ে মন দিলে তার কাছে।
হেরেছি তারে কি ক্ষণে, সদা সশঙ্কিত মনে,
দারুণ বিরহাগুণে প্রাণ দহে পাছে ॥

গারা-ঝিঁঝিট—আড়া।

আঁখির মিলনে প্রাণ কেবল যাতনা।
মনের অনল তাতে শীতল হয় না।
হেরিলে বিধুবদন, বাড়ে আরো আঁকিঞ্চন,
প্রবোধ মানে না মন, পূরে না বাসনা।

গারা-ঝিঁঝিট—আড়া।

প্রাণ গেলে প্রাণনাথ আসিবে কি বল সই।
জীবন রহিত হলে আসিলে কি ফল সই ॥
প্রাণাধিক ভাবি যারে, প্রাণেরে সেই প্রহারে।
বুঝি প্রাণ তোষিবারে প্রাণ হত হল সই ॥

দুইটি ঈশ্বর বিষয়ক গীত—

ভৈরবী—আড়া।

কি দিয়ে তুষিব তাঁরে ব'লে আপনার।
ফল ফুল যত দেখ সকলি তাঁহার ॥
প্রচণ্ড প্রতাপী বীর, কীটের ক্ষুদ্র শরীর,
জীবনে, পতনে যিনি সদা নির্ব্বিকার ॥

ভৈরবী—আড়া।

তুমি জান তব ইচ্ছা বিশ্বের কারণ।
ইন্দ্রিয় গোচর নহে শাস্ত্রের অদরশন ॥
উৎপত্তি পালন লয়, তোমার নিয়মে হয়,
কভু খণ্ডিবার নয় যতেক করি যতন ॥

এরূপ ঈশ্বর-নির্ভরতা অতি ভক্তিমান্ মহদ্ব্যক্তিরই হইয়া থাকে, কবির ভক্তিমান হৃদয়ের প্রমাণ এই দুইটি গানে বেশ আছে।

সরস্বতীর স্তব।

বাহার—আড়া।

শ্বেত শতদলোপরে, শ্বেতাম্বর কলেবরে,
শ্বেতমালা গলোপরে, বিরাজে শ্বেত-বরণী।
বেদ বেদাঙ্গ মন্ত্র, নৃত্যগীত বাদ্যযন্ত্র,
সকলের মূলমন্ত্র ব্রহ্মময়ী সনাতনী।
চরণের কিবা শোভা, মধুলোভে মধুলোভা,
লোহিত কমল ভ্রমে ধায়।
সারদা শুভ বরদা, অজ্ঞানের জ্ঞানপ্রদা,
বিধাতার ধ্যেয় সদা বেদমাতা নারায়ণী।

ইনি সাধারণ হিতকর কার্য্যেও মিশিতেন। তখনকার ইংরাজী ফৌজদারী আদালতে ইনি অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট ও মিউনিসিপালিটির "জষ্টিস অব্ দি পিস" ছিলেন।

১২৮০ সালের ২৭এ কার্ত্তিক (ইং ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ১১ই নবেম্বরে) কলিকাতাস্থ হেদুয়ার বাটীতে ইহার মৃত্যু হয়।

বাঁশীর গান

বেজেছে বেজেছে আজ বাঁশী,—
জেগেছে জেগেছে নব গান!
ফুটিয়াছে সৌন্দর্য্যের কায়া,
জাগিয়াছে উদাস পরাণ।
অনন্তের স্নেহমাখা সুর
পশিয়াছে মরমে মরমে
শোভিতেছে ধরণী আপনি—
বিমোহিনী বিচিত্র বরণে।
বসন্তের বসনের আভা
ছড়ায়ে পড়েছে চারিধায়,
কুহেলিকা মিলায় মিলায়,
ফোটে ফোটে বসন্ত-কুমার!
দূরে উঠে সিন্ধুর উচ্ছ্বাস,
শিরোপরে প্রশস্ত গগন,
চারিপাশে প্রেমের বিকাশ,
প্রাণে প্রাণে প্রেম আলিঙ্গন।
একদিক হতে আসে বাঁশী
আর দিকে ঢেলে দেয় কায়;
অনন্তের মাঝখানে প্রাণ,
কি করিবে ভাবিয়া না পায়

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র ঘোষ

মানুষ ও সমাজ

মানুষ সামাজিক জীব।

অসভ্য অবস্থায় মানুষ পশু। বিশৃঙ্খলতার রাজ্যে তখন সে জন্মগ্রহণ করে; বিশৃঙ্খলতায় শিক্ষিত ও বর্দ্ধিত হইয়া তাহাতেই তাহার লয় হয়। অসভ্য জীবন উদ্দেশ্যহীন, সুখহীন, শান্তিহীন, আদর্শহীন। যখন মানুষের মনে এ ভাবের উদয় হইল, তখনই সমাজসৃষ্টির সূচনা। তখনই কতকগুলি লোকে একত্রিত হইয়া পরস্পর পরস্পরকে নিয়মশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিল,—ইহাই সমাজগঠনের আদিম অবস্থা। ক্রমশঃ এই নিয়মাবলী সংস্কৃত, পরিবর্জ্জিত ও পরিপুষ্ট হইয়া মহত্ত্বে পরিণত হইল—বুদ্ধিমান জীব নিকৃষ্ট পশুবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া মনুষ্যত্বের অনুশীলন করিতে লাগিল।

সমাজরক্ষার জন্য, সাধারণের মঙ্গলের জন্য, সামাজিক নিয়ম প্রতিপালনে সকলেই সাধ্যমত যত্নবান; কিন্তু সকল সময় সমাজের উন্নতাবস্থায় ঐ নিয়মসমষ্টির প্রতি মানুষের দৃষ্টি স্থির থাকে না, তাহার প্রধান কারণ,—সমাজের বন্ধনশৈথিল্য, দ্বিতীয় কারণ,—আত্মম্ভরিতা, তৃতীয়তঃ,—স্বাধীনতা-প্রিয়তা, চতুর্থতঃ,—ঘটনাবিশেষের অপরিহার্য্য পরিণাম।

১। যে সমাজে বন্ধন নাই, সেখানে সকলেই নেতা, স্ব স্ব প্রধান। "অহংজ্ঞান" সে সমাজের প্রতি তন্ত্রীতে আঘাত করে। বহুদর্শী জ্ঞানীর মর্য্যাদা সেখানে উপলব্ধ হয় না। প্রকৃতিপুঞ্জ স্বতই উচ্ছৃঙ্খল। হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা ইহার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থান।

২। যে সমাজের বন্ধন যতই দৃঢ় হউক না কেন, আত্মম্ভরী অল্পাধিক পরিমাণে প্রত্যেক সমাজেই বিচরণ করিবেই। ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব জ্বলন্ত অক্ষরে এ কথার সাক্ষ্য দিতেছে। আত্মম্ভরীর অভীষ্ট—যশ ও ক্ষমতালাভ। সমাজবন্ধনের দৃঢ়তার সহিত ইহাদের সঙ্কল্পসাফল্যের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে। যথেষ্ট পরিমাণে আত্মগৌরবে স্ফীত হইলেও এবং (কাজেই) স্বীয় বিশেষত্বের পরিচয়দানে ও ক্ষমতাপ্রাপ্তির আশায় অত্যন্ত ব্যস্ত হইলেও সকল সময় প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে ইহাদের সাহস কুলায় না। যখন অবস্থা এরূপ হয়, তখন ইহারা উচ্চরবে সাধারণে স্বাভিমত প্রকাশ করে না, কার্য্যে তাহা অর্দ্ধ-প্রকাশ্যে অর্দ্ধ-লুক্কায়িতভাবে পরিণত করে। বন্ধনের অতি দৃঢ়তায় লুক্কায়িতাবস্থাতেই ইহার পরিসমাপ্তি হয়। ইহার ফল হয়, কখন সমাজচ্যুতি, কখন সমাজে অবমাননা। একতৃতীয়াংশ স্থলে আত্মম্ভরীরা পরিণামচিন্তা ছাড়িয়া প্রকাশ্যে নিজমত প্রচার করে।

বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের এখন অধিকাংশ সংস্কারক যুক্তিকে ছাড়িয়া অথবা অসারযুক্তি (Sophistry) অবলম্বন করিয়া কতকগুলি নূতন নিয়মস্থাপনে ব্যতিব্যস্ত। বলা বাহুল্য, ইহাদের প্রার্থনীয়—যশ ও ক্ষমতা।

৩। মানুষ স্বাধীনতাপ্রিয়। এ কথার যাথার্থ্য প্রমাণার্থ সমালোচকের তীক্ষ্ণদৃষ্টি আবশ্যক করে না। সামান্য চিন্তায় চক্ষুষ্মানমাত্রেরই হৃদয়ে ইহার সত্যতা প্রতিভাত হয়। ফ্রিউইল প্রভৃতি পুরাতন কথার আলোচনা এস্থানে হইতেছে না; এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে অপ্রাসঙ্গিক সুদীর্ঘ তর্কযুক্তির স্থানও নাই। অসভ্য অবস্থায়, সমাজের আদিম অবস্থায় বন্যতার, অজ্ঞানতার ভিতর দিয়াও স্বাধীনতাপ্রিয়তা জাগিয়া উঠে—যেন আঁধারে আলোকরশ্মির ক্ষীণ রেখা, তমসাচ্ছন্ন ঘোর রাত্রে চপলার চঞ্চল দ্যুতি। জ্ঞানের সহিত স্বাধীনতাপ্রিয়তার ঘনিষ্ঠ

সম্বন্ধ—যেন দম্পতীর পরস্পরের প্রতি প্রেমের টান, যেন লৌহজাত পদার্থমাত্রেরই প্রতি চুম্বকের আকর্ষণশক্তি। মানুষ যত অধিক জ্ঞানী হয়, ততই সে স্বাধীনতার অত্যাবশ্যকতা বোধ করিতে থাকে। নানাকারণে ইহার বিপরীতও দৃষ্ট হয়। প্রধানতঃ স্বার্থপরতার আধিক্যে—তবে স্বার্থপরের মনের ভাব কতটা বিকৃত হয়, তাহা নিশ্চিতরূপে বলা কঠিন। মোটকথা, জ্ঞানী সর্ব্ব বিপদাপেক্ষা স্বাধীনতার প্রতিবন্ধকতাচারণে অধিকতর ব্যথিত হন। স্বাধীনতাপ্রিয়তা সমাজে মহাবিপ্লব আনয়ন করে। ফল হয়; কখন শুভ, কখন অশুভ। সমাজের অত্যাচার জ্ঞানী বা স্বাধীনতাপ্রিয়ের নিকট অসহ্য। প্রতিবাদে তাঁহারা সমর্থ। লাঞ্ছনা, নির্য্যাতন তাঁহাদের নিকট তুচ্ছ। নশ্বরবোধে জীবন বিসর্জ্জনেও তাঁহারা অকুণ্ঠিত। আত্মম্ভরীর সহিত ইঁহাদের কি প্রভেদ! সক্রেটিস্ প্রভৃতি মহাত্মগণ ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

৪। অবস্থা লোকচরিত্র নিয়ন্ত্রিত করে। ঘটনা বিশেষের তাড়নায় মানুষ কখন কখন প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধাচরণ করিতে বাধ্য হয়। মনের উপর আধিপত্য অল্প লোকেরই আছে আর সকল সময় মনের গতি রোধ করাও কর্ত্তব্য নয়; তাহাতে 'হিতে বিপরীত' ফল ফলে! হয়ত কেহ কোন মত আজীবন পোষণ করিয়া আসিতেছে, অবস্থা বিপাকে হয়ত সে তাহার বিপরীত কার্য্য করিতে বাধ্য হইল। পুরাতন মত বন্যার স্রোতে ভাসিয়া গেল। প্রকৃতি শূন্যস্থান দেখিতে পারে না। (Nature abhors vacuum—Carlyle) নূতন মত শূন্য-স্থান অধিকার করিয়া তাহার হৃদয়ে বদ্ধমূল সংস্কার হইয়া দাঁড়াইল। কাহারও আশৈশব ধারণা—বিধবা-বিবাহ নিষিদ্ধ। নিয়তির বন্ধন কে খণ্ডাইবে? দৈববশতঃ কোন বিধবার প্রণয়েই সে মুগ্ধ হইয়া গেল। বিধবা তাহাকে পাগল করিয়া তুলিল। বিবেকীর মনে গুপ্তপ্রণয় ব্যভি-চার বলিয়া বোধ হইল—সে প্রকাশ্যে তাহাকে বিবাহ করিতে চাহিল। সমাজ তাহার কথা শুনিল না। সমাজের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া সে বদ্ধপরিকর হইয়া সমাজকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করিল। পুরাতনের স্থানে নূতন মতের প্রভাব এইরূপে বিস্তৃত হইল। সে সমাজের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া কার্য্য করিয়া গেল!

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজের উপর আস্থা থাকুক বা না থাকুক, সে আপন মনে কার্য্য করিয়া যাইতে পারে না।* সংসার কর্ম্মক্ষেত্র—কর্ত্তব্যই কর্ম্ম, ভয় অজ্ঞানতামূলক। লোকের যথেচ্ছার উপর সমালোচনা নির্ভর করে। সমালোচক কখন স্বপক্ষে, কখন বিপক্ষে, কার্য্যের ফলের উপর তাঁহার বিচার্য্য নির্ভর করেন, কার্য্যের উপর নয়। তবে সমালোচনে অতিরিক্ত ভয় কেন? 'সর্ব্বমত্যন্তগর্হিতম্'—অতির গতি বিষময়।

সাধারণে নিষ্কাম ধর্ম্মের উপদেশ দেওয়া বাতুলতা। নিষ্কাম ধর্ম্মের উপদেশ দেওয়া সহজ। সংসারীর পক্ষে তাহা কার্য্যে পরিণত করা অতি দুরূহ। নিষ্কাম ধর্ম্ম যোগীর, সংসারীতে তাহা সম্ভবে না। নিষ্কাম ধর্ম্ম সংসারীর নিকট নিরাকার-উপাসনার দ্বিতীয় সংস্করণ।

হিন্দুশাস্ত্রানুসারে নিরাকার-উপাসনা জ্ঞানের এক মহোচ্চ সোপান। নিষ্কাম ধর্ম্মও ঐরূপ একটী স্বরবিশেষ। একেবারে নিম্ন হইতে অত্যুচ্চ উঠা অসম্ভব—অমানুষিক শক্তিতে তাহা সম্ভব হইতে পারে, সাধারণে নয়।

নিষ্কাম। 'কামনা' অর্থে আপনার সুখ খোঁজা, 'কার্য্য' অর্থে অপরের সুখ খোঁজা। কামনা-হীন কার্য্য আদর্শ হইলেও সকলের অনুষ্ঠেয় হইতে পারে না; কিন্তু 'কর্ত্তব্যপালন ও ফলাফলের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া কার্য্য করা চেষ্টাসাপেক্ষ হইলেও কর্ম্ম করিতে আসিয়াছি, কর্ম্ম করিয়াছি; ফলাফল দেখিবার আবশ্যক নাই—মানুষ এ গভীর আধ্যাত্মিক উপদেশের মর্ম্ম

* এইরূপ মতগুলি সাধারণভাবে ব্যক্ত করা হয়। পরিমিত সংখ্যা ইহার লক্ষ্য বহির্ভূত।

বুঝে না। না বুঝিবার এক আপত্তি—একদেশের যাহা কর্ত্তব্য বা কার্য্য, দেশান্তরে তাহা অকর্ত্তব্য বা অকার্য্য; কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের উপায় কোথায়? উপায় আছে,—শিক্ষা। শিক্ষা দেশাচারের উপর আসন পাতিয়া কার্য্য করিবার পথ দেখাইয়া দেয়, কাজেই কার্য্যাকার্য্যের বা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের বিভিন্নতা সহজ হইয়া পড়ে।

মানুষ অতি সামাজিক। সকল কার্য্যেই মানুষ পরের মুখের দিকে চাহিয়া যায়, কর্ত্তব্য পালন করিব—এ জ্ঞান তাহার নাই; অন্যে কি বলিবে, তাহা ভাবিয়াই সে আকুল। সোজা কথায়, বিবেচকের বিজ্ঞতাপূর্ণ বাক্য মানুষ অগ্রাহ্য করে—পরকৃত সমালোচনার উপর সে সম্পূর্ণরূপে আত্মনির্ভর করে। বর্ত্তমান শতাব্দীর সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক হার্বার্ট স্পেন্সার (Herbert Spencer) বলেন "Throughout life not what we are, but what we shall be thought, is the question" * সমালোচনজনিত শিক্ষা সকলের সাধ্যায়ত্ত।

বলা বাহুল্য, কর্ত্তব্য পালন ও ফলাফলের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া কার্য্য করার নাম নিষ্কাম ধর্ম্ম নয়। নিষ্কাম ধর্ম্মে কামনার চিহ্নমাত্র থাকে না। কামনা না রাখিয়া কার্য্য করা সংসারে কতদূর সম্ভব তাহা সহজে বুঝা যায় না। তাই বলি, কামনা থাকুক। অশুভফল অবসাদক, ফল অশুভ হইলে, তাহাতে ভগ্নোৎসাহ না হইয়া পুনরায় কর্ত্তব্য সাধন কর। তাহাতেই সুখশান্তি আসিবে।

আত্মবিস্মৃত হইয়া আচারে লীন হওয়া সহজ নয়। তাহা বিশ্ব প্রেমিকের কার্য্য, ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের কার্য্য, সাধারণের নয়। অল্প হউক, অধিক হউক, মানুষে স্বার্থপরতা আছে, সংসারীর চিরদিন তাহা থাকিবেই; তবে পরিমাণের হ্রাস বৃদ্ধি হইতে পারে মাত্র।

কবির কল্পনায় অসম্ভব সম্ভবনীয় আকার ধারণ করে। প্রকৃত ক্ষেত্রে তাহার দৃষ্টান্ত কোথাও মিলে না। প্রফুল্লের মত নিষ্কাম ধর্ম্মের পালিনী জগতে কখন হয় নাই। যাহারা এরূপ উন্নত-হৃদয় (?) তাহারা কার্য্যে অনেকটা নিষ্কামতার পরিচয় দিয়াছে মাত্র; কিন্তু অন্তরে তাহাদের দারুণ স্বার্থের অগ্নিশিখা।

নিষ্কামধর্ম্ম সন্ন্যাসীর। সংসারী ও সন্ন্যাসী দুইটি ঠিক বিপরীত শব্দ। নিষ্কাম ধর্ম্মের উপর সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। তাহাতে সমাজ বন্ধন শিথিল হইবেই।

পরমুখাপেক্ষী হইয়া কার্য্যকরার নামান্তর যশঃ-প্রার্থনা। মানুষ অত্যধিক যশঃ-প্রার্থী। কর্ত্তব্য সর্ব্বথা পালনীয়। কর্ত্তব্যপালন সুখ ও শান্তির আধার। কর্ত্তব্য অবহেলায় চিরদুঃখ ঘোর অশান্তি। ফলাফলের প্রতি ও লোকের মতামতের উপর অতিরিক্ত দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করা জীবনহীনতার পরিচায়ক।

শ্রীকালীচরণ মিত্র

* Herbert Spencer's Education—Chap I

ভাষা সংস্কারের ধূয়া

মান্যবর শ্রীযুক্ত "সাহিত্য-কল্পদ্রুম" সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু ;—

মহাশয় ! আজকাল আপ্‌নারা বেশ একটা হুজুগ পেয়েছেন দেখ্‌ছি ! দেশের উপকার, দশের উপকারের কথায় আর এখন লোক ভোলে না, প্রাচীন গৌরবের কথা আর কেহ শুন্‌তে ভালবাসে না, এমন কি, ভারত উদ্ধারের কথাও আর এখন মোটে কাণেই তোলে না, কাজেই বোঝা যাচ্চে লেখ্‌বার জন্যে আজকাল আপনাদের একটা নতুন বিষয়ের আবশ্যক হয়েছে। হুতোম বলে গিয়েছেন যে, "বাঙ্গালা ভাষা বে-ওয়ারেশ মাল" তাই বুঝি, সেইটাকেই ধরেই একটা হুজুগ তোলবার চেষ্টায় আছেন ? আরও "বঙ্গদর্শন", "আর্য্যদর্শন", "বান্ধব", "ভারতী", "নব্যভারত", "নবজীবন" প্রভৃতি মাসিক কাগজগুলোর চেষ্টায় আজকাল বাঙ্গালা-পাঠকের দলও বেড়েছে কিনা, কাজেই আপ্‌নারাও বুঝেছেন যে, এখন ভাষাটাকে ধরে জুটো নাড়া দিতে পার্‌লে দু-দশজনে পড়্‌বে বটে। পরামর্শ মন্দ নয় ! "মাছ না পেলে ছিপেয় কামড়" বাঙ্গালীই দেয় বটে।

দেখ্‌তে পাই, মধ্যে মধ্যে আপ্‌নারাই চীৎকার করেন, "বাঙ্গালা ভাষার মা-বাপ নেই", "যে যে রকমে খুসি, সে সেই রকমে বাঙ্গালা লেখে।" তাই বুঝি, এতদিনে ভাষার শ্রীবৃদ্ধি কর্‌তে, নিজেরাই কোমর বেঁধে আসরে নাম্‌লেন ? কিন্তু, গত বারের "সাহিত্য-কল্পদ্রুম" (৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা) পড়ে যা বুঝেছি, তাতে বোধ হয়, শ্রীবৃদ্ধি হওয়া দূরে থাক্‌, এই ৫০ বছরে ভাষায় যে একটা শৃঙ্খলা স্থাপিত হয়েছে, তাই উল্টে দেবার জন্যে ক্ষেপে উঠেছেন। আপ্‌নাদের প্রস্তাবমত সংস্কার কর্‌তে গেলে, বর্ত্তমান ভাষার বনেদ পর্য্যন্ত তুলে ফেলে, আর একটি নতুন ধরণের ভাষা গড়্‌তে হয়। যাই হক্‌, এখন সংস্কার করে ভাষাটির নাম কি রাখ্‌বেন ? "বাঙ্গালা" না "বাঙ্গলা" না "বাঙ্গ্‌লা" না "বাঙ্‌লা" না "বাংলা" ?—সংস্কারকেরা সংস্কার করেছেন বটে, কিন্তু এই নতুন সংস্কৃত ভাষাটার নামটা কি হবে, তা ঠিক করে দেন নি। আমি বলি, গোড়া বেঁধে কাজে নাম্‌লে, ভাল হ'ত না কি ?

সম্পাদক মহাশয় ! আপনার পৃষ্ঠপোষক বড় অল্প নয়, আর চেষ্টাও দু এক দিন কি দু-এক বছরেরও নয় দেখ্‌ছি ! সেই ১২৮৫ সাল * হতে "বঙ্গদর্শনে" এর আরম্ভ। তার পর ইন্দ্রনাথ বাবুও (প্রাচীন পঞ্চানন্দ) আপ্‌নাদের দলে মিশিয়াছেন। বেশ !

যাই হক্‌, একটা কথা বলি,—আপ্‌নারা রেখাশব্দাভিজ্ঞান-বিদ্যা উদ্ভাবন কর্‌বেন, করুন ; কিন্তু তার জন্যে এই ৫০ বছরের চেষ্টায় যে বিষয়টা গড়ে উঠেছে, তা চূর্ণ-বিচূর্ণ কর্‌তে যাচ্ছেন

* বাঙ্গালা বর্ণমালার প্রথম সংস্কারেচ্ছা ১২৮৫ সালে নয় ; ১২৮২ সালে "জ্ঞানাঙ্কুরে" প্রলাপ-সাগর নামে একটি প্রবন্ধে প্রচারিত হয়। তাহাতেই সর্ব্ব প্রথমে দুইটা "জ", দুইটা "ব", দুইটা 'ন', তিনটা 'শ'এর উপর আক্রোশ আরম্ভ হয়। তাহাতে যে সকল যুক্তি অবলম্বিত হইয়াছে, তাহা "সাহিত্য-কল্পদ্রুমের গত সংখ্যার প্রবন্ধটিতে প্রকাশিত যুক্তিগুলি হইতে নূতন নহে। তবে সে প্রবন্ধের লেখককে ধন্যবাদ দিতে হয়, কারণ, তিনি প্রবন্ধটির ''বর্ণমালা-সংস্কার" নাম না দিয়া ''প্রলাপ-সাগর" নাম দিয়াছিলেন।—(প্রতিবাদক)

কেন ? আপনারা 'সংস্কার' অর্থে কি বুঝেছেন "সংহার ?" না হলে, ওরূপ ভাবে সংস্কারের প্রস্তাব কর্‌তেন না। *

দ্বিজেন্দ্র বাবু ("বাঙ্গালা বর্ণমালা ও বানান সংস্কার" প্রবন্ধটির লেখক) স্বার্থ প্রণোদিত হইয়া (তাঁহার অবলম্বিত রেখাশব্দাভিজ্ঞান-বিদ্যা প্রচারের সুবিধার জন্য উৎসুক হইয়া) বাঙ্গালা বর্ণমালা ও বানান-সংস্কার করিতে উদ্যত হইয়াছেন ; কিন্তু সংস্কারের অনুকূলে যে সকল যুক্তি দেখাইয়াছেন, তাহা তাঁহার মতে সাধারণ হিতকর হইলেও, বাস্তবিক তাহা তাহাই নহে। সিংহ মহাশয় বা তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তিগণ (বঙ্গদর্শনের লেখক, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর) এ বিষয়ে এক দিকমাত্র দেখিয়া মীমাংসা করিয়াছেন। নিম্নে তাঁহাদিগের যুক্তিগুলি আলোচিত হইল ;—

সাহিত্য-কল্পদ্রুম (৫।৬ সংখ্যা) ১০৫ পৃষ্ঠা,—

১। দ্বিজেন্দ্র বাবুর প্রথম যুক্তি (বঙ্গদর্শনের লেখকেরও বটে)—

"আমরা দেখিতে পাই যে, ইংরাজী ভাষার অক্ষর সংখ্যায় অল্প ও যুক্তাক্ষর শূন্য বলিয়া, ইংরাজী ভাষায় পুস্তকাদি ছাপাইতে অল্প ব্যয়, অল্প সময় ও অল্প পরিশ্রম লাগে, আর অল্পাক্ষর বলিয়া উক্ত ভাষার পুস্তকাদি মুদ্রাঙ্কণে ভুলও হয় না বলিলেই চলে ; কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় অক্ষর সংখ্যাও বেশী যুক্তাক্ষরও যথেষ্ট, সুতরাং এ ভাষার পুস্তকাদি ছাপিতে যেমন বেশী ব্যয়, বেশী সময়, বেশী, পরিশ্রম লাগে, তেমনি মুদ্রিত পুস্তকে ভুলও যথেষ্ট থাকে। যদি যুক্তিযুক্ত উপায় অবলম্বনে এই ভাষার বর্ণমালা ও বানান-প্রণালীর সংস্কার করা যায় ; তাহা হইলে বাঙ্গালা ভাষার পুস্তক ছাপাইবার কত সুবিধা হয় ও ভুলের জন্য "ছাপাখানার ভূতেরা" চিরনিন্দার হাত এড়াইতে পারে।"

এই যুক্তিটি একেবারে ভিত্তিহীন নহে, অনেকাংশে সত্য ; কিন্তু কতকগুলি অক্ষর কমাইয়া দিলে, তাহার প্রতিবিধান হইবে কিরূপে, বুঝা গেল না। মনে কর 'যুক্তি' এই কথাটি বর্ত্তমান ছাপার অক্ষরে লিখিতে গেলে 'যু' 'ি' 'ক্ত' এই তিনটী সীসাক্ষরের প্রয়োজন হয় ; কিন্তু সংস্কারকদিগের প্রস্তাবমত লিখিতে গেলে, এইরূপে লিখিতে হইবে—'যুক্‌তি'—ইহাতে 'যু' 'ক্‌' 'ি' 'ত' এই চারিটী সীসাক্ষর প্রয়োজন হইবে (১১০ পৃ, ২য় যুক্তি ও ১১৫ পৃ উদাহরণ দেখ)। আবার যদি 'যু' ও 'ক্‌' এই দুইটী অচ্‌ ও হস্‌যুক্ত বর্ণকে (বঙ্গদর্শনের লেখকের মতানুসারে) উঠাইয়া দিয়া ক্ষুদ্রাকার 'য' ও 'ক' এ (করগু-টাইপে) 'ু' ও (্) জুড়িয়া কাজ চালাইতে হয়, তবে 'যুক্তি' লিখিতে 'য' 'ু' 'ক' '্' 'ি' 'ত' এই ছয়টি সীসাক্ষরের প্রয়োজন হয়। এক্ষণে বুঝা যাইতেছে যে, বর্ত্তমান প্রণালীর সীসাক্ষরে 'যুক্তি' লিখিতে তিনটী অক্ষরের প্রয়োজন হয়, কিন্তু বর্ণমালার (সংস্কারকগণের প্রস্তাবমত) সংস্কার হইলে, ঐ কথাটী লিখিতে ৪টী বা ছয়টি সীসাক্ষরের আবশ্যক হইবে, অতএব তাহাতে কিরূপে অল্প সময় ও অল্প পরিশ্রম লাগিবে তাহা বুঝা যায় না ; আর অল্প ব্যয়ই বা হইবে কেন ? একটি 'ক্ত' ভাঙ্গিয়া 'ক' '্' 'ত' তিনটী বর্ণ করিতে হইবে, সুতরাং খরচ কমিবে কেন ? 'ছাপাখানার ভূতেরা' এই অল্প সংখ্যক যুক্তাক্ষর লইয়াই বিব্রত, তাহার উপর যদি এক একটি যুক্তাক্ষরকে তিন চারিটি স্বতন্ত্র বর্ণ করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে কি বেশী ভুল হইবার

* গত সংখ্যার প্রবন্ধটি "সাহিত্য-কল্পদ্রুমের" সম্পাদকের লিখিত না হইলেও, প্রতিবাদক মহাশয় সম্পাদককেই দায়ী করিতেছেন। বোধ হয়, সম্পাদক স্বীয় কাগজে উহা প্রচার করিয়া সহকারিতা-দোষে দোষী (Aider and abater of the charge) বলিয়া এই আক্রোশের ভাজন হইয়াছেন ! বেশ ! "একগাঁয়ে ঢেঁকি পড়ে, অন্য গাঁয়ে মাথা ধরে"। মন্দ নয় ! (সা-ক সং)

সম্ভাবনা নহে? যাহারা তিনটা অক্ষর সাজাইতে ভুলে, তাহারা ছয়টী সাজাইতে বেশী ভুলিবে। যদি বল, রকম কমিয়া যাইবে; কিন্তু রকম কমিলে শব্দটিতো কমিল না, শব্দটী যেমন করিয়াই হউক ৫।৬ টা সীসাক্ষর দিয়া যোজনা করিতে হইবেই, এক্ষণে ভাবিয়া দেখ যে তিনটার স্থলে ছয়টা যোজনা করা সহজ ও প্রমাদ-শূন্য কিনা? আরও যুক্তাক্ষর ভাঙ্গিয়া শব্দগুলিকে বিস্তৃত করিয়া লিখিবার প্রণালী চলিলে, কাগজের খরচ বাড়িবে, সুতরাং (যদিই তর্কপক্ষে স্বীকার করা যায় যে, বর্ণমালা ও বানান শোধিত হইলে, ছাপার খরচ কমিবে, কিন্তু কাগজের খরচ বাড়িয়া তাহা পোষাইয়া যাইবে না কি?) প্রকৃত খরচ কমিবে কিরূপে বুঝা যায় না। অতএব সংস্কারকগণের প্রথম উপকারক যুক্তিটি ভিত্তিহীন না হইলেও প্রস্তাব মত সংস্কারসহ বা উপকারী নহে, সুতরাং অগ্রাহ্য।

১০৬ পৃষ্ঠা—

২। দ্বিজেন্দ্র বাবুর ২য় যুক্তি (বঙ্গ-দর্শনের লেখকেরও বটে)—"সিকস্তা লেখায় বর্ণাশুদ্ধি, বানানশুদ্ধি, এ সকল কিছুই দেখে না, তাহার উপর অক্ষর এত ভাঙ্গিয়া বিকৃত করিয়া লেখা হয় যে, অনেক মুহুরীকেও পড়িবার সময় "কোন শালা লিখা হ্যায় রে" বলিয়া ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিতে হয়। বিদেশীয় হাকিমেরা (যাঁহারা ছাপার বর্ণমালা পাঠ করিতে পারেন মাত্র, তাঁহারাতো) কোন জন্মেই সিকস্তা লেখার দন্তস্ফুট করিতে পারেন না, কাজেই বিচারের সময় আরজী ও দলিলাদি পড়িবার আবশ্যক হইলে, সেরেস্তাদার বা পেস্কারের উপর নির্ভর করেন। * * যদি যুক্তিযুক্ত উপায় অবলম্বনে এই সিকস্তা-লেখকদিগকে বর্ণ-বিভ্রাট ও বানান-বিভ্রাটের হস্ত হইতে উদ্ধার করা যায় এবং ছাপাতেও যে বানান, সিকস্তাতেও সেই বানান চলিত হয়; তাহা হইলে বিদেশীয় হাকিমেরা ও সিকস্তা-লেখকেরা কার্য্য করিতে সুবিধা পান।"

সম্পাদক মহাশয়! যদি এই প্রস্তাবটির মতে বর্ণমালা-সংস্কার হয়, তাহা হইলে, 'আপনার নাক কাটিয়া পরের যাত্রা ভঙ্গ করার" ন্যায় হইবে; কারণ, সিকস্তা-লেখকেরা বর্ণজ্ঞান-শূন্য নন্দীভৃঙ্গির জীবন্ত অবতার,—তাঁহারা "তৈলকে" 'তইল', খোলকে 'খইল' বা খৈল, 'তণ্ডুল'কে 'তন্দুল' বা 'তনডুল' লিখিয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন ইহাদের লিখিত মোকদ্দমার কাগজ পত্রে যে রকম চিত্র বিচিত্রের অনৈসর্গিক শব্দমালা ও বানান দেখা যায়, তাহা ভুক্ত-ভোগীরা জানেন। এখন এই সকল মহাত্মাদের সুবিধার জন্য "সিকস্তায় যে বানান, ছাপার লেখাতেও সেই বানান" চালাইতে হইলে, অভাগিনী বাঙ্গালা ভাষার গলায় দড়ি দেওয়া উচিত। আজকাল বিদেশীয় হাকিমেরা এদেশে আসিয়া 'সবজান্তা' হইয়া পড়েন, নতুবা সিকস্তা পড়া অভ্যাস করিতে কয় দিন লাগে? সিকস্তার বর্ণমালা (একরূপ না হইলেও) এখনও কার্য্যক্ষেত্রে বর্ত্তমান, কিন্তু যে সকল বর্ণমালা এখন কোথাও চলিত নাই, শিলালিপি, প্রাচীন পুথি-প্রভৃতি হইতে ইউরোপীয় প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধাতৃগণ সেই সকল বর্ণমালার পাঠ উদ্ধার করিয়া কত অত্যাশ্চর্য্য বিবরণ প্রকাশ করিতেছেন, আর কয়েকটী অপরিণতবয়স্ক, পরিশ্রম-কাতর, কর্ত্তব্য-হেলক (কারণ; জজ, মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতির বাঙ্গালা বা দেশীয় ভাষা ভালরূপে পড়িতে শিখা কর্ত্তব্য-কার্য্য বলিয়া গণ্য; এজন্য গবর্মেণ্ট কয়েক সহস্র টাকা পুরস্কারও দিয়া থাকেন, কিন্তু) বিদেশী হাকিমেরা দেশীয় ভাষা না শিখিয়া দেশের কদর্য্য লেখা পড়িতে পারেন না বলিয়া, তাঁহাদের খাতিরে আমাদের ভাষা উল্টাইয়া দিতে হইবে? এ কোন্ দেশী প্রস্তাব সম্পাদক মহাশয়? আরও, একটা শৃঙ্খলা ভাঙ্গিয়া, একটা বিশৃঙ্খল ব্যাপারের অনুষ্ঠান করিলে, বিদেশীর পক্ষে বেশী সুবিধা কিরূপে হইবে, বুঝা যায় না। মনে কর কুল (বংশ) ও কুল (নদীতীর) এই উভয়বিধ বানান উঠিয়া গিয়া রহিল এক মাত্র 'কুল'; এক্ষণে 'গংগার কুলে কেহ নাই',—এই

(নব-বিধানী বাঙ্গালা) কথাহইতে বিদেশী হাকিম সহজে কি বুঝিবেন? এখানে 'কুল' অর্থে বংশও হয়, নদীতীরও হয়। এইরূপ এক বিভ্রাট ঘুচাইয়া অপর বিভ্রাট বাধান অপেক্ষা অভ্যস্ত বিভ্রাটটিই ভালরূপে পরিচয় করা সুবিধা নহে কি? আর সিকস্তায় অক্ষর-বিকৃতিবশতঃই পাঠ-কষ্ট ঘটে, সুতরাং আদালতাদিতে সিকস্তা লেখা উঠাইয়া দিয়া, সুন্দর, পরিষ্কার, সহজ-বোধ্য হস্তাক্ষর চালাইলে কি সুবিধা হয় না? ইংরাজী নকল-নবিশ বা কেরাণী রাখিতে হইলে, যাহাদের হস্তাক্ষর অতি সুন্দর ও স্পষ্ট, তাহাদিগকেই উপরওয়ালারা নিযুক্ত করেন, কিন্তু বাঙ্গালা বা অন্য কোন দেশী ভাষার লেখকদিগকে নিযুক্ত করিবার সময়, তাহা করেন না, সুতরাং দোষ ভাষার ঘাড়ে না দিয়া, উপরওয়ালাদিগের ঘাড়ে দেওয়াই উচিত। * সিংহ মহাশয় যদি বিদেশী হাকিমের উপর এত সদয় হইয়া থাকেন, তবে কর্ত্তৃপক্ষকে সুলেখক নিযুক্ত করিতে বলিবেন, ভাষার সংস্কার করিয়া বেশী আর কি উপকার করিবেন? একটা গোলমাল মিটাইতে গিয়া নূতন আর দুইটা গোলমাল বাধাইবেন বৈত নয়!

সাহিত্যকল্পদ্রুম (৫।৬ সংখ্যা) ১০৬ পৃষ্ঠা—

৩। দ্বিজেন্দ্র বাবুর তৃতীয় যুক্তি—

"আজকাল যাঁহারা বাঙ্গালা সাহিত্যের পরিচালক, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে লিখিবার সময় বর্ণবিভ্রাট ও বানান-বিভ্রাটে পড়িয়া; লিখিবার সময় এত কদর্য্য বানান লিখেন যে, দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। * * * ছাপার পর দেখা গিয়াছে, কোন একটি শব্দের বানান এক স্থানে এক প্রকার লিখিয়াছেন, আবার ঠিক তাহার চারি পংক্তি নিম্নে আর এক প্রকার লিখিয়াছেন! যুক্তিযুক্ত উপায়ে বর্ণমালা ও বানান-প্রণালীর সংস্কার হইলে "এ আপদ হইতে অনেকেই উদ্ধার পাইবেন।"

আমার মতে উক্তরূপ "অনেককে" আপদ হইতে উদ্ধার করিয়া কাজ নাই। যাঁহারা ব্যাকরণের মতে বানান লিখিতে জানেন না, তাঁহাদের সংখ্যা অধিক হইলেও, সে সকল ব্যক্তির জন্য ভাষা-সংস্কার আবশ্যক হয় না, বরং নিজের অজ্ঞতায় লজ্জিত হইয়া তাঁহাদেরই ব্যাকরণ শিক্ষা করা ও বানান দুরস্ত করা কর্ত্তব্য। বাঙ্গালা ছাপাখানার কথা তুলিয়া কাজ নাই, কেননা, বাঙ্গালা ছাপাখানায় এখন যাহারা বর্ণযোজক তাহারা অনেকেই কেবল হাতের লেখা পড়িতে পারে মাত্র, তাহারা অনেকে বানান কাহাকে বলে, তাহা জানেও না। ইংরাজী ছাপাখানার ন্যায় বাঙ্গালা ছাপাখানায়, গ্যালী-রিডার, প্রুফ-কারেক্টার প্রভৃতি কর্ম্মচারী নাই, কাজেই ঐরূপ ঝুড়ি-ঝুড়ি ভুল থাকিয়া যায়। যাঁহাদের পুস্তক ছাপা হয়, তাঁহারাও অনেকে বানানে ধনুর্দ্ধর; কাজেই প্রুফ দেখা হইলেও ঐরূপ ঘটে। আরও এক কথা এই যে, এরূপ লোক বাঙ্গালায় মোট ৫০০ হয় ত যথেষ্ট হইবে। এই ৫০০ শত লোকের সুবিধার জন্য (৭ কোটি বাঙ্গালীর মধ্যে লেখাপড়া জানা) ২ কোটি লোকের ভাষা বদলাইয়া দেওয়া কি সহজ-সাধ্য, না এই ৫০০ জনকে অভিধান ও ব্যাকরণ পড়ান সহজ-সাধ্য? যদি বল বর্ণমালা ও বানান-প্রণালীর গোলমালবশতঃ শিক্ষা করা সহজ নহে বা শিখিলেও মনে থাকে না; সে কথার মীমাংসা হইতে পারে না, কারণ

* আর মুষ্টিমেয় লোকের কদর্য্য লেখার জন্য কি ভাষার বর্ণমালা-সংস্কার করা উচিত? আমরা জানি, কয়েকটি জেলাজজ ও ম্যাজিষ্ট্রেটের হাতের লেখা এরূপ দুর্ব্বোধ্য যে, হাইকোর্টের জজেরা তাঁহাদের আদেশ দিয়াছেন যে, তাঁহাদের লিখিত মীমাংসার (judgment) আর একখানি করিয়া প্রতিলিপি প্রস্তুত হইবে ও তাহাতে সহি করিয়া আসলখানির সহিত মোকদ্দমার কাগজ পত্রের মধ্যে রাখিতে হইবে। এক্ষণে সংস্কারকেরা কি ইঁহাদের হস্তাক্ষর দেখিয়া ইংরাজী অক্ষর-সংস্কারের পরামর্শ দিবেন না কি?

এক্ষণে যত সহজে লোকের শব্দজ্ঞান, তাহার অর্থজ্ঞান বা তাহার প্রয়োগজ্ঞান জন্মে, নূতন উপায়ে বানান-প্রণালী সংশোধিত হইলে, সেরূপ থাকিবে না; যেমন ('শরণ' ও 'সরণ' স্থলে) শরণ, ('শঙ্কর' ও 'সঙ্কর' স্থলে) শংকর, ('শবা' ও 'সব' স্থলে) শব ('শকল' ও 'সকল' স্থলে) শকল, ইত্যাদি।

৪। দ্বিজেন্দ্র বাবুর ৪র্থ যুক্তি—

"বাঙ্গালা ভাষায় একবিধ উচ্চারণের দুই তিনটি বর্ণ আছে।" ইহার আলোচনা পরে করা যাইবে।

৫। দ্বিজেন্দ্র বাবুর ৫ম যুক্তি—

* * * (বর্ত্তমান) আকারের বাঙ্গালা লিখিতে গেলে, অনেক সময়ে অনেক শব্দ লেখা দুরূহ হয়।

এ সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত বলা আবশ্যক যে, যেখানে বানান করা প্রচলিত নিয়মে কঠিনতাসাধ্য, সেখানে সংশোধন করা আবশ্যক, আর তাহা আপনিই হইয়া থাকে; তাহার জন্য ভাষার আমূল পরিবর্ত্তন আবশ্যক হয় না। এইরূপ অভাবে পড়িয়াই 'ক্স' ও 'স্ক' বর্ণ দুইটির উৎপত্তি হইয়াছে। বঙ্গদর্শনের লেখকও ইহা স্বীকার করিয়াছেন।

৬। দ্বিজেন্দ্র বাবুর ৬ষ্ঠ যুক্তি—

"বাঙ্গালায় এক্ষণে যেরূপ বানান-প্রণালী চলিত আছে, তাহা ব্যাকরণানুমোদিত। যদি ব্যাকরণ রাখিতে হয়, তবে বর্ণমালা সংস্কার করা চলে না; কিন্তু * * * আজকাল যে ব্যাকরণ বাঙ্গালা ব্যাকরণ নামে প্রচলিত আছে, তাহা বাস্তবিক বাঙ্গালা ব্যাকরণ নহে, সংস্কৃত ব্যাকরণের রূপান্তরমাত্র। * * যুক্তিযুক্ত উপায়ে বর্ণমালা ও বানান-প্রণালী সংশোধিত হইলে (বাঙ্গালা) ব্যাকরণ রচনাও সহজ হইবে।"

কথাটি মন্দ নয়, কিন্তু ইহাতে বিন্দুমাত্র সত্যও নাই। স্বীকার করি, যে ব্যাকরণ চলিত আছে, তাহা সংস্কৃত ব্যাকরণের রূপান্তরমাত্র; কিন্তু তাহা কি অন্যায়? বাঙ্গালা ভাষাই যে সংস্কৃত ভাষার রূপান্তর! ইহার ৮০ শব্দ যে খাঁটি সংস্কৃত! ।০ আনা আন্দাজ অন্যান্য শব্দ লইয়া ভাষা হয় না, কাজেই ৮০ সংস্কৃত শব্দের জন্য ব্যাকরণ রাখিতে হয়, আর এই জন্যই দ্বিজেন্দ্র বাবুর চতুর্থ যুক্তিটি বিন্দুমাত্রও কার্য্যকরী নহে। যখন ৮০ সংস্কৃত শব্দ লইয়া বাঙ্গালা ভাষা চালাইতে হইবে, তখন সংস্কৃত ব্যাকরণানুমোদিত বানান-প্রণালী না রাখিলে চলিবে কেন? আর সংস্কৃত শব্দগুলি রাখিব, কিন্তু বানান-প্রণালী সুবিধামত গড়িয়া লইব, ইহা করিলে কেবল যথেচ্ছ-চারিতা ও বিশৃঙ্খলাই বাড়িবে মাত্র, যেমন দ্বিজেন্দ্র বাবু বুঝিতেছেন যে "জ" "শ" ও "ন" রাখিলেই সুবিধা হয়, তেমনি অন্য একজন সংস্কারক আর একদিন উঠিয়া বলিবেন,—না "য" "স" ও "ণ" রাখিলেই বেশী সুবিধা হইবে, আর তৎপক্ষে তিনি বলবত্তর প্রমাণ দেখাইতেও ত্রুটি করিবেন না।

দ্বিজেন্দ্র বাবু মুখবন্ধে যে ৬টি প্রধান উপকার পাইবার আশায় বর্ণমালা ও বানান-সংস্কার চাহিয়াছেন, তাহাতো উপরে আলোচিত হইল এবং বুঝা গেল যে, উক্ত উপকার না হওয়াই প্রার্থনীয় এবং হওয়াও অসম্ভব। সম্পাদক মহাশয় কি বলেন? আপনি কি ঐ সকল উপকারের লোভে সিংহ মহাশয়ের প্রস্তাবিত পথে বানান করিয়া সাহিত্য-কল্পদ্রুম চালাইতে রাজি আছেন? বেশত, স্বল্পব্যয় হইবে! স্বল্প পরিশ্রম লাগিবে! এত ভুল হইবে না, কলম ধরিয়া যা ইচ্ছা লিখিয়া গেলেই লেখা হইবে। ভয় কি?

তৎপরে সম্পাদক মহাশয়! সিংহ মহাশয়, বঙ্গদর্শনের প্রবন্ধ হইতে বর্ণ-ত্যাগের যুক্তিগুলি প্রদর্শন করিয়াছেন। সে গুলিও আলোচিত হইতেছে,—

১। বঙ্গদর্শন-লেখকের প্রথম যুক্তি (১০৭ পৃ)—

"ক্রমশঃ কালবশে এই উচ্চারণভেদে ১৩২ রকম স্বরবর্ণের মধ্যে বাঙ্গালা বর্ণমালায় কেবল হ্রস্ব ও দীর্ঘ এই দুইটি ভেদমাত্র ব্যবহৃত হয়। সংস্কৃত ব্যাকরণে নাগোজীভট্টের মতে যখন ৯ কারের ব্যবহার নাই বলিয়া ৡ কারকে পরিত্যাগ করা হইয়াছে, তখন বাঙ্গালায় ব্যবহার নাই বলিয়া ৠ, ঌ, ৡ এই তিনটিকে ত্যাগ করিতে পারা যায়। * * * * 'অ'এর সহিত 'া' যোগ করিলেই 'আ' হয়, তখন 'আ'কে তুলিয়া দিতে পারা যায়। এইরূপে এক 'অ'এর সাহায্যে অন্য স্বরগুলিও কেবল তাহাদের চিহ্নযোগে প্রকাশিত হইতে পারে, যথা—আ, অি, অী, অু, অূ, অৃ, অে, অৈ, অো, অৌ;—এরূপ আকৃতি আপাততঃ দেখিতে কিছু বিকৃত বটে; কিন্তু উচ্চারণে বা আসলে কোন হানি হয় না। * * * আরও একটি কথা এই যে, 'ই'. 'ঈ' প্রভৃতি স্বরবর্ণগুলি এক সময়ে 'অি'. 'অী' ছিল, কালে আকার বদলাইয়াছে; মনোযোগপূর্ব্বক উহাদের গঠন-ভঙ্গী দেখিলেই, তাহা বুঝা যায়।"

এই যুক্তিটি অপেক্ষাকৃত সারগর্ভ, কিন্তু একটি কথা এই যে, সংস্কৃতে ১৩২ রকম স্বরভেদ আছে বটে; কিন্তু ১৩২ রকম স্বরের আকার সংস্কৃতেও আছে কি? লেখকের বিবেচনা করা উচিত ছিল যে, সংস্কৃত বর্ণমালা সৃষ্টি-কারকেরা উচ্চারণভেদ ধরিয়া যে দুইটি উচ্চারণের আকার কল্পনা করিতে পারিয়াছিলেন, সেই দুইটিই বিভিন্ন বর্ণাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা আরও দেখিয়াছিলেন যে, হ্রস্ব ও দীর্ঘ এই দুইটি স্বর যদি ভিন্নাকারে প্রকাশিত না করা হয়, তাহা হইলে, অনেকগুলি শব্দ যথাযথ উচ্চারণের সহিত প্রকাশিত করাও দুরূহ হইবে। বাঙ্গালা বর্ণমালা-উদ্ভাবকেরা ঠিক সংস্কৃত যুক্তির অনুসরণ করিয়াছেন মাত্র, কাজেই বাঙ্গালাতেও ঐ দুই আকার ভিন্ন আর কোন আকার নাই। তৎপরে আরও বিবেচনা করা যাইতে পারে যে, হ্রস্ব ও দীর্ঘ এই দুইটি উচ্চারণই স্বরের প্রধান ভেদ, সুতরাং এই দুইটি বিভিন্নাকারে প্রকাশ করা বিশেষ আবশ্যক, কিন্তু প্লুত নামক স্বরভেদটুকু ভিন্নাকারে প্রকাশিত করা যায় না, কারণ দূরহইতে আহ্বান এবং রোদন ও গানকালে যে সকল স্বরভেদ দেখা যায়, তাহাদিগকেই প্লুতস্বর বলে, সুতরাং এক প্লুতস্বরের আকার স্থির করিতে গেলে অসংখ্য হইয়া পড়ে; কারণ বালকেররোদনাহ্বানে যেরূপ স্বরভেদ হইবে বৃদ্ধের রোদনাহ্বানে তাহা অপেক্ষা ভিন্নাকার হইবে! রাগ-রাগিনীভেদে গানের স্বরভেদ অনির্ণেয়; কারণ শ্রুতি, গমক, মূর্চ্ছনাভেদে স্বর যে কত রকমে ভিন্নাকার ধারণ করে, তাহা কে বলিতে পারে? কিন্তু হ্রস্ব ও দীর্ঘ উচ্চারণে এরূপ হাঙ্গামা নাই। যাহা হ্রস্ব, তাহা বালকণ্ঠেও হ্রস্ব, বৃদ্ধ কণ্ঠেও হ্রস্ব, আর যাহা দীর্ঘ তাহাও সর্ব্বস্থলেই দীর্ঘ, সুতরাং এই দুইটি স্বরেরই ভিন্নাকার কল্পিত হইয়াছে। তৎপরে নাগোজীভট্ট কি যুক্তিতে সংস্কৃত হইতে ৡকার ত্যাগ করিয়াছেন, আর তাঁহার মতই মহাভাষ্য, কাশিকা প্রভৃতি ব্যাকরণ-ভাষ্যে অবাধে গৃহীত হইয়াছে কিনা, বলিতে পারি না, সুতরাং সে সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ রহিল। নাগোজীভট্ট বলেন, "ঌ বর্ণস্য দ্বাদশ, তস্য দীর্ঘাভাবাৎ।" ইহার উপর নির্ভর করিয়া বাঙ্গালায় ৠ, ঌ, ৡ ত্যাগ করা যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ, পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, বাঙ্গালার শব্দমালার ৮০ অংশ সংস্কৃত শব্দ, এখন যদি ৠ, ঌ, ৡ, ত্যাগ করা যায়, তাহা হইলে. তত্তৎবর্ণ সংযুক্ত শব্দমালার গতি কি হইবে? যখন বাঙ্গালা ভাষায় 'বিদীর্ণ' 'জীর্ণ' 'প্রকীর্ণ' 'অবতীর্ণ' প্রভৃতি পদগুলি চলিত আছে, তখন 'ৠ' কিরূপে বাদ দেওয়া যায়? বাঙ্গালা ভাষা শিখিবার সময় কি ঐ পদগুলি সাধিবার আবশ্যক নাই? যদি সিংহ মহাশয় ও বঙ্গদর্শন-লেখকের খাতিরে ৠ বাদ দিয়া বর্ণমালা সংস্কৃত করা যায়, তাহা হইলে, বলুন তো সম্পাদক মহাশয়! "দৄ" "জৄ" "কৄ" ও "তৄ" প্রভৃতি ধাতু লিখিবেন কিরূপে? ঌ সম্বন্ধেও আমাদের ঐ মত। ৡ কারকে লইয়া কি করিব জানি না; কারণ, বাঙ্গালায় ৡকার যুক্ত ধাতু বা শব্দ আজিও প্রবেশ করে নাই। সংস্কৃতেও কিছু আছে কিনা

জানি না; কারণ শব্দকল্পদ্রুমে শুদ্ধ ঌ(অর্থ,—মহাদেব ; দৈত্যস্ত্রী,কামধেনুমাতা ; মাতা ও দেবনারী) ভিন্ন এতৎসংযুক্ত কোন শব্দ বা ধাতুও পাইলাম না। * এতদ্ভিন্ন বঙ্গদর্শনের লেখক 'অি, 'অী' 'অু, 'অূ' ইত্যাদি রূপ স্থির করিয়া ই, ঈ, উ, ঊ, ইত্যাদি স্বরবর্ণগুলি কমাইয়া ছাপার জন্য সীসাক্ষর-সংখ্যা হ্রাস করিতে চাহিয়াছেন, তাহাতে কতদূর সুবিধা হইবে, তাহা বলিতে পারি না, কারণ যেমন, ই, ঈ, উ, ঊ, প্রভৃতি অক্ষরগুলি বাদ দিব, তেমনি, অ, ও, ি, ী, ু, ূ, প্রভৃতি স্বরচিহ্নগুলির সংখ্যা বাড়াইতে হইবে, সুতরাং ব্যয়লাঘব বা অক্ষর-লাঘব হইবে না, কেবল রকম কমিবে মাত্র এবং যেখানে একটিমাত্র 'ই' ব্যবহার করিলেই চলিতে পারে, সেখানে 'অ' ও 'ি' এই দুইটি বর্ণ ব্যবহার করিতে হইবে সুতরাং বর্ণযোজনায় সময় বেশী লাগিবে। 'অি" "অী" প্রভৃতি "ই" ও "ঈ" প্রভৃতির মৌলিকরূপ কিনা তৎসম্বন্ধে মতভেদ ঘটিতে পারে, অথবা স্বীকার করিলেও ক্ষতি-বৃদ্ধি কিছুই নাই, তবে যদি পরিবর্তনই স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে লেখককেরও স্বীকার করিতে হইবে যে, যখন কালে পরিবর্তন হইয়াছে, তখন পরিবর্তনের আবশ্যক হইয়াছে বলিয়াই হইয়াছে, কাজেই এখন যদি এই পরিবর্তিতরূপ ত্যাগ করিয়া মৌলিক রূপ গ্রহণ করা যায়, তবে হয়তো আবার কতকগুলি অসুবিধা (অন্ততঃ যেগুলি প্রথম পরিবর্তন কালে ছিল,) সেইগুলি ঘটিতে পারে ; সুতরাং মৌলিকরূপ বলিয়া অি, অী ইত্যাদি রাখিতে পারি না।

২। বঙ্গদর্শন লেখকের ২য় যুক্তি (১০৮ পৃ)

"ঙ" ও "ঞ" কে বাদ দেওয়া যাইতে পারে, কারণ বাঙ্গালাভাষায় ইহাদের স্বতন্ত্র ব্যবহার দেখা যায় না। ঙ্ক, ঙ্গ, ঞ্চ, ও ঞ্জ প্রভৃতি স্থলেও স্বতন্ত্র উপায় অবলম্বনে ঙ ও ঞ কে পরিত্যাগ করা যাইতে পারে। 'ড়' ঢ়' 'ৎ' 'য়' এই চারিটি 'ড, ঢ, ত, ও য এর উচ্চারণভেদমাত্র সুতরাং এগুলিকে অনায়াসেই বাদ দেওয়া যাইতে পারে আর সংস্কৃতেও এরূপ বিন্দু-সংযুক্ত স্বতন্ত্রবর্ণ নাই ; ব্যাকরণের সূত্রানুসারে স্থানভেদে ড, ঢ, ত, য, যথাক্রমে ড়, ঢ়, ৎ, য় হইয়া থাকে ও তদনুরূপ উচ্চারিত হয়। বাঙ্গালাতেও সংস্কৃতের এই বিধিটুকু লইলে চলিতে পারে।"

এই যুক্তিটিতে ঙ, ও ঞ সম্বন্ধে সম্পাদক মহাশয় বা সিংহ মহাশয় যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই যথেষ্ট। ঙ্ক, ঞ্চ স্থলেও ঙ ও ঞ ত্যাগ করা যায় কিনা, তাহা পরে আলোচিত হইবে। ড়, ঢ়, য়, ৎ স্থলে সংস্কৃত ব্যাকরণের সূত্র চালাইয়া ঐ বর্ণগুলি বাদ দেওয়া যাইতে পারে বটে, তাহাতে বস্তুতঃ ভাষারও কোন ক্ষতি হইবে না, কিন্তু সুবিধার জন্যই একবার যেগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেই গুলি তুলিয়া দিলে যে অসুবিধা হইবে, তাহা নিবারণের উপায় কি ? আর ছাপার সীসাক্ষর হ্রাস করার কথা বৃথা, কারণ রকম কমাইলে বাস্তবিক অক্ষর কমান হয় না,—ড়, বাদ দিলে ড, বাড়াইতে হইবেতো ?

৩। বঙ্গদর্শন-লেখকের ৩য় যুক্তি (১০৯ পৃ)—

"দুইটি 'ব' এর প্রয়োজন নাই, কারণ ব্যাকরণগত ব্যবহার স্থলের ভিন্নতাব্যতীত উচ্চারণ বা আকারগত ভিন্নতা নাই।"

সম্পাদক মহাশয় ! এই স্থলে আমার মত উল্টা। আমি এইস্থলে একটি অন্তঃস্থ 'ব' এর স্বতন্ত্ররূপ কল্পনা করিতে চাই। সংস্কৃতের মত যদি একটি পেটকাটা ব হয়, তাহা হইলে অন্তঃস্থ 'ব' এর ব্যবহারস্থল, ব্যাকরণের সূত্রটির আবশ্যকতা ও দুইটা ব রাখিবারও আবশ্যকতা

---

* এই জন্য ঌ কারকে যদি ত্যাগ করা আবশ্যক হয়, তবে বোধ হয় কোন ক্ষতি হয় না। সংস্কারকদিগের সহিত একমতে এটি ত্যাগ করিতে আমরাও পারি ॥

সহজে বুঝা যায়। আকার ভিন্ন হইলে, কালে উচ্চারণেও একটু পার্থক্য জন্মিতে পারে। *
অন্তঃস্থ 'ব'এর আকার ভিন্ন করিলে ছাপার সীসাক্ষর সংখ্যা ১টি বাড়িবে ; কিন্তু আসলে কোন
ক্ষতি হইবে না, কারণ, এখন যতগুলি বর্গীয় 'ব'এর ব্যবহার হয়, ততগুলি আর হইবে না।
প্রাচীনকালের ছাপা বাঙ্গালা পুস্তকে এইরূপ একটি পেটকাটা ব ছিল, দেখা যায় ; সেটি
গেল কেন বলিতে পারি না।

তৎপরে বঙ্গদর্শন-লেখকের বানান-সংস্কার (যুক্তবর্ণাদি) সম্বন্ধে যাহা যাহা বলিয়াছেন,
তাহা ভিত্তিহীন ; কারণ, তাঁহার প্রথম যুক্তি.—"গু, রু, শু, প্রভৃতি উঠাইয়া দিয়া গু, রু,
শু, প্রভৃতি চালাও। ইহাতে আসলে কমিল কি ?—দ্বিতীয় যুক্তি,—ন্ন, ণ্ণ, ম্ম ভিন্ন পঞ্চমবর্ণ-
যুক্ত যুক্তাক্ষরগুলি ং-সাহায্যে প্রকাশিত হইতে পারে, আর তাহাই স্বাভাবিক উচ্চারণ ; যেমন
দংত, পংচ, কংঠ ইত্যাদি, দন্ত, পঞ্চ, কণ্ঠ ইত্যাদি সংস্কৃত উচ্চারণ।—এরূপেই বা ফল কি ?
রকম কমাইলে যে বস্তুতঃ অক্ষর-সংখ্যা কমে না তাহা বারবার বলা হইয়াছে। আর
ঙ ভিন্ন আর কোন পঞ্চমবর্ণের স্থলে ং ব্যবহার করিলে ঠিক উচ্চারণ হয় না। দন্ত,
কন্ঠ—লিখিলেও বাস্তবিক কোন উপকার হয় না, বরং ছাপায় দ ও ন্ত এই দুটি সীসাক্ষরের
স্থলে দ, ন, ্, ত এই চারিটী সীসাক্ষর লাগিবে, সুতরাং অপকারই হইবে। তৎপরে 'সংবৎ'
ও 'সংপ্রতি' লিখিত হয় বলিয়া যে, দংত, কংঠ, লিখিত হইবে, তাহার অর্থ কি ? 'দংত'ই
যে প্রকৃত বাঙ্গালা উচ্চারণ তাহার প্রমাণ নাই। বৈদিক মন্ত্রে ঐ সকল স্থলে ং ব্যবহার
হয় বলিয়া বাঙ্গালাতেও করা উচিত কেন ; তাহা বুঝিলাম না। তৃতীয় যুক্তি—"অন্যান্য
ব্যঞ্জনযুক্ত যুক্তাক্ষরগুলিকে (্) হস চিহ্ন ব্যবহারে ভাঙ্গিয়া লিখিয়া বিকটাকার সংযুক্তবর্ণ
গুলিকে বাদ দেওয়া যাইতে পারে, যেমন বুদ্ধি—বুদ্‌ধি। ইহাতেও উপকার নাই। একটাকে
ভাঙ্গিয়া দুই-তিনটা করিলে অসুবিধা ভিন্ন সুবিধা হয় না ; আর উচ্চারণেও দোষ
পড়ে, 'বুদ্ধি' উচ্চারণে দ এর যতটুকু উচ্চারণ হয়, বুদ্‌ধি উচ্চারণে ততটুকুর অনেক বেশী
উচ্চারিত হয়, ইহা সর্ব্বথা স্বীকার্য্য।—চতুর্থযুক্তি — "ক্র, ত্র, ন্ত্র, স্ত্র, প্রভৃতিকে ক্র, ত্র, ংত্র
সত্র প্রভৃতি আকারে লেখা যায়।"—এরূপে লেখা যায় বটে, কিন্তু সুবিধা কোনটা ? পঞ্চম-
যুক্তি "রেফযুক্ত বর্ণের দ্বিত্ব আদেশ সংস্কৃতেও বিকল্পে হয়, সুতরাং তাহা ত্যাগ করা যায় ;
কর্ম্মকে 'কর্ম' লিখিলে হানি হয় না।" এই যুক্তিটিই সর্ব্বথা স্বীকার্য্য, ইহা গ্রাহ্য করা যাইতে
পারে। ৬ষ্ঠ যুক্তি— 'ক্ষ' ও 'জ্ঞ' এই দুইটি যুক্তবর্ণ রাখা আবশ্যক।" কেন ? 'ক্‌ষ' ও 'জ্‌ঞ'
লিখিলে ওরূপ উচ্চারণ হয় না বলিয়া, কেমন ? বেশ কথা ! কিন্তু সম্পাদক মহাশয়।
অন্য যুক্তবর্ণগুলিসম্বন্ধে একটি কথা বলি, বলুন দেখি. যদি দুই-তিনটা বর্ণ একত্র সংক্ষেপে
লিখিতে পারা যায়, তবে বেশী সহজ হয়, না সেই দুই-তিনটা বর্ণ ছাড়াইয়া লিখিতে
সহজ হয় ? তিনটা বর্ণ স্থলে একটা রাখিলে খরচ কম হয়, না তিনটা রাখিলে খরচ
কম হয় ? "একেতো বাঙ্গালার অক্ষর লিখন কোন মতেই দ্রুত হয় না ; কারণ, ইহার বর্ণগুলি
বহুকোণবিশিষ্ট * * * * ইহা লিখিতে যত অধিকবার কাগজহইতে কলম স্বতন্ত্র করিয়া
লইতে হয়, এত আর কোন অক্ষরে হয় না।" (১১৪ পৃষ্ঠায় দ্বিজেন্দ্র বাবুর ২য় যুক্তি দেখ)

---

* যাঁহারা হ্রস্ব ও দীর্ঘ উচ্চারণ কমাইতেচেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারা এটুকুর আবশ্যকতা স্বীকার করিবেন না,কিন্তু অন্তঃস্থ ব এর উচ্চারণ ও আকার, বাঙ্গালায় লুপ্ত হওয়ায়,কতকগুলি বৈদেশিক শব্দ লিখিতে বড় গোল লাগে ; যেমন—ওয়াজিদ্‌আলী—বাজিদ্‌আলী, Webber ওয়েবার-বেবার ইত্যাদি। বাঙ্গালাতেও অন্তঃস্থ বএর উচ্চারণ যে স্বতন্ত্র নাই তাহা নহে ; যথা—আহ্বান, জিহ্বা, গজসাহ্বয় ইত্যাদি।

সুতরাং যদি একটা যুক্তাক্ষর লিখিয়া ৩টা বহুকোণবিশিষ্ট বর্ণের হাতহইতে উদ্ধার পাওয়া যায়, সেটা কি বাঞ্ছনীয় নয়? ইহার স্বরূপতা তাঁহারাই প্রদত্ত উদাহরণ হইতে দেখাইতেছি; যথা,— ঊর্দ্ধ =ঊর্দ্ধ্ব! সম্পাদক মহাশয় হয়ত বলিবেন, ঊর্দ্ধ শব্দকে (নবমতে) ঊর্ধ লিখিলেই চলিবে, তাহা হইলে আমি নাচার, কারণ, এরূপে যদি সংস্কৃত শব্দগুলিকে নিভাজ বাঙ্গালা শব্দে পরিবর্ত্তিত করিয়া অসংস্কৃত করা হয়, তাহা হইলে, সে সংস্কারকে যথেচ্ছাচার ভিন্ন আর কি বলিব? আর সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে যে সকল পদ সিদ্ধ হয়, তাহাদিগকে বাঙ্গালায় উল্টাইয়া দিতে কাহারও অধিকার নাই; কারণ সংস্কার বাঙ্গালা ভাষাতেই আবশ্যক, সংস্কৃতে নহে। আর যদি কেহ এরূপ দুরাকাঙ্ক্ষ হন যে, যতগুলি সংস্কৃত শব্দ বাঙ্গালায় আছে, সেগুলি ক্রমে ভাঙ্গিয়া বাঙ্গালা করিয়া ফেলিব,—তাঁহার কথা আমরা গ্রাহ্য করিব না; কারণ, তাহা হইলে বর্ণমালা, বানান-প্রণালী, ব্যাকরণ, অভিধান কিছুই টিকিবে না। এক কথায়—একটি সম্পূর্ণ নূতন ভাষা গঠিত হইবে। সম্পাদক মহাশয়! আপনার পৃষ্ঠপোষক সংস্কারকগণের উদ্দেশ্য তাহাই না কি?

তৎপরে সিংহ মহাশয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে একটা 'ব' ও 'ঞ' বাদ দিয়াছেন। এ সম্বন্ধে আমরা মন্তব্য দিয়াছি।

তৎপরে ইন্দ্রনাথ বাবুর মত। ইন্দ্রনাথ বাবু 'পরের পোষাক' গায়ে দিতে ততটা রাজী নহেন (১১১ পৃ)। তিনি বলেন—১। "এক একটি বর্ণ একটি একটি পৃথক ধ্বনির দ্যোতক মাত্র। * * * যতগুলি ভাষার শব্দ এই বাঙ্গালা ভাষায় আসিয়া স্থানলাভ করিতেছে, ততগুলি ভিন্ন জাতীয় ধ্বনিও বাঙ্গালায় প্রয়োগ করা আবশ্যক হইতেছে, অথচ দেশের প্রকৃতি বশতঃ সেই সকল ভিন্ন ভাষার ধ্বনি অবিকল তিষ্ঠিতে পারে না; ধ্বনির অল্প বিস্তর বিকৃতি-ঘটিয়া থাকে, তাহার ফল এই হয় যে, কোন এক ভাষার বর্ণমালাই যথারূপে এই মিশ্র ভাষার প্রয়োজন সাধন করিতে পারে না এবং সকল ভাষার বর্ণমালা একত্র করিলেও সে প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে পারে না"।

সম্পাদক মহাশয়! ইন্দ্রনাথ বাবুর কথা অতি খাঁটি, তিনি বুঝিয়াছেনও ঠিক; কিন্তু কি দুঃখে যে বর্ণমালা সংস্কার করিতে চাহিয়াছেন, তাহা আমরা ভাবিয়া পাইলাম না; কারণ, তিনিই বলিতেছেন যে, সকল ভাষার বর্ণমালা একত্র করিলেও মিশ্র ভাষায় মিশ্রিত বিদেশীয় বিজাতীয় কথাগুলির ধ্বনিপ্রকাশে সম্যক্ সুবিধা হয় না, তখন যাহা আছে, তাহারও দুই-দশটা বাদ দিয়া আরও সাধ করিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়ি কেন? এখন জ ও য আছে বলিয়াই সংস্কৃত 'জপ' ও 'যাপন' শব্দ স্পষ্ট লিখিতে পারি; ইংরাজী 'z' বর্ণটিকে 'জ' দিয়া কতকটা লিখিতে পারি; পারসী 'জরুরী' শব্দ কতকটা লিখিতে পারি। এখন 'জ' যদি ত্যাগ করা যায়, তবে অতটুকু সুবিধাও যাইবে। ঐরূপ শ, ষ, স ও ণ, ন সম্বন্ধেও উদাহরণ দেওয়া যায়! আরও এক কথা এক একটি বর্ণদ্বারা যদি পৃথক পৃথক্ ধ্বনির দ্যোতকতা প্রকাশ করিতে হয়, তাহা হইলে, অক্ষর কমাইয়া দিলে লাভ কি? 'শান্তি' শব্দে শ ও 'স' এর উচ্চারণ ভিন্নতা কিরূপে রাখা যাইতে পারে? 'স্পষ্ট' শব্দে 'স" ও 'ষ' এর উচ্চারণের প্রভেদ কিরূপে থাকে? 'কষ্ট' শব্দের 'ষ' কোথা পাইব? 'যখন' শব্দের 'য' ও 'ভাজ্‌ত' শব্দের 'জ' রাখিবার আবশ্যক নাই কি?

২। ইন্দ্রনাথ বাবুর দ্বিতীয় যুক্তি (১১২ পৃ) ইতিপূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে।

৩। ইন্দ্রনাথ বাবুর তৃতীয় যুক্তিতে হ্রস্ব ও দীর্ঘস্বর রাখিবার আবশ্যক নাই; কারণ, উহারা বিভিন্ন স্বরের দ্যোতক নহে। "বোসেদের হরি ও ঘোষেদের হরির" ন্যায় তাহাদিগকে হ্রস্ব ও দীর্ঘ বলিয়া বিশেষণে বিশেষিত করিয়া চিনিতে হয়। আমি বলি হ্রস্ব ও দীর্ঘ

স্বরের বিভিন্ন দ্যোতকতা বাঙ্গালায় আছে, প্রাচীন পঞ্চানন্দের ফোগ্‌লা গালে তাহা উচ্চারিত হয় না; বলিয়া ভাষায় থাকিবে না কেন? ইন্দ্রনাথ বাবু কাহাকেও মাইকেলের 'মেঘনাদবধ' কাব্যখানি পড়িয়া শুনাইতে বলিবেন. তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবেন যে 'বীচি-মালা' শব্দে 'ি ও ী-কারে স্বরভেদ হয় কি না? কাব্য যাউক, চলিত কথায় 'জীবনী-শক্তি', 'সঙ্গীত-ধ্বনি' ও প্রতিকূলতা-প্রভৃতি স্থলে উচ্চারণ-পার্থক্য লক্ষ্য করিতে পারিবেন। আরও যদি ও ঘোষেদের হরি ও বোসেদের হরি বলিয়া দুই হরিকে চিনিতে না চাহেন, তবে কি পাড়ায় দুই হরির থাকিবার আবশ্যকতা নাই? পঞ্চানন্দের কি ইচ্ছা যে, হয় ঘোষেদের না হয় বোসেদের হরির ঘাড় মট্‌কাইয়া কমাইয়া দিবেন! বাঙ্গালা ভাষাহইতে সংস্কৃত শব্দগুলিকে কি গোল্লায় দিবেন?

৪। ইন্দ্রনাথ বাবুর চতুর্থ যুক্তি (১১২ পৃ) 'ঋ' কে 'রি করা যাইতে পারে। আমি বলি—তাহা পারে না. যেমন—'তৃ' যাহা 'ত্‌রি' তাহা নহে, কারণ ত্‌রি=ত্রি। ইন্দ্রবাবু বোধ হয় "মৃত্যুকে বড় ঘৃণা করেন', তাই 'ম্রিত্যু' বা 'ম্রিণা' বলিতে চাহেন? কিন্তু বোপদেব বা পাণিনি কেহই তাহাহইতে দিবেন কেন? ৯ সম্বন্ধে পূর্ব্বে বলা গিয়াছে।

৫। ইন্দ্রনাথ বাবু 'বধূ ঠাকুরাণীকে' লইয়া বড় বিব্রত। তিনি "বউ" না "বউ" কি "বৌ" বলিয়া ডাকিবেন, তাহা ভাবিয়া পান না, বা তাঁহার পণ্ডিত, মহাশয়েরাও বলিয়া দিতে পারেন নাই। আমি বলি—'বউ' বলাই যুক্তিসঙ্গত; কারণ "বধূর" ধ. তুলিয়া দিলে "ঽউ" থাকে, কিন্তু "বউ" যখন ভাষায় চলিয়া গিয়াছে, তখন আর 'বউ'কে আনিয়া গোলমাল করিবার আবশ্যক কি? "বৌ" নাটকাদিতে চলে চলুক; কারণ, কথোপকথনের ভাষা ধরিয়া ভাষা হয় না। "ঐ" বেচারী কবিদের চাকুরী করিতে গিয়া কখন "অই" আর কখন "ওই" হন, সুতরাং বন্দোপাধ্যায় মহাশয়কে ভাবিতে হইবে না; কারণ কবিদের মাহুত অনেক কাল মরিয়া গিয়াছে।

তৎপরে ইন্দ্রনাথ বাবুর ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম যুক্তি, উচ্চারণের হিসাব লইয়া। উচ্চারণের বাঁধা-বাঁধি কোন ভাষায় হইতে পারে না, হইবেও না। সকল ভাষাতেই বানান ব্যাকরণের উপর নির্ভর করে। কোন মিশ্র ভাষার স্বর বা ধ্বনি সংখ্যা অক্ষরের সাহায্যে প্রকাশিত হইতে পারে না, ইন্দ্রনাথ বাবুও স্বীকার করেন। কথোপকথনের সময়ে অনেক মূল শব্দেরও উচ্চারণে তারতম্য ঘটে, সুতরাং সেই তারতম্য ধরিয়া মূল শব্দটিকে বিকৃত করিয়া লিখিলে, ভাষায় কোন শৃঙ্খলা থাকে না; যেমন—'আত্মা' শব্দ বাঙ্গালীরা 'আত্তাঁ' উচ্চারণ করেন, (কিন্তু হিন্দুস্থানীরা 'আৎমা' উচ্চারণ করেন)।

'খাট' কি 'খাটো', 'কাল' কি কালো, 'বার কি 'বারো' (১২) তাহা ইন্দ্রবাবুর ন্যায় আমরাও লিখিতে ইতস্ততঃ করিয়া থাকি, সুতরাং মীমাংসা করিতে তিনিও পারেন নাই, আমরাও পারি না, তবে বোধ হয়, ঐ সকল খাঁটি বাঙ্গালা শব্দের উচ্চারণ বাঙ্গালা দেশের কোন এক স্থানের কথিত উচ্চারণ অনুসারে লেখা উচিত আর সুবিধার্থ কলিকাতা বা নিকটবর্ত্তী স্থানের উচ্চারণই গ্রাহ্য। 'নিত্য' 'সত্ত্ব' প্রভৃতি স্থলে বিশৃঙ্খলা নিবারণার্থ ব্যাকরণের নিয়ম রাখা উচিত।

এতদ্ভিন্ন বানান ও যুক্তাক্ষরসম্বন্ধে ইন্দ্রনাথ বাবুর অন্যান্য যুক্তি ইতিপূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে।

সম্পাদক মহাশয়! তৎপরে সিংহ মহাশয় নিজেও কয়েকটি যুক্তি দেখাইয়াছেন, তাহার আর স্বতন্ত্র আলোচনা করিবার আবশ্যক করে না, কারণ সেগুলি পূর্ব্ব-পূর্ব্ব যুক্তির প্রতিধ্বনি-মাত্র। তবে তিনি দুইটি নূতন কথা বলিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক।

১। তিনি বলেন যে, 'রাম', 'শাল' 'হাত' 'তাপ' প্রভৃতি (১১২ পৃ) কথাগুলির শেষা-

ক্ষরটি হসন্ত করিয়া উচ্চারিত হয় কেন? আর কতকগুলি অকারান্ত শব্দ ওকারান্তের ন্যায় উচ্চারিত হয় কেন? যে শব্দটী যেরূপে উচ্চারিত, সেটির সেইরূপ উচ্চারণ বানানে প্রকাশিত হইলেই ঠিক হয়।

এ সম্বন্ধে আমরা বলি—'রাম' ও 'রাম্' শব্দের উচ্চারণে কি প্রভেদ নাই! 'শরীর' শব্দের শ কতকটা ওকারান্ত বটে; কিন্তু তাহা কি স্পষ্ট 'শো' উচ্চারিত হয়? কখনই নহে। ইহার প্রত্যক্ষ ফল, তিনি সংশোধিত বানানে লিখিত যে "শিক্‌খা" নামক রচনার একাংশ উদাহরণ দিয়াছেন, তাহাতেই সুস্পষ্ট বুঝা যাইবে।

২। তিনি বলেন,—জ্ + ঞ = গ্‌গঁ ও হ্ + য = হ্য—ঝ্য এর ন্যায় উচ্চারিত হয় কেন? এ বিসদৃশ উচ্চারণ ত্যাগ করা উচিত, কিন্তু ঐ বর্ণগুলির কি উচ্চারণ হইবে? "হ্য" কেবলই 'ঝ্য' উচ্চারিত হয় তাহা নহে—'কোন শালা লিখা হ্যায় রে' এখানে হ্যএর উচ্চারণ স্বাভাবিক।

তৎপরে দ্বিজেন্দ্র বাবুর প্রধান মন্তব্য—(১১৪ পৃ) আমাদের চক্ষু অনভ্যস্ত, কর্ণ অনভ্যস্ত, তাই এরূপ বানান দেখিলে ও যুক্তি শুনিলে প্রাণে আঘাত লাগিবে। অনভ্যস্ততার জন্য আঘাত লাগিবে বলিয়া কি মানব সমাজের হিতকর, উন্নতিকর অল্প আয়াসকর সংস্কার গ্রহণ করিবে না? পুরাতন বলিয়া, ভালবাসি বলিয়া, পূর্ব্ব পুরুষগণ ব্যবহার করিতেন বলিয়া উন্নতি-বিরুদ্ধ, অসংস্কৃত পদার্থ কি মস্তকে তুলিয়া রাখিতে হইবে? কদাপি না।"

আমরাও বলি, যে বিষয়ে চক্ষু অভ্যস্ত, কর্ণ অভ্যস্ত, যাহা ব্যাকরণ-সঙ্গত, অভিধান-সঙ্গত, আমাদের অপেক্ষা ধীমানগণের মস্তিষ্কহইতে উদ্ভূত, পুরাতন,প্রিয়; তাহা কি সামান্য ফনোগ্রাফীর জন্য ছাড়িব? ফনোগ্রাফী হয় হউক, তাহারই জন্য ভিন্ন নিয়ম হউক, কিন্তু তাই বলিয়া ভাষা-সম্বন্ধে, উচ্চারণসম্বন্ধে চিরাগত প্রথা ছাড়িব কেন? আর ছাড়িব কাহাদের জন্য? যাহারা শাস্ত্র দর্শী নহে, শাস্ত্র-শিক্ষার্থী নহে, তাহাদেরই জন্য! লাভ হইবে কি?—শব্দজ্ঞান লোপ, অর্থজ্ঞান লোপ, প্রয়োগ-জ্ঞান লোপ, ব্যাকরণ-জ্ঞান লোপ, অভিধান-জ্ঞান লোপ, যুক্তাক্ষর-লোপ ইত্যাদি।

এক্ষণে আমরাও বিদায় লইব,—সিংহাদির মতে বর্ণমালা ও বানান-সংস্কার (সংহার) হইলে শব্দ-রাজ্যে যে বিভ্রাট ঘটিবে, তাহার একটু উদাহরণ দিয়া বিদায় লইব।

১। "তিনি তথায় আহূত (নিমন্ত্রিত) হইলেন"।—অর্থে—"তিনি তথায় আহুত (দেবোদ্দেশে অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত) হইলেন।"

২। "মন্দিরে কালী (দেবী) আছে" অর্থে "মন্দিরে কালি (মসি) আছে।"

৩। "গৃহের কোণ"—অর্থে—"গৃহের কোন"।

৪। চীর (ছিন্ন বস্ত্র খণ্ড) পরিহিত" অর্থে "চির (চিরকাল) পরিহিত।"

৫। "তুলায় সূতা হয়"—অর্থে—"তুলায় (দাঁড়িপাল্লায়) সুতা (কন্যা) হয়।"

৭। "রোহিণীপতি দশাশ্ব (চন্দ্র)—অর্থে—"রোহিণীপতি দশাস্য (রাবণ)।

৮। দীননাথ (পরমেশ্বর) দীনে (দরিদ্রকে) দয়া কর"—অর্থে—"দিননাথ (সূর্য্য) দিনে (দিবসকে) দয়া কর।

৯। গ্রামের জমীদার অত্যন্ত ধনী (ধনশালী)—অর্থে—"গ্রামের জমীদার অত্যন্ত ধনি (যুবতী)।

১১। "ঊর্দ্ধগ-রোগে সর্ষপ তৈলের নাস (নস্য) করা কর্ত্তব্য"—অর্থে—"ঊর্দ্ধগরোগে সর্ষপ তৈলের নাশ (ধ্বংশ) করা কর্ত্তব্য।"

১২। "তাঁহার ন্যায় বলী (বলবান) দেখা যায় না"—অর্থে—তাঁহার ন্যায় বলি (পূজার্দ্রব্য বা পূজায় হননযোগ্য পশু) দেখা যায় না।"

১৩। "বাণ (শর) অতি বেগে আসিতেছে"—অর্থে—"বান (বন্যা) অতি বেগে আসিতেছে।"

১৪। "বামাক্ষী (সুন্দরী) রমণীগণ—অর্থে—বামাক্ষি (বাম চক্ষু) রমণীগণ।

১৫। "বীণা (বাদ্য-যন্ত্র) অতি সুস্বরন্নাদ্য"—অর্থে—বিনা (ব্যতীত) অতি সুস্বর বাদ্য।

১৬। "বৃষের (ষণ্ডের) শৃঙ্গ আছে"—অর্থে—"বৃশের (মুষিকের) শৃঙ্গ আছে।"

১৭। "অদ্য হইতে সপ্ত (সাত) দিন"—অর্থে—"অদ্য হইতে শাপ্ত (অভিশপ্ত) দিন।"

১৮। "সে সাপ (সর্প) দেখিয়াছে—অর্থে—সে শাপ (অভিশাপ) দেখিয়াছে।"

১৯। গোয়ালা সঙ্কর (মিশ্রোৎপন্ন) জাতি—অর্থে—"গোয়ালা শঙ্কর (শিব) জাতি?"

২০। "সূচি (ছুঁচ) দ্বারা সেলাই করে"—অর্থে—"শুচি (পবিত্র) দ্বারা সেলাই করে।

কেহ কেহ বলিবেন,—"ইহাতে আর আপত্তি কেন? বাঙ্গালায় এখনও একই বানানে দ্বিবিধ ত্রিবিধ অর্থ-প্রকাশক শব্দ এবং বিভিন্ন বানানে একই অর্থ-প্রকাশক শব্দ যথেষ্ট আছে, না হয় সেই দুই শ্রেণীতে আর কতগুলি বাড়িবে!" আমরা বলি,—"ভাল করিব না, মন্দ করিব; কি দিবি তা দে?"—ইহাও সেইরূপ যুক্তি। গোলমাল যাহা আছে, তাহা মিটাইতে পারিব না, কিন্তু কতকগুলি বাড়াইয়া দিব। কেমন?

সম্পাদক মহাশয়! পিট্‌ম্যান ইংরাজীর বানান-সংস্কার করবার জন্যে ইংলণ্ডে আড়ে-হাতে লেগেছেন * আর বাঙ্গালায় তাঁরই অনুচর দ্বিজেন্দ্র বাবু লেগেছেন; আপনিও তার পোষকতা কর্‌ছেন। এ পোষকতায় কালে যে অনিষ্ট বই ইষ্ট ঘট্‌বে না তা, এখন বুঝ্‌লেন?

এখনও যদি বলেন,—"কৈ আর বুঝ্‌লেম?—তবে প্রণাম হই, এখন আসি। আপনাকে বুঝাবে যে, মায়ের পেটে আছে সে।

শ্রীললিতকৃষ্ণ বসু

---

* সাহিত্য-কল্পদ্রুম ২য় বর্ষ ৩৫৮ পৃষ্ঠা দেখ।

বিক্রমোর্ব্বশী।

উর্ব্বশী দেবদূতের আদেশানুসারে স্বর্লোকে গমন করিলেন। ইন্দ্রের সভায় লক্ষ্মী-স্বয়ম্বর নামক নাটক অভিনীত হইবে। উর্ব্বশী লক্ষ্মী সাজিলেন, মেনকা বারুণী সাজিল। সমবেত দর্শক-মণ্ডলীর মাঝে নাটক প্রসঙ্গে মেনকা উর্ব্বশীকে জিজ্ঞাসা করিল, "সখি, তুমি কাহার প্রতি অনুরক্তা?" উর্ব্বশী তখন ভুলিয়া গিয়াছেন যে, তিনি লক্ষ্মী সাজিয়াছেন, তাই বলিয়া বসিলেন,—"পুরুরবার প্রতি।" সভাস্থলে মহা গোলযোগ পড়িয়া গেল। নাট্যাচার্য্য মহামুনি ভরত কোপে অধীর হইলেন। তাঁহাকর্ত্তৃক শিক্ষিতা অভিনেত্রী অভিনয়ে প্রমাদ করিয়া বসিল। তিনি তখনই উহাকে শাপ দিলেন যে, তোমার দিব্যজ্ঞানলোপ পাইবে ও তুমি মানুষ-লোকে বাস করিবে। ইন্দ্র কৃপাপরবশ হইয়া বর প্রদান করিলেন যে, যেহেতু তুমি আমার প্রিয়-সুহৃৎ রাজা পুরুরবার প্রতি আসক্তা হইয়াছ, তন্নিমিত্ত ধরালোকে অবতরণ করিয়া, যতদিন তোমার সন্তানোৎপত্তি না হয়, ততদিন তাঁহার সহিত সুখে বাস করিবে। এইরূপে উর্ব্বশীর শাপে বর হইয়া গেল।

এই সকল বৃত্তান্ত কবি নাট্যাচার্য্য ভরত-শিষ্য গালব ও পেলবের কথোপকথনচ্ছলে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

এদিকে রাজার কথা অবজ্ঞা করিয়া চলিয়া যাইবার পর, রাজ্ঞী ঔশীনরী কঞ্চুকী-প্রমুখাৎ রাজাকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, সেই দিবস রজনীযোগে প্রিয়-প্রসাদন নামক ব্রত সমাধান-জন্য তিনি রাজার সহিত মণিহর্ম্ম্য-পৃষ্ঠে সাক্ষাৎ করিবেন।

সন্ধ্যা হইয়াছে। প্রাসাদ রমণীয় ভাব ধারণ করিয়াছে; তাই কঞ্চুকী সে শোভা দেখিয়া মনের উচ্ছ্বাসে বলিয়া ফেলিল;—

"উৎকীর্ণাইব বাসযষ্টিষু নিশানিদ্রালসা বর্হিণো
ধূপৈর্জালবিনিঃসৃতৈর্বড়ভয়ঃ সন্দিগ্ধপারাবতাঃ।
আচারপ্রযতঃ সপুষ্পবলিষু স্থানেষু চার্চ্চিস্মতীঃ,
সন্ধ্যামঙ্গল-দীপিকাঃ বিভজতে শুদ্ধান্তবৃদ্ধো জনঃ।"

(বি, উ, তৃতীয় অঙ্ক)

সন্ধ্যার নাতি-ঘোর অন্ধকারে সকল বস্তু রমণীয় দেখাইতেছে। ময়ূরগণ নিস্পন্দভাবে স্ব-স্ব বাসস্থানে বসিয়া আছে; বোধ হইতেছে যেন উহারা জীবিত ময়ূর নহে; কে যেন উহাদিগকে দেওয়ালে খোদিত করিয়া রাখিয়াছে। সন্ধ্যার ধূপ ও গন্ধ দানের ধূম জানালাহইতে বিনিঃসৃত হইয়া ছাদের উপর উঠিতেছে, বোধ হইতেছে যেন, অসংখ্য পারাবত, রজনী হইয়া আসিল বলিয়া, ছাদের উপরিস্থ চীলে-ঘরে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত দ্বন্দ্ব করিতেছে। অন্তঃপুরের কঞ্চুকিগণ পুষ্পোপহারে শোভিত হইয়া পূজা করিবার স্থানে মঙ্গল-দীপ প্রদান করিতেছে।

সন্ধ্যার রমণীয়তা সকলকেই সুখী করে। কবিহৃদয় নিসর্গ-শোভানুভবের অধিক বশবর্ত্তী। নিসর্গ-শোভা কবি-হৃদয়ের সমস্ত হৃদয়-তন্ত্রী বাজিয়া উঠে; তাই সন্ধ্যাকালের দৃশ্য বস্তু সমূহের শোভা বর্ণনা করিতে কবিদিগের এত প্রসক্তি। সেক্ষপীয়র মিল্টন, বাল্মীকি-প্রভৃতি কবিগণ সন্ধ্যা ও রাত্রিকালের কেমন সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন। কালিদাস স্বভাব-কবি, তিনি এবিষয়ে পশ্চাৎপদ হইবার নহেন। নিসর্গ শোভার পুঙ্খানুপুঙ্খ-বর্ণনে কালিদাসের

নিকট প্রায় সকল কবিই হার মানিয়া যান। প্রকৃতি-শোভার পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করিয়া দেখিবার অসাধারণ ক্ষমতা কালিদাসের যেমন দেখা যায়, সেই শোভার গাম্ভীর্য্যের সম্পূর্ণতা একেবারে অনুভবের ক্ষমতা, তাঁহার তেমন দেখা যায় না! যখন ভাবের উচ্ছ্বাসে মিল্টন বলিয়া উঠিলেন;—

"——The greyhooded even.
Like a sad votarist in Palmer's weeds
Rose from the hindmost wheels of Phœbus wain."

COMUS.

তখন বুঝা যাইতেছে তিনি সন্ধ্যাকালের সম্পূর্ণ ভাবটুকু একেবারে অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন। প্রকৃতির গাম্ভীর্য্য দেখিয়া তাঁহার মন একেবারে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সেই শোভা-পরিদর্শন করিবার সময় ও প্রবৃত্তি তাঁহার ছিল না। তেমনি মহাকবি সেক্ষপীয়র যখন লোরেঞ্জোর মুখে এই কথা বলিয়াছিলেন,—

"How sweet the moonlight sleeps upon this bank" &c.

MERCHANT OF VENICE.

তখন রজনীর স্নিগ্ধ চন্দ্রালোকে দৃশ্য বস্তু সকল কি কি ভাব ধারণ করিয়াছিল, তাহা বর্ণনা করিবার সময় তাঁহার ছিল না। তেমনই আদি-কবি বাল্মীকি যখন সুন্দরকাণ্ডের পঞ্চম সর্গের প্রথম হইতে দশম শ্লোক-যাবৎ বলিয়া উঠিলেন;—

"চন্দ্রোঽপি সাচিব্যমিবাস্যকুর্ব্বন্,
তারাগণৈর্মধ্যগতো বিরাজন্।

* * *

জ্যোৎস্নাবিতানেন বিপত্য লোকা-
নুত্তিষ্ঠতে হনেকসহস্ররশ্মিঃ॥

(রামা, সু, কা, ১—১০)

তখন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে শোভা বর্ণনা করিবার অবকাশ তাঁহার হয় নাই। কালিদাস প্রকৃতির গাম্ভীর্য্য একেবারে অনুভব করিতে পারিতেন না; সেই নিমিত্ত সন্ধ্যাকালে দৃশ্য-বস্তু সকলের পরিস্ফুট চিত্র আঁকিয়া সন্ধ্যার পূর্ণ ছবি আঁকিলেন!

যাহা হউক, রাজা সাদরে মহিষীর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন,—ইহা বলিয়া পাঠাইলেন।

ইত্যবসরে রাজা বিদূষককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজ্ঞীর এরূপ আচরণের কারণ কি?" বিদূষক প্রাকৃত ব্যক্তি, তাই উত্তর করিল; "বোধ হয়, আপনার প্রণিপাত উল্লঙ্ঘন করিয়া যাওয়ার পর মহিষীর মনে অনুশোচনা হইয়া থাকিবে, তাই তিনি ব্রত-ব্যপদেশে আপনার প্রসাদন করিতে আসিবেন বলিয়া পাঠাইয়াছেন।" রাজাও সেই কথায় সায় দিলেন।

অতঃপর নির্দ্দিষ্ট সময়ে রাজা বিদূষক-সমভিব্যাহারে মণিহর্ম্ম্য-পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। এ স্থানে কবি অতি সুন্দররূপে চন্দ্রোদয় বর্ণনা করিয়াছেন। বিদূষক বলিল,—"শীঘ্রই চন্দ্রের উদয় হইবে, যেহেতু পূর্ব্বদিগ্‌ভাগ ক্রমশঃ আলোহিত-প্রভ হইয়া উঠিতেছে—পচ্চাসন্নেন চন্দেন হোদব্বং জধা তিমিরেণ রেচীঅমাণং পুব্বসি সামুহং আলোহিতা প্পহং দীসদি।"

রাজা বলিলেন সত্য বটে;—

"উদয়গূঢ়শশাঙ্কমরীচিভি-
স্তমসি দূরতরং প্রতিসারিতে!

অলকসংযমনাদিবলোচনে,
হরতি বো হরিবাহনদিঙ্‌মুখম্‌ ॥”

অর্থাৎ যেমন সুন্দরী রমণীর মুখমণ্ডল কুন্তল-কলাপে আচ্ছাদিত হইলে, কুন্তল-কলাপমোচনে ক্রমশঃ দৃশ্যমান হয়, সেইরূপ পূর্ব্বদিক্‌-সুন্দরীর আগমনীভূত চন্দ্রমণ্ডল অন্ধকাররূপী কেশ-কলাপ অপনোদনে ক্রমশঃ প্রকাশমান হইতে লাগিল।

বিদূষক ভাবগ্রাহী নহে, সেই জন্য রাজার এ উপমা তাহার মনোনীত হইল না। বিদূষক ঔদরিক, আহারীয় সামগ্রীর চিন্তা তাহার মনে সদাই জাগরিত, তাই সে বলিয়া উঠিল,—“হী হী ভো ভো এসো খণ্ড মোদঅ সরিসো উদিও রাজা ওষধীণং।”

এই সকল কথোপকথনের কিয়ৎকাল পরে মহিষী ঔশীনরীর মহানুভবতার পরিচয় দিয়া, কবি তদীয় মহত্ত্বের সাতিশয় ঔৎকর্ষ্য-সাধন করিয়াছেন। কবি ও চিত্র-শিল্পীর ক্ষমতায় অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। কোন্‌টী কোনখানে দিলে ভাল দেখায়,ইহা কবিরও যেমন লক্ষ্য; চিত্র-শল্পীরও তাহাই, কোথায়, কোন জমীর উপর, কি চিত্র আঁকিলে,কেমন দেখায়, উভয়েরই তাহা দর্শনীয়। ইউরোপ বা ভারত যে কোন দেশের কবিদিগের গ্রন্থ দেখা যাউক না কেন, ইহা স্পষ্ট প্রতীতি হইবে যে, সকলেই একই উপায়ে আপনাদিগের প্রতিভা দেখাইয়া পাঠকদিগের মনোহরণ করেন। কলিমাময় জমীর উপর শঙ্খধবল ছবি আঁকা কবিরও যেমন লক্ষ্য; চিত্র-শিল্পীরও তাহাই। জগতের উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট নাটকে এই পন্থার নিদর্শন পাওয়া যায়। যখন আইয়াগোর কুটিলতা-পূর্ণ অন্তঃকরণ আঁকিয়া সেক্ষপীয়র ওথেলো-চরিত্রের মহানুভবতা ব্যক্ত করিলেন, তখন তথায় এই পন্থার নিদর্শন দেখিতে পাই; আর যখন মিটলস, সিম্বর প্রভৃতি সিজর-হন্তারক প্রধান মন্ত্রণাকারিদিগকে ‘সূর্য্য উঠিল কি না’ এই তর্কে ব্রুটস-ভবনে আবদ্ধ রাখিয়া ব্রুটস ও ক্যাসিয়সের গভীর মন্ত্রণার গাম্ভীর্য্য বৃদ্ধি করা হইয়াছে, তখনও এই পন্থা পরিলক্ষিত হয়; আবার যখন কৈকেয়ী-চরিত্রের কুটিলতা আঁকিয়া রাম ও ভরত-চরিত্রের উৎকর্ষতা সম্পাদন করা হইয়াছে, তখনও এই পন্থার নিদর্শন বৈ আর কি?

রাজা মহিষীর অনুরোধে মণিহর্ম্ম্য-পৃষ্ঠে আসিলেন বটে; কিন্তু তাঁহার মন পড়িয়া আছে উর্ব্বশীর দিকে, তাই তখনই উর্ব্বশীর কথা পাড়া হইল; রাজা-কামী, তাঁহার বিচার-শক্তি আয়ত্ত নাই আর সেই জন্যই তিনি আকার-ইঙ্গিতে লোকের মনোগত ভাব বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। উর্ব্বশী যে তাঁহার প্রতি একান্ত আসক্ত, তাহা তাঁহার সম্যক্‌ হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। রাজা যত বিরহ-কাতরতা দেখাইতে লাগিলেন, বিদূষক ততই তাঁহাকে আশ্বাস-বাক্যে আশ্বস্ত করিতে লাগিল এবং বলিল যে, উর্ব্বশী যেরূপ ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে তৎ-প্রাপ্তি বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু “তাএ তারিসং অনুরাঅং পেক্‌সিঅ সং কুথু আশাবন্ধেন অত্তাণং ধারিদুং।” এস্থলে বিদূষক আপনার লোক-চরিত্র বুঝিবার শক্তি দেখাইয়া রাজা অপেক্ষা নিঃসন্দেহে বাহাদুরী লইয়াছে। রাজার দক্ষিণ বাহু স্পন্দিত হইতে লাগিল। বিদূষক ব্রাহ্মণত্ব ফলাইয়া বলিল, “অচ্ছরেম্মিং সমাগমং সে পেক্‌খামি”—অচিরেই উর্ব্বশীর সহিত আপনার সমাগম হইবে।”

মুহূর্ত্তেই বিরহ-কাতরা উর্ব্বশী অভিসারিকাবেশে চিত্রলেখার সহিত রাজ-ভবনাভিমুখে বিমানমার্গে আগমন করিতে লাগিলেন।

চিত্রলেখার চরিত্রাঙ্কণে কবি বেশ নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন। উর্ব্বশী চিত্রলেখাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাঁহাকে অভিসারিকা-বেশে কেমন দেখাইতেছে। চিত্রলেখা উত্তর করিল, “ণথি বাআ বিহবো পসংসিদুং ইদংতু চিন্তেমি অবিণাম অহংজ্জেব পুরুরবা ভবেঅংত্তি”—কি বলিব, এত ভাল দেখাইতেছে যে, আমার ইচ্ছা হয়, আমিই রাজা পুরুরবা হই।” চিত্রলেখা

দূতীর শিরোমণি; নাটকে যখনই চিত্রলেখার আবির্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, তখনই তাহার একটা না একটা মধুর কথা শুনা যায়। চিত্রলেখা-চরিত্রে বেশ একটী নিজস্ব ভাব (Personality) আছে। যাহা চিত্রলেখার বাক্য বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে, তাহা নাটকের উর্ব্বশীপ্রভৃতি অন্য নায়কনায়িকার মুখে সাজে না। আলঙ্কারিকেরা দূতীকে তিন শ্রেণীতে বিভাগ করিয়াছেন; চিত্রলেখা নিসৃষ্টার্থা-শ্রেণীর অন্তর্গত। যে দূতী নায়কনায়িকার মনোগত ভাব অনুমানে বুঝিয়া উত্তর প্রদান করিতে পারে ও সুচারুরূপে স্বকার্য্য সাধন করিতে পারে, সেই দূতীই নিসৃষ্টার্থা-পদবাচ্যা, যথা;

“উভয়োর্ভাবমূন্নীয় স্বয়ং বদতি চোত্তরং।
সুশ্লিষ্টং কুরুতে চার্থং নিসৃষ্টার্থা তু সা স্মৃতা ॥”

চিত্রলেখার এ গুণটী বেশ আছে, তাই এরূপ সুন্দর পরিহাস-পূর্ণ উত্তর দিল।

ক্রমে উভয়ে যেখানে রাজা ও বিদূষক বসিয়াছিলেন, সেই মণিহর্ম্ম্য-পৃষ্ঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইত্যবসরে পথিমধ্যে উর্ব্বশী যখন একান্ত উতলা হইয়া চিত্রলেখাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, রাজা এখন কি করিতেছেন, তখন চিত্রলেখা উর্ব্বশী হৃদ্‌গতভাব জানিবার নিমিত্ত উত্তর করিল যে, তিনি মহিষীর সহিত সঙ্গত হইয়া সুখে কাল হরণ করিতেছেন। যাহা হউক, উর্ব্বশী সে কথায় বিশ্বাস করিলেন না, সখী-সমভিব্যাহারে অন্তরালে থাকিয়া রাজা ও বিদূষকের কথোপকথন শুনিতে লাগিলেন।

রাজা স্বীয় বিরহবেদনার কথা বিদূষককে বলিতে লাগিলেন। সুস্নিগ্ধ চন্দ্রালোকে তাঁহার মদন-ব্যাধি উপশান্ত না হইয়া বরং উত্তোরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। রাজা বিদূষককে বলিতে লাগিলেন, যে উর্ব্বশী সংক্রান্ত বাক্যালাপই তাঁহার মদনব্যাধির প্রধান ঔষধ; কিন্তু বিদূষক অপরের হৃদয়-বেদনা বুঝিয়াও বোঝে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, গভীর শোক বা দুঃখের সহিত বিদূষকের সহানুভূতি বড়ই অল্প, তাই বলিয়া উঠিল যে, “সখে যথার্থই বলিয়াছ, আমিও যখন অত্যন্ত ক্ষুধার্থ হই, তখন অভ্যবহার্য্য বস্তুর স্মরণ করিলে, আমার ক্ষুধার উপশম হয়—“আং ভো অথপ্পি জদা সিহরিণীং রসালং অণহে তদা তং লজ্জেব চিন্তঅন্তো আসাদেমি সুহং।” বিদূষকের নর্ম্মালাপের কালাকাল বিচার নাই। সকল বাক্যই দেশকাল পাত্রভেদে প্রয়োগ করা চাই। বিদূষকের সে জ্ঞান নাই। এই নিমিত্ত সকল সময়ে বিদূষকের কথা ভাল লাগে না।

রাজার বিরহ-বেদনার কথা শুনিয়া উর্ব্বশী প্রথমে মনে করিলেন যে, বুঝি রাজা অন্য নারীর প্রতি আসক্ত যাহা হউক, রাজা যখন বিমানগামী দৈত্য-পরাজয় ও রথারোহণে উর্ব্বশীর অঙ্গস্পর্শ-সুখের কথার উল্লেখ করিলেন, তখন উর্ব্বশীর মন আশ্বস্ত হইল। উর্ব্বশী আহ্লাদে অধীরা হইয়া, রাজার সম্মুখীনা হইতে যাইবেন, এমন সময়ে সখীগণ মহিষীর আগমন-বার্ত্তা সূচনা করিল। উর্ব্বশী ও চিত্রলেখা পূর্ব্ববৎ অন্তরালে থাকিয়া গেলেন। এদিকে চন্দ্র ও রোহিণীযোগ সময়ে রাজ্ঞী প্রিয়-প্রসাদন নামক ব্রত করিতে উপস্থিত হইয়াছেন। রাজা ও বিদূষক পরস্পর বলাবলি করিতেছেন যে, রাজ্ঞী অনুতপ্তা হইয়া রাজাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য ব্রতের ভাণ করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। এমন সময়ে রাজ্ঞী আসিয়া রাজার চরণ-বন্দনা করিলেন। রাজা সাদরে রাজ্ঞীকে উপবেশন করাইলেন। রাজ্ঞীর দেহশ্রী অনিন্দনীয়া। উর্ব্বশী অন্তরালে থাকিয়া এবিষয়ে তাঁহার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না—“ঠ্ঠানে ইঅং হি দেই সদ্দেন উচ্চরীঅদিণ কিম্পি পরিহীঅদি শচীদো ওজস্মিদাএ”। রাজ্ঞী তখনই রাজাকে স্বকার্য্য জ্ঞাপন করিলেন যে, তিনি রাজাকে সম্মুখে রাখিয়া প্রিয়-প্রসাদন নামক ব্রত সম্পাদন করিবেন। চাটুকারিতায় ও হৃদয়ের ভাব সংবরণে

রাজা বিলক্ষণ পটু ; অন্তরে যাহাই হউক না কেন, বাহিরের শিষ্টাচারে তাঁহাতে কোন দোষ ধরিবার যো নাই। এতদ্দেশীয় কবিগণ রাজ-চরিত্রকে চাটুভাষী ও শিষ্টবচন-কুশল করিয়া আঁকিয়াছেন। অন্য নারীর প্রতি আসক্ত হইলেও বাহিরের ভাবভঙ্গী ও কথায়-বার্ত্তায় নাটকীয় রাজগণ এরূপ দেখান যে, যেন তাঁহারা মহিষীভিন্ন আর কাহাকেও জানেন না। সত্য বটে, শকুন্তলার রাজচরিত্রে ততটা দোষ ধরা যায় না, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার দোষ একেবারে নাই, তাহা কি করিয়া বলি। তাঁহারও অবরোধে নারীর অভাব ছিল না ; তবে কেন তিনি ঋষি-কন্যা শকুন্তলাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন,—"দূরীকৃতাঃ খলু গুণৈরুদ্যানলতাঃ বনলতাভিঃ।" কবি রাজার দোষ কিয়ৎ পরিমাণে ক্ষালণ করিবার নিমিত্ত ঐ স্থানে বলিয়াছেন, "সতাং হি সন্দেহপদেষু বস্তুষু প্রমাণমন্তঃ করণপ্রবৃত্তয়ঃ"; কিন্তু ইহাতে দোষ সম্পূর্ণরূপে ক্ষালন হইল কৈ? মালবিকাগ্নিমিত্রেতেও কালিদাস রাজচরিত্রকে এইরূপে আঁকিয়াছেন, তথায় রাজা রাজ্ঞী ইরাবতীর প্রতি কপটপ্রেম প্রদর্শন করিতেছেন ! কিন্তু বাস্তবিক তাঁহার মন পড়িয়া আছে মালবিকার দিকে ! এখানেও কালিদাস রাজপক্ষ-সমর্থন করিবার নিমিত্ত বলিয়াছেন,

"প্রতিপক্ষেণাপি পতিং সেবন্তে ভর্তৃসেবনাঃ নার্য্যঃ।
অন্যসরিতামপি জলং সমুদ্রগাঃ প্রাপয়ন্ত্যদধিং ॥"

সরিদ্‌গণ যেমন আপনারা সমুদ্রাভিমুখে ধাবমানা হয় ও সঙ্গে সঙ্গে অন্য সরিদ্‌গণকেও তদভিমুখে লইয়া চলে, সেইরূপ স্বামী অন্য প্রেমে আসক্ত হইলেও, তাঁহার ঈপ্সিতা নারীর সহিত মিলনে বাধা দেওয়া সাধ্বী স্ত্রীর উচিত নহে।

নাটকে এই প্রকার ভূরি দৃষ্টান্ত পাঠে ইহা প্রতীতি হয় যে, এদেশে স্ত্রীমর্য্যাদা অনেক দিন হইতে লোপ পাইয়াছিল ; পুরুষের ব্যভিচার ব্যভিচার বলিয়া গণ্য হইত না। সত্যবটে, মহাভারত-প্রভৃতি গ্রন্থে স্ত্রীমর্য্যাদার বিশেষ প্রশংসা করা হইয়াছে ; কিন্তু মনু ও মহাভাতরের কাল অনেক প্রাচীন। বহুকাল হইতে পুরুষের বহুবিবাহ ও ব্যভিচার দোষের মধ্যেই নয় বলিয়া, চলিয়া আসিতেছে ; রাজাদিগেরতো কথাই নাই ! সেই নিমিত্ত প্রাচীন সংস্কৃত নাটকে অধুনাতন সুরুচি-বিরুদ্ধ এই সকল দৃষ্টান্ত ভূরিপ্রমাণে পরিলক্ষিত হয়। কালিদাস ভারতীয় কবিশ্রেষ্ঠ, কিন্তু তাই বলিয়া তৎসাময়িক আচার বা কুসংস্কারহইতে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মুক্ত করিতে পারেন নাই ; তিনি তাঁহার সকল নাটকেই রাজচরিত্রকে এই একই ভাবে আঁকিয়াছেন; কেবল স্বীয় অসাধারণ প্রতিভা বলেই, রাজরে এরূপ আচরণ যে ভাল নয়, তাহা কিয়ৎপরিমাণে বুঝিয়াছিলেন ; তাহা না হইলে, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে তাঁহার প্রধান প্রধান নাটকের রাজচরিত্র সমর্থন করিবার জন্য প্রয়াস পাইতেন না। উচ্চ ধর্ম্মনীতির সহিত শ্রেষ্ঠতম কবিত্ব-শক্তির অতি নিকট সম্পর্ক। যাহা কবিত্বাংশে জগতের উৎকৃষ্ট কাব্য, তাহা ধর্ম্মবিজ্ঞানানুসারে হীন নহে। এই নিমিত্ত জগতের উৎকৃষ্ট কাব্যে উচ্চ ধর্ম্মনীতির কথা মিলে। কেবল অশ্লীলতাময় কুরুচিপূর্ণ ও ঘোর কুসংস্কারের পৃষ্ঠপোষক কাব্য জগতের কাব্য-ইতিহাসে স্থান পায় না। এই নিমিত্তই টেনিসন বলিয়াছেন ;—

"That beauty, gold and knowledge are three sisters,
That dote upon each other friends to man
Living togther under the same roof,
And never can be sundered withoat tears."

PLACE OF ART.

কালিদাস ইহা জানিতেন, সেই নিমিত্তই রাজ-চরিত্র ওরূপে আঁকিয়া উহা যে দোষ-সংপৃক্ত তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং যথাসাধ্য সেই দোষ ক্ষালণ জন্য প্রয়াস পাইয়াছেন।

যাহা হউক রাজা বলিলেন,

"অনেন কল্যাণি মৃণালকোমলং, ব্রতেন গাত্রং গ্লপয়স্যকারণং।
প্রসাদমাকাঙ্ক্ষতি যস্তবোৎসুকঃ, স কিং ত্বয়া দাসজনঃ প্রসাদ্যতে ॥"

রাজ্ঞীর প্রতি রাজার এই চটুবাক্য শ্রবণ করিয়া উর্ব্বশী বিশেষ বিস্মিতা হইলেন। উর্ব্বশী স্বর্গের নর্ত্তকী বটেন, কিন্তু কবি তাহাকে এমনভাবে আঁকিয়াছেন যে, যেন তিনি কিছুই বুঝেন না ; তাই তিনি রাজ্ঞীর প্রতি রাজার প্রেম-দর্শনে বিস্মিতা হইলেন ; কিন্তু চিত্রলেখার লোক-চরিত্র বেশ জানা ছিল। তাহা না হইলে চিত্রলেখা দূতীশ্রেষ্ঠা হইতে পারিতেন না। সেই নিমিত্তই চিত্রলেখা উত্তর করিল,—"অই মুদ্ধে অণ্ণসংবান্তপেমাণো নঅরা অধিসং দক্ষিণা হোন্তি," যে পুরুষের মন অন্যনারীর প্রতি আসক্ত, সে নিজের রমণীর প্রতি অধিকতর প্রেমবান দেখায়।

যাহা হউক রাজ্ঞী পূজোপচার সম্পাদন করিলেন, ও রোহিণী-সংগত ভগবান্ চন্দ্রমার সমীপে এই বলিয়া প্রার্থনা করিলেন যে, তদ্দিনাবধি রাজা যে কামিনীর কামনা করিতেছেন ও যে নারী তাঁহার প্রতি একান্ত আসক্তা, তাহার সহিত রাজার শীঘ্র চিরকালস্থায়ী মিলন হউক। "অজ্জ প্পহুসি অজ্জউত্তো জং ইত্থিঅং কামেসি জা অ অজ্জউত্ত সমাম পণয়িণী তাএসহ অল্প নিবন্ধেন বর্ত্তিদব্বং।"

রাজ্ঞী ঔশীনরী এইরূপে গভীর মহত্ত্বের পরিচয় দিলেন। নারীর পক্ষে ইহা অল্প ত্যাগ স্বীকারের কথা নয়। মহানুভবা নারীদিগের জন্মভূমি বলিয়া ভারত চির-প্রসিদ্ধ। কালিদাস ভারতের উৎকৃষ্ট কবি; তাহার রচিত নাটকে ঔশীনরীর ন্যায় রমনীরত্ন না থাকাই বিচিত্র। নাটকের প্রথমহইতে যে অবধি ঔশীনরীর দেখা পাওয়া যায়, সেই স্থানহইতেই তাঁহার চরিত্রের কোমলতা ও উদারতার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া হয় ; রাজ্ঞী চেটীর মুখে যখন শুনিলেন যে, রাজা উর্ব্বশীর প্রতি আসক্ত, তখন কেবল সেই কথার উপর বিশ্বাস করিয়া রাজার উপর অকারণ বিরক্ত হইলেন না। স্বয়ং অন্তরালে থাকিয়া রাজার উর্ব্বশীপ্রেমের সম্যক প্রমাণ উপলব্ধি করিলেন ; কিন্তু তাই বলিয়া তদবধি রাজার উপর বিশেষ বিদ্বেষভাবাপন্না হন নাই। মনোবেদনা নিগূহন-শক্তি তাঁহার অতিমাত্র ছিল। তিনি প্রাকৃত-কামিনীর ন্যায় শোকে অধীরা হইবার নহেন। মনের বেদনা গোপন করা সহজ কার্য্য নহে। মনের অত্যন্ত বল না থাকিলে ইহা সম্ভবে না। ক্রটস পত্নী পোরশিয়া ও বাণভট্টের কাদম্বরীর ন্যায় তাঁহার সহিষ্ণুতা অতিমাত্র প্রবলা ছিল। তাই তিনি রাজার ব্যভিচার-ভাব দেখিয়াও আপনার মনোব্যথা কিছুমাত্র প্রকাশ করেন নাই ; শুধু তাহাই নহে ; তিনি এতদূর উদার যে ব্যথা হওয়া দূরে থাকুক রাজার যাহাতে উর্ব্বশীর সহিত অপ্রতিবন্ধ মিলন হয়, তাহার পথও পরিষ্কার করিয়া দিলেন ; কিন্তু রাজা এ মহত্ত্বের পরিচয় পাইয়াও স্বীয় কপটতা ত্যাগ করিতে পারিলেন না। তখনও বলিতেছেন,—"প্রিয়ে আমাকে যেরূপ দোষী বিবেচনা করিতেছ, আমি সেরূপ দোষী নহি—"নাহং পুনস্তয়া ত্বয়ি যথাহি মাং শঙ্কসে ভীরু!" বোধ করি রাজচরিত্রকে খাট করিয়া মহিষী চরিত্রের মহানুভবতার সমধিক পরিচয় দেওয়া কবির অভিপ্রেত হইয়া থাকিবে; তা না হইলে এরূপ মহত্ত্বের পরিচয় পাইয়াও রাজার মুখে তখনও কবি কেন কপট বাক্য বলাইবেন? সেক্ষপীয়রের অষ্টম হেনরী অতি নৃশংস ও পাষণ্ড নরপতি ছিলেন ; কিন্তু রাজ্ঞী ক্যাথারিণকে প্রত্যাখ্যান করিবার সময় তিনি বেশ বুঝিয়াছেন যে, রাজ্ঞী নিরপরাধিনী ; দোষ তাঁহার নিজের, রাজ্ঞীর নহে এবং একথা বুঝিয়াও ভাবগোপনে আদৌ চেষ্টা করেন নাই। রাজা পুরুরবা যদি অষ্টম হেনরীর ন্যায় স্পষ্টবক্তা হইতেন ; তাহা হইলে, তিনি রাজ্ঞী ঔশীনরীকে নিশ্চয়ই এই বলিয়া সম্বোধন করিতেন—

That man i' the world who shall report he has
A better wife, let him in naught be trusted,

For speaking false in that : then art, alone
(If thy rare qualities, sweet gentieness,
Thy meekness saint-like, wife-like government,
Obeying in commanding,— and thy parts
Severeign and pious else, could speak art),
The Queen of earthly queens ——

HENRY VIII. Act II. Sc IY.

যাহা হউক সরলান্তঃকরণা উর্ব্বশী, মহিষীর উদারতার পরিচয় পাইয়া, সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিলেন, এবং হৃদয়ের উচ্ছ্বাস ভরে বলিয়া উঠিলেন,—"অস্মহে ণং জাণামি কিমপরম্ সে বঅনং মম উণ বিস্সাস বিসদং হিঅঅং সংবুত্তং—জানি না রাজ্ঞী আরো কি বলিবেন, আমার হৃদয় কিন্তু এখন বিশ্বস্ত হইয়া সুস্থির হইল।" কোমল-হৃদয়া উর্ব্বশী স্বার্থপরা, নিজে রাজাকে অপ্রতিবন্ধভাবে ভোগ-দখল করিবেন, এই তাঁহার মহা আনন্দের বিষয়। উর্ব্বশীর অন্তঃকরণ একান্ত সরল। মনে যখন যে ভাব আসিয়া জুটে, সে ভাব মনের সমগ্রাংশকে জুড়িয়া বসে। শোক, দুঃখ বা ভালবাসা, যে ভাব যখন আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন সেই ভাব মনকে সম্পূর্ণরূপে ব্যাপ্ত করে। সেই নিমিত্তই উর্ব্বশীর ভয়ে কাতরতা, হর্ষে উৎফুল্লতা প্রেমে মত্ততা দেখা যায়। উর্ব্বশী-চরিত্রে এই ভাবটুকু কবি বেশ বিশদরূপে দেখাইয়াছেন। প্রথমাঙ্কে দৈত্যভয়ে উর্ব্বশী যখন মূর্চ্ছা যান, সেই সময়ে ভয়ে তাঁহার সমস্ত বিচার শক্তি ও প্রত্যুৎপন্নমতি লোপ পাইয়াছিল; কেবল মাত্র ভয় তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। উর্ব্বশীর হর্ষ হইলে তিনি কেবল মনে হর্ষানুভব করিয়া থাকিতে পারিতেন না। সখি চিত্রলেখাকে হর্ষসূচক বাক্যে নিজের আনন্দ জানানই চাই। রাজা পুরুরবা উর্ব্বশীর প্রেমে যত না মত্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, উর্ব্বশী রাজার প্রেমে ততোধিক মত্ত হইয়াছিলেন, তাহা না হইলে নাট্যাচার্য্য মহামুনি ভরত-সমীপে অভিনয়ে প্রমাদ করিয়া বসিতেন না। সেই নিমিত্ত কবি সুবিবেচনা করিয়া চিত্রলেখার চরিত্র আঁকিয়াছেন। চিত্রলেখা উর্ব্বশীর হিতাহিত উপদেশদাত্রী, কোন সময়ে কি বুঝিয়া কি করিতে হইবে, উর্ব্বশীর সে শক্তি নাই। চিত্রলেখা উর্ব্বশীর মস্তকস্বরূপা ও বুদ্ধিদাত্রী। চিত্রলেখা না থাকিলে উর্ব্বশী একপদ ও অগ্রসর হইতে পারেন না। তবে যখন রাজার সহিত অপ্রতিবন্ধ মিলন হইয়া গেল, তখন আর উর্ব্বশীর চিত্রলেখাকে প্রয়োজন নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে বিদূষকের কালাকাল বিবেচনা না করিয়া নর্ম্মালাপ একটা রোগ; তাই রাজ্ঞীর এই উদার বাক্য শুনিয়া বিদূষক বলিয়া উঠিল;—"ছিন্নহৃৎথস্স পুরদো বজ্জে পলাইদে ভণাদি, গচ্ছ ধর্ম্মো ভবিস্সদিতি।" হস্তবিহীন মনুষ্যের সম্মুখ দিয়া বধার্হ প্রাণী চলিয়া গেলে, সে উহাকে ছাড়িয়াই দিয়া থাকে। রাজ্ঞীর এ বিষয়ে তাহাই হইল। যাহা হউক রাজ্ঞী এই কথা বলিয়া নিষ্ক্রান্তা হইলেন এবং এই নাটকে রাজ্ঞীর দর্শন আর পাওয়া যায় নাই।

এস্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, মহিষী ঔশীনরীর অবতারণা করিয়া এরূপে নাটকের মধ্য ভাগে তাঁহাকে বিদায় দেওয়া কবির উদ্দেশ্য কি? মহিষী ঔশীনরীর চরিত্র কবিবর সৃষ্টি। পৌরাণিক আখ্যায়িকায় ঔশীনরীর কোন উল্লেখ নাই। বলা যাইতে পারে যে, রাজচরিত্র আঁকিতে গেলেই, রাজ্ঞী-চরিত্র আঁকিতে হইবে। ইহতো সহজ কথা, কিন্তু সহজ হইলে ইহা কিয়ৎপরিমাণে সত্য। বিবাহ এইদেশে ধর্ম্মকার্য্যের অন্তর্গত। রাজা ধর্ম্মের প্রতিপালক, সেই নিমিত্তই রাজার রাজ্ঞী আবশ্যক। রাজা যতই অবৈধ প্রেম করুন না কেন,

তুলনার সমালোচনা।

বিষবৃক্ষ ও কৃষ্ণকান্তের উইল।

কুন্দনন্দিনী ও রোহিণী।

কুন্দনন্দিনী-রোহিণী দুজনেই সুন্দরী, দুজনেই প্রেমসংঘর্ষণ কালে বিধবা; তবে একজন বালিকা অন্যজন যুবতী, দুজনের কাহারও বৈধব্য ব্রহ্মচর্য্যমুখ নহে—সুখমুখ। হিন্দুললনার বৈধব্য পার্থিব সুখভোগের চিরঅন্তরায়, এই অন্তরায় দুজনেই জানিত, জানিয়াও বৈধব্যশাসন সব সময় স্মরণ রাখিতে পারিত না। বিধবার মোহ যে পরিমাণে দোষের ইহাদের জ্ঞান ছিল, বিধবার প্রেম সে পরিমাণে দোষের সে জ্ঞান ছিল না। মোহ—পাপ, প্রেম—পুণ্য, এই ধারণাই উভয়ের জীবনকে নূতন পথে পরিচালিত করে। এই পরিচালনার মূলে শুধু দুর্দ্দমনীয় লালসা নাই, কৃতজ্ঞতাও যথেষ্ট আছে। রোহিণীর কৃতজ্ঞতা প্রথমে কিছু বিচিত্র রকমের দেখা যায়,—অকারণ গোবিন্দলালকে মজাইতে হরলালের অলীক প্রলোভনে পড়িয়া রোহিণী প্রকৃত উইল চুরি করিয়া, তৎপরিবর্ত্তে একখানা জাল উইল কৃষ্ণকান্তের দেরাজে রাখিয়া, একদিন গোবিন্দলালের সর্ব্বনাশ করে এবং সেই সর্ব্বনাশসাধনের পর হরলালকর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাতা হইলে, গোবিন্দলালের প্রতি তার দয়ার সঞ্চার হয়। পাপের পুরস্কার না পাইলে, পুণ্যের তিরস্কারে প্রবৃত্তিস্রোত অনেক সময়ে ফিরে। এই পুণ্যের মাহাত্ম্যে, দয়ার মন্ত্রণায় গোবিন্দলালের উপকার করিতে, ইচ্ছাপূর্ব্বক, প্রকাশ্যে, কৃষ্ণকান্তের সম্মুখে উইল বদল করিয়া, রোহিণী ধরা পড়িল এবং সে এই অতি-দয়ারই মন্ত্রণায় স্বেচ্ছায় গোবিন্দলালের কাছে আপনাকে ধরা দিতে প্রস্তুত হইল। দয়া করিয়া সে সব করিতে প্রস্তুত। এই উপকার গোবিন্দলালের পক্ষে প্রকৃত উপকার নহে। একরকম ক্ষতিপূরণ এই অভিনব ক্ষতিপূরণের পণে সে ধর্ম্মের হিসাবে তাহার যৌবন—বিধবার যৌবন, বড় বেশী গণে নাই। ক্ষতিপূরণ বলিয়াই গোবিন্দলালের স্ত্রী হইবার আশা সে করে নাই, প্রত্যুপকারে হরলালকে বিবাহ করিতে ইঙ্গিত করিয়াছিল; শুধু ইঙ্গিত নহে, শেষ স্ত্রী হইবার দাবি পর্য্যন্ত করিয়াছিল। তবেই বলিতে হয় কুন্দনন্দিনীর প্রেম ও রোহিণীর প্রেম অনেকটা গুণজ, এই গুণজ-প্রেম কালে রূপজ প্রেমের সহায়তা পাইয়া বৃদ্ধি পায়। কুন্দ একান্ত অসহায় অবস্থায় পড়িয়া নগেন্দ্রের সাহায্যবলে আপন দুর্দ্দৃষ্ট জয় করে, আর রোহিণী গোবিন্দলালের কল্যাণে, কৃষ্ণকান্তের দারুণ কোপ হইতে পরিত্রাণ পায় এবং মৃত্যুদ্বার হইতে ফিরিয়া আসে। এই জন্যই বলিতেছিলাম, দুজনেই কৃতজ্ঞতার উপহার দিতে প্রাণ দিয়া বসিয়াছে। এই প্রাণদান আপন আপন উপকারীর প্রাণ বাঁচাইতে নহে। এই প্রাণদানের অবান্তর ফল দেহদান এবং এই প্রাণগ্রহণে বা দেহগ্রহণে রক্ষণ ভক্ষণ দাঁড়াইয়াছে। রমণীর ধারণা,—প্রাণপাত প্রেমপূজায় না হইলে সার্থক হয় না। রমণীর জ্ঞান,—রমণীর যাহা অদেয়—সতীধর্ম্ম তাহা যাহাকে দেওয়া যায়, তার কাছে যত বড় ঋণ থাকুক না কেন সে ঋণও আর থাকেই না, উল্টে তাকে ঋণী করা হয়। মহাজনকে খাতক করিতে নারী চিরকালই মজবুত। বৈধব্যের ভিতরহইতে এই প্রেমবিস্তারকে পাছে লোকে ব্যভিচার বলে, এই ভয়ে কুন্দ নগেন্দ্রের স্ত্রী হইতে বাসনা করে এবং রোহিণীও প্রথমে হরলালের স্ত্রীহইতে চাহিয়াছিল। সংসার চূড়ান্ত রঙ্গক্ষেত্র, পরিণয়রূপ পুণ্যের ছাপে ব্যভিচাররূপ পাপ অনায়াসে বিকায়। সভ্যতার অর্থ—সচ্ছন্দতা, পাপ—পুণ্যে পরিণত করা অতি সচ্ছন্দতার কার্য্য। বিবাহিত পুরুষের পত্নী

বর্ত্তমানে অন্য নারীগমন দোষের কথা,পাপের কথা ! কিন্তু ঐ বিবাহিত পুরুষ বিবাহের সূত্রে দশটি নারীগমন করিলে আর দোষের হয় না। একজন বিবাহিত পুরুষ দশটি রমণীকে ভার্য্যা বানাইয়া উপগত হইলে দোষ হয় না—পাপ হয় না, অন্যথায় যতদোষ যত পাপ। লোকরঞ্জন আর ধর্ম্ম-রঞ্জন এক কি ? সমাজের, সংসারের শাসনপ্রণালী বড় বিচিত্র ! সমাজ বা সংসার, পাপ দমনের ব্যবস্থা বিধান করে না বা করিতে পারে না বলিয়া পাপের সঙ্গে এইরূপ একটা রফা বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছে। এই বহুবিবাহ সর্ব্বনেশে বহুবিবাহ ! পত্নী বর্ত্তমানে অন্য পত্নীগ্রহণ যে অন্যায়, এখানে শুধু সে অন্যায় নহে, পত্নী বর্ত্তমানে অন্যের পত্নীকে পত্নী করিয়া গ্রহণ করা যে অন্যায়ের উপর অন্যায় বহুবিবাহে বিধবাবিবাহ তাহারই প্রমাণ !!! অতি সভ্যতার উন্নতাবস্থায় বিধবার কিনারা হইয়াছে। কালে কুলটারও কিনারা হইবে ! বিধবার বিবাহে যদি দোষ না থাকে, কুলটার বিবাহে দোষ কি ? কুলবালা চারিবার উপর্য্যুপরি বিধবা হইয়া বিবাহ করিলে যখন কলঙ্কভাগিনী হয় না, তখন দ্বিচারিণী বিবাহ করিলে কলঙ্কভাগিনী হাস্যাস্পদ হয় কেন ? নারীর পুরুষগমন বিধিও ঐরূপ বিচিত্র দেখা যাইতেছে—বিবাহের সূত্রে শতপুরুষগমন পাপ নহে, পাপ কেবল বিবাহের সূত্রে না হইলেই হয়। পুরুষগমন যেখানে পর পুরুষগমনজ্ঞান সেইখানে পাপ কি ? যে যাকে ভালবাসে, সে তাকে পর ভাবে কি ? এখানে নীতির স্বপ্রকাশ আদর্শ নাই। আমরা নীতির একটা আদর্শ খাড়া করিয়াছি। নীতির স্বপ্রকাশ আদর্শ কুত্রাপি নাই, নাই বলিয়াই মনুষ্যনীতির আদর্শ সুনীতির আদর্শ কি, কুনীতির আদর্শ, তাহা দেখিবার অধিকার মনুষ্যের আছে। এই জন্যই মনুষ্যনীতি পরিবর্ত্তনমূলক, এই জন্যই মনুষ্যনীতির সংস্কার হয়। পুরুষের পদস্খলন মার্জ্জনীয়, নারীর পদস্খলন মার্জ্জনীয় নহে কেন ? আমরা সংস্কারের অধীন বলিয়া কি আমাদের এই ধারণা ? পুরুষ পুরুষের পক্ষপাতী বলিতে হয়,বল, কিন্তু নারীর—ঋতু, গর্ভধারণ দেখিয়া যতটা দেখা যায়, তাতে বোধ হয়, নারীর ইন্দ্রিয়সুখ প্রকৃতিব্যবস্থায় মাঝে মাঝে বারিত, পুরুষের বারিত নহে। নারী—দান করে, পুরুষ—গ্রহণ করে। দাত্রীর সম্পত্তি না থাকিলে দান করিবার থাকে না,গ্রাহকের অভাব বা প্রয়োজন না থাকিলেও গ্রহণ করিবার শক্তি থাকে। এ পৃথিবীর বিধানই কেমন, যে ঠকায় তার ঠকামির চেয়ে, যে ঠকে তার আহাম্মকি অধিক পরিমিত হয়। আরও স্বয়ং প্রকৃতি, নারীর ব্যভিচারের বিপক্ষে,—নারীকে গর্ভধারণ করিতে হয়। সমাজে বল, সংসারে বল, নারীর কলঙ্কের পথ সহজেই উন্মুক্ত রহিয়াছে। সত্য বটে, যাহা পাপ তাহা গোপনেও পাপ প্রকাশ্যেও পাপ। এ সংসারে কিন্তু পাপে ভয় কোথায় ? পাপ প্রকাশেই যত ভয় ! যেখানে পাপ গুপ্ত, সেখানে কলঙ্ক কোথায় ? লোকলজ্জাই বল, সমাজশাসনই বল, এই জন্যই নারীর পক্ষে যেমন গুরুতর পুরুষের পক্ষে তেমন গুরুতর হইবার অবসর নাই। কুন্দনন্দিনী ও রোহিণীর চরিত্রে নীতির বিকাশ কতদূর হইয়াছে, তাহা না দেখিয়া উভয়ের নীতির পরিমাণ করিলে তুলনার সমালোচনা ঠিক হইবে।

বিষবৃক্ষের কুন্দচরিত্র এবং হীরাচরিত্র দুইটি পৃথক পৃথক চরিত্রের সহিত কৃষ্ণকান্তের উইলের এক রোহিণী চরিত্রের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। কুন্দ আপনাকে অনাথা ভাবিয়া মাতৃস্নেহ স্মরণ করিয়া কাতর হয় এবং এই কাতরতার কালে যখন দেখে নগেন্দ্র তাহার নাগালের ভিতর নাই, তখন আর সে কিছুতে কিছু কুলাইয়া উঠিতে পারে না—ডুবিয়া মরিতে যায়। প্রাণে এমন কলঙ্ক উঠিলে হিন্দুবিধবার ডুবিয়া মরা ভাল বটে, কিন্তু কুন্দের এ মরা ধর্ম্মচ্যুতির জন্য নহে, প্রেম-নৈরাশ্যের জন্য। কি কুন্দ, কি রোহিণী, কাহারও পূর্ব্বস্বামীধ্যান নাই। কুন্দ ১৩ বৎসর বয়ঃক্রমে বিধবা হয়, তারাচরণের সহিত তাহার প্রণয়ের সুযোগ সময় হয় নাই এমন সিদ্ধান্ত করা যায় না। রোহিণীর বৈধব্যের বয়ঃক্রম নির্ণীত নাই, তবে রোহিণী যে বালবিধবা বারুণী পুকুরের ঘাটে তাহার চিন্তায় তাহা স্পষ্ট জানা যায়। এই বালবৈধব্য কুন্দের অপেক্ষা অল্পবয়সে

তাহার ঘটিয়াছে কিনা এ টুকু দেখিতে হইবে। সম্ভবতঃ রোহিণীর স্বামীভোগ হয় নাই,—"আমি অন্যের অপেক্ষা এমন কি গুরুতর অপরাধ করিয়াছি, যে, পৃথিবীর কোন সুখভোগ করিতে পাইলাম না।" "সুখভোগে বিরত হইলাম," নহে, "সুখভোগ করিতে পাইলাম না," এই কথায় আমাদের সিদ্ধান্ত ঠিক ভাবিতে সাহস হয়। যদি এ কথা প্রকৃত হয়, তাহা হইলে রোহিণী বিধবা হইলেও এক রকম কুমারী, রোহিণীর বিবাহে প্রেমে অধিকার ষোলআনা না থাকুক, অনেকটা আছে। রোহিণীর প্রেম সম্পূর্ণ বিলাসলালসা নহে। রোহিণী, আপন পদস্খলন হিন্দু-বিধবার পদস্খলন অন্যায়, ইহা একদিন ভাবিতে পারিয়াছিল এবং তৎপ্রতিবিধানে গোবিন্দলালকে প্রাণ দিয়াও প্রাণ ফিরাইয়া আপনাকে সৎপথে রাখিতে চাহিয়াছিল,—"হে জগদীশ্বর, হে দীননাথ, হে দুঃখীজনের একমাত্র সহায় ! আমি একান্ত দুঃখিনী একান্ত দুঃখে পড়িয়াছি—আমায় রক্ষা কর—আমার হৃদয়ের এই অসহ্য প্রেমবহ্নি নিবাইয়া দাও—আর আমায় পোড়াইও না। আমি যাহাকে দেখিতে যাইতেছি—তাহাকে যতবার দেখিব, ততবার আমার অসহ্য যন্ত্রণা—অনন্ত সুখ। আমি বিধবা—আমার ধর্ম্ম গেল—সুখ গেল—প্রাণ গেল—রহিল কি প্রভু ?—রাখিব কি প্রভু ?—হে দেবতা ! হে দুর্গা !—হে কালি !—হে জগন্নাথ !—আমায় সুমতি দাও, আমার প্রাণ স্থির কর—আমি এই যন্ত্রণা আর সহিতে পারি না।" কুন্দের ধর্ম্মচ্যুতির জন্য এতটুকু দুঃখও নাই। কুন্দের দুঃখ,—নগেন্দ্র লাভ হইল না, কুন্দের বিশেষ দুঃখ,—নগেন্দ্রের উপভোগ্যা হইল না। রোহিণীর এরূপ বিশেষ দুঃখ বরাবর ছিল না,একসময় হইয়াছিল; কিন্তু কুন্দের নগেন্দ্র-প্রসক্তির মূলহইতে এই বিশেষ দুঃখ সবিশেষ দেখা যায়। রোহিণী আপন বৈধব্যের কৈফিয়ৎ চায়। রোহিণীর বিশ্বাস, বৈধব্য, পাপের ফল। যার বৈধব্যে এরূপ বিশ্বাস, তার বৈধব্য কি ব্রহ্মচর্য্য মুখ সম্ভবে ? আত্মদুঃখকাতরতা শুধু রোহিণীচরিত্রের মূল নহে, রোহিণী চরিত্রের মূল—আত্মদুঃখকাতরতা এবং পরশ্রীকাতরতা। হীরার এই পরশ্রীকাতরতায় সাকাই আছে। হীরার ধারণা,—বিধাতা শুধু তাহাকে দীনা করেন নাই, হিংসুকও করিয়াছেন ; কাজেই হীরার হিংসানল বিধিনির্ব্বন্ধে প্রজ্জ্বলিত, ইহা হীরা ভাগ্নিত। পরশ্রীকাতরতায় উত্তরোত্তর অমন হিংসা করিবার চিরদাবী রোহিণী রাখিতে চায় না—"পরের সুখ দেখিয়া আমি কতর নই, কিন্তু আমার সকল পথ বন্ধ কেন ?" ইহাতে রোহিণীর পূর্ব্বঈর্ষার দমন দেখা যায়, কিন্তু হীরার এ সব কিছুই নাই। হীরা নীচ প্রাণা,হীরা দাসী ! দাসী দাসীই থাকে ! রোহিণী মহাপ্রাণা না হইলেও দাসী নহে—ভদ্রবিধবা। হীরা আপন প্রণয়পাত্র দেবেন্দ্রের কুন্দলালসা জানিতে পারিলে দেবেন্দ্রকে একদিন বিলক্ষণ দুকথা শুনাইয়া দেয়,—আপন মোহ সঙ্কুচিত করিতেও বিশেষ যত্নবতী হয়। হীরার ভয়,হীরার লজ্জা,পাছে দেবেন্দ্র হীরার সংসর্গপ্রসঙ্গ বন্ধুমহলে তুলিয়া রঙ্গব্যঙ্গ করে। রোহিণীর এ ভয় ছিল না, হীরা মুগ্ধা বটে কিন্তু রোহিণী যতদূর মুগ্ধাহীরা ততদূর নহে। কি হীরা, কি রোহিণী, দুজনেই আপন আপন মোহের বশবর্ত্তিনী হইয়া দেবেন্দ্র এবং হরলালের কল্যাণে সব করিতে চাহিয়াছিল। আপন আপন নায়কের তুষ্টিসাধন তাহাদের লক্ষ্য ছিল না, তাহাদের লক্ষ্য ছিল বা ভ্রান্তি ছিল প্রেমবিনিময়। বিনিময়ে যখন প্রেম মিলে না,হীরা, রোহিণী দেখিল, তখন আর তাহারা মুগ্ধা নহে, উৎকট ক্রোধে উন্মাদিনী, আপন আপন নায়ককে দুজনেই বিলক্ষণ শিক্ষা দেয়। হীরা, দেবেন্দ্রকে দ্বারবানের লাঠিদ্বারা হাতে মারে, রোহিণী জাল উইল বদলাইয়া হরলালকে ভাতে মারে। এই মোহহইতে প্রতিশোধ বড় স্বাভাবিক ! বড় সুন্দর ! হীরা, রোহিণী দুজনেই জানিত পরের কার্য্যোদ্ধারের সঙ্গে তাহাদের ইষ্টানিষ্টের সম্বন্ধ বড়ই অল্প,তবে যেখানে পরের কার্য্যোদ্ধারের সঙ্গে আত্মোদ্ধার হয়,সেইখানেই তাহাদের কর্ম্মাকর্ম্মে লালসা প্রবলা। হীরা চতুরা, রোহিণীও চতুরা, হীরার প্রাণ কুটিল, রোহিণীর প্রাণ সরল ! হীরা, সূর্য্যমুখীর সর্ব্বনাশ করিতে নগেন্দ্রের নিকট সূর্য্যমুখীর নামে কৌশলে অনেক লাগায়। হীরা নগেন্দ্রপ্রণয়াভিলাষিণী নহে অথচ সূর্য্যমুখীর উপর অসন্তুষ্টা !

রোহিণী, গোবিন্দলালে মজিয়াছিল বলিয়া ভ্রমরকে জ্বালায়। ভ্রমরের পতিভক্তি শিথিল হইলে একদিন তাহার দুরাশা ফলবতী হইবার সম্ভাবনা, ইহা রোহিণী প্রথমে যাহা অনুমানে ভাবিয়াছিল, কালে তাহা বিশেষ ফলপ্রদান করে। হীরারও এভাব কিন্তু গৌণভাবে ছিল। নগেন্দ্রের কুন্দাসক্তি উদ্ভ্রান্ত করিলে নগেন্দ্রের চেষ্টায় কালে কুন্দে নগেন্দ্রে পুনর্মিলন ঘটিতে পারে, ঘটিলে দেবেন্দ্রের কুন্দাকাঙ্ক্ষায় ছাই পড়িবে, কাজেই কুন্দাকাঙ্ক্ষা দূর হইলে কুন্দাসক্তিও তিরোহিত হইবে এবং এই কুন্দাসক্তিই হীরার দেবেন্দ্রলাভের পথে বিষম অন্তরায় ইহা হীরা স্পষ্ট জানিত; জানিত বলিয়াই হীরা এই খেলা খেলে। হীরার গৌণদৃষ্টি আছে মুখ্যদৃষ্টি নাই, রোহিণীর মুখ্য গৌণ উভদৃষ্টিই আছে। হীরার পরিণাম—উন্মাদাবস্থা, কুন্দের পরিণাম—আত্মহত্যা, রোহিণীর পরিণাম—অপঘাত মৃত্যু। ভ্রান্তির বল, পাপের বল, পরিণাম রোহিণীরই চূড়ান্ত, ইহা সকলকে স্বীকার করিতে হইবে। চন্দনতরু ভ্রমে বিষবৃক্ষের আশ্রয় গ্রহণ করিলে চন্দনের সুগন্ধ মিলে না, বিষবৃক্ষের বিষবায়ুই সেবন করিতে হয়। শীতকালে সন্ন্যাসী যেরূপ যে বৃক্ষের আশ্রয়ে থাকে, সেই বৃক্ষেরই ডালপালা পুড়াইয়া আপন শীত নিবারণ করে, সেইরূপ হীরা ও রোহিণী, দেবেন্দ্র ও গোবিন্দলালের ছায়ায় বসিয়া শেষ তাঁহাদিগের নীতি পর্য্যন্ত আপন আপন সুখার্থে জলাঞ্জলি দেয়। প্রেমের অভিমানে (প্রেম করিয়া প্রেম না পাইলে বা প্রেম হারাইলে) অনিবার্য্য দুঃখ জন্মে এবং সেই দুঃখের ফল আত্মহত্যা প্রতিশোধ নহে। রূপজ মোহের অভিমানেই প্রতিশোধ জন্মে। মোহের অভিমানমাত্রই প্রতিশোধের জনক নহে; মোহের অভিমান যেখানে অহংজ্ঞানমূলক, সেইখানেই এই খেলা দেখা যায়। এমন দুঃখে এমন তাচ্ছল্যে পড়িলাম এ জ্ঞান, এ কথা, নাচারের জ্ঞান, নাচারের কথা; কিন্তু যেখানে আমাকে এত দুঃখ, আমাকে এমন তাচ্ছল্য জ্ঞান, সেখানে প্রতিহিংসা-লালসা দুর্দ্দমনীয়া হইয়া উঠে। মোহের খেলায় প্রায়ই ইহা ঘটে। যেখানে ঘটে না, সেখানে মোহ প্রেমের অনেক কাছে গিয়া পড়িয়াছে,—মোহ প্রেমের সহিত মিলিত হইতে চায়। প্রেমের সেথায় আকর্ষণ নাই বটে, কিন্তু বিকর্ষণও নাই। প্রেম আত্মদান, মোহ আত্ম বিনিময়—কামের কথা স্বতন্ত্র। আত্মবিনিময়—আগে পরকে পাইয়া পরে আপনাকে দেওয়াই প্রায় ঘটে। যেখানে আগে আত্মদান ঘটে, সেখানে হয় ঠকিতে হয়, নয় আত্মবিনিময়ে আর লক্ষ্য থাকে না, অর্থাৎ এ ঠকাকে ঠকা জ্ঞান থাকে না; মোহের আত্মদান, আত্মদানই রহিয়া যায়। এ কথার সার্থকতা অনুভূতি কালে সুকবি গিরিশচন্দ্রকে মনে পড়ে—

"যেচে প্রাণ ধারে বেচে কে কবে দাম পেয়েছে।"

হীরা ও রোহিণীর তুলনার সমালোচনা এইখানে শেষ করিলে একান্ত সংক্ষিপ্ত হইবে না। এখন কুন্দ রোহিণীর তুলনার সমালোচনার শেষাংশ ঠিক বলিয়া উঠিতে পারিলে বিষবৃক্ষ এবং কৃষ্ণকান্তের উইল গ্রন্থ দুইখানির ভুয়োপ্রণিধান সার্থক জ্ঞান করিব।

কুন্দ-রোহিণীর পূর্ব্বরাগ, অনুরাগ, মধুররাগ, বিরাগ সব দেখিয়াছি! দেখাইয়াছি কতদূর, তাহা আমি বলিব কেমন করিয়া! মধুররাগ যায় যায়, বিরাগ আসে আসে, উভয়ের এই সন্ধি সংযোগ ভাল করিয়া দেখিলে কুন্দ-রোহিণীকে ভাল করিয়া দেখা হইবে। কুন্দ-রোহিণীর অনুরাগের গভীরতা অন্বেষণ করিলে রোহিণীর অনুরাগের গভীরতা অনুভূত হয়। কুন্দ, নগেন্দ্রের তাচ্ছল্যে আত্মহত্যা করিয়া খুনকে পরিত্রাণে পরিণত করে। এই আত্মহত্যা—প্রেমবৈরাগ্যে আত্মহত্যা—প্রণয়ীর অনাদরে আত্মহত্যা ইহা বিশ্লেষণ করা কর্ত্তব্য। যেখানে অকপট ভালবাসার অভাব, যেখানে যত্নের, স্নেহের, শ্রদ্ধার বিনিময়ে—অযত্ন, অস্নেহ, অশ্রদ্ধা, সেইখানেই অভিমানে—আত্মমুক্তি। অভিমান—দোষের নহে, আত্মমুক্তিই—দোষের। অভিমানে আপন দুরদৃষ্টে দৃষ্টি পড়ে, আপন যোগ্যতায় সন্দেহ জন্মে। অভিমানমাত্রে আত্মমুক্তি-লালসা জন্মে না।

আত্মমুক্তি বণিক্‌বৃত্তির ফল। গুণজ বন্ধনই বল, রূপজ বন্ধনই বল, নায়ক নায়িকার মধ্যে একটা বাঁধাবাঁধি বরাবরই চলে। রূপফাঁদেই হউক ফাঁদে গুণফাঁদেই হউক ফাঁদে পড়িয়া বন্ধন, যার বন্ধন-জ্ঞান থাকে, সেই এক দিন বন্ধনমুক্তির চেষ্টা করে,—বন্ধনের পানে তার বরাবরই দৃষ্টি থাকে; কিন্তু যার বন্ধন, বন্ধন-জ্ঞান থাকে না, সে বন্ধনমুক্তির চেষ্টা পাইবে কেমন করিয়া? সেখানে বিনিময়ের আবশ্যকতায় প্রবৃত্তি, বিনিময়ের অভাবে বিরক্তি জন্মে না। যেখানে জন্মে, সেখানে বণিক্‌বৃত্তি, সেখানে অকপট প্রেম নাই। প্রণয়ী বা প্রণয়িণীর একজনকে ছাড়িয়া একজনার মরিতে সাহস হয় কি? যেখানে আত্মপ্রেমে ধ্রুব, অপরের প্রেমে ধ্রুব নহে, সেখানে অনিশ্চিতকে আরো অনিশ্চিত করিতে শতপ্রলোভনময় সংসারে প্রণয়ী বা প্রণয়িণীকে একা ছাড়িতে প্রণয়ী বা প্রণয়িণীর সাহস হয় কি? বাঁচিয়া যেখানে উচ্ছৃঙ্খলতা, মরিলে সেখানে রক্ষা থাকে কি? বিশ্বনিয়ম কেমন বিচিত্র, সংসার কেমন অভিশপ্ত স্থান; অকপট প্রেম একজনের হইলে হয় না, অন্য জনের স্বতন্ত্র হওয়া চাই। অকপট প্রেম পরস্পরের চাই। অকপট অকৃত্রিম প্রেমের বাসও কখন কখন মোহের সঙ্গে হয়। ইহার প্রতিকার নাই, সংস্কার নাই। আপনার অকপট প্রেমে, আন্তরিক স্নেহে অপরকে অকপট প্রেমিক, অকপট স্নেহাস্পদ করা যায় না। জগৎপদ্ধতি অসম্পূর্ণ! এ দুঃখ রাখিবার স্থান নাই। বলিতে ভয় হয়, এই জন্যই কি বিশ্বপ্রেম আমাদের টানিতে পারে না, আমরাও বিশ্বপ্রেমকে টানিতে পারি না? শুধু আকর্ষণধর্ম্মে চলে না, আকৃষ্ট হইবারও ধর্ম্ম চাই। চুম্বক লৌহকেই আকর্ষণ করে, স্বর্ণকে পারে না। জড়জগতে যে নিয়ম, অধ্যাত্ম জগতেও সে নিয়ম, তবে মোহের কথা স্বতন্ত্র। মোহে পরস্পরের মুগ্ধ হইবার কথা। মোহ প্রেমের সূচনা হইতে পারে, কিন্তু মোহমাত্রই প্রেমের পথ দেখায় না। এই জন্যই মোহে আর প্রেমে এত প্রভেদ। মোহে লালসা বড়ই প্রবলা, প্রেমে স্নেহ অনুরাগ দৃঢ় হয়, নিমেষে যাহা জ্বলিয়া উঠে, নিমেষে তাহা নিবিয়াও যায়। প্রেম নিমেষে জন্মে বটে, কিন্তু নিমেষে প্রবল হইয়া উঠে না, দিনে দিনে সুখে দুঃখে পরিবর্দ্ধিত হইয়া হৃদয়ে ক্রমে প্রাণে বদ্ধমূল হইয়া যায়। এইজন্য এ মূল প্রাণের সঙ্গেই উৎপাটিত হয়, প্রাণ থাকিতে এ মূল উৎপাটিত হইবার নহে। এতক্ষণে প্রেমে আর মোহে প্রভেদ অনুভূত হওয়া সহজ হইল না কি? কুন্দের এটুকু ছিল না এবং যাহা ছিল, তাহা পরিণাম ধরিয়া বেশ বুঝা যায়। রোহিণীর ইহা ছিল—"ইহা" বলিতে প্রেম বলি না,—মোহের আত্মদান, যে মোহ প্রেমের সহিত মিলিত হইতে চায়, সেই মোহ রোহিণীর ছিল,—

"মরিব কেন? না হয় ইনি ত্যাগ করেন করুন। ইহাঁকে কখন ভুলিব না, কিন্তু তাই বলিয়া মরিব কেন? ইহাঁকে যে মনে ভাবিব, দুঃখের দশায় পড়িলে যে ইহাঁকে মনে করিব, এই প্রসাদপুরের সুখরাশি যে ভাবিব, সেও ত এক সুখ, সেও ত এক আশা, মরিব কেন?"

"মরিব না, মারিও না। চরণে না রাখ বিদায় দেও।"

রোহিণীচরিত্রের এই আভ্যন্তরীণ ভাব! এইখানে ভ্রমরের কথা মনে পড়ে "ভাবিও না, সে মরিবে না, যে তোমায় দেখিয়া মজিয়াছে—সে কি মরিতে পারে?" ভ্রমরের এ কথার পর রোহিণী বস্তুতঃ জলে ডুবিয়াছিল। রোহিণীর এই জলে ডোবায় ভ্রমরের সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত বোধ হয় না, কেননা মজার মাত্রা আছে, যতটা মজিলে মরিতে পারে না, ততটা নিশ্চয় রোহিণী প্রথমে মজে নাই। কথাটা একটু পরিষ্কার করিলে ভাবটা পরিস্ফুট হইবে—ভ্রমরের সিদ্ধান্তে একটুকু গোল ছিল, ভ্রমরের সিদ্ধান্ত—রূপে মজা! রূপে মজার সঙ্গে রূপভোগের বড়ই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। যেখানে রূপভোগের বিন্দুমাত্র আশা নাই, সেখানে রূপে মজা ভ্রান্তি এবং সেই প্রাণবদ্ধমূলভ্রান্তি দূর করিতে রোহিণী প্রাণ অবধি দূর করিতে যায়। যে তোমায় মজিয়াছে, সে কি

মরিতে পারে,—এ কথা ভ্রমর রোহিণীর উদ্দেশে বলিতেও কুণ্ঠিতা! ভ্রমরের ধারণা, গোবিন্দলাল রোহিণী মজাইবার নহে. গোবিন্দলালের রূপই মজাইবার। স্বামীর ঐশ্বর্য্য, স্বামীর রূপ কখন কখন স্ত্রীর কাল হয়। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু রোহিণী, গোবিন্দলালে মজিয়াছিল। তারাচরণ ব্রাহ্মসভা করিত, ব্রাহ্মভাবে পূর্ণ ছিল, কাজেই তারাচরণের পত্নী কুন্দের বিধবা হইয়াও নিস্তার হইল না। কুন্দের বিধবাবিবাহ তারাচরণের রোপিত বিষবৃক্ষের বা অমৃতবৃক্ষের ফল। প্রবল রূপতৃষ্ণাকালে প্রথম প্রথম বোধ হয় বটে, অনন্তকাল এ রূপভোগ করিলেও বিরতি জন্মিবে না, কিন্তু কালে বিরতি স্থির জন্মায়। কুন্দরূপে নগেন্দ্রের বিরতি জন্মিয়াছিল। গোবিন্দলাল-রূপে রোহিণীর বিরতি না জন্মাক, তাহার সূত্র উঠিয়াছিল। এই সূত্র-অভিনব সূত্র! উপন্যাসকারের ভাষা—কল্পনা এখানে এতদূর লীলাময়ী হাস্যময়ী যে, তাহা উদ্ধৃত করিতে ভয় পাইলে অমৃতে অরুচির আশঙ্কা করা হয়। এই চিত্র বঙ্কিমচন্দ্র এতদূর সুখকর করিয়া তুলিয়াছেন, এখানে কল্পনার ভাষার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া উপন্যাসকারের অদ্ভুত ক্ষমতায় মুগ্ধ হইতে হয়।

"রোহিণী দেখিয়াছিল নিশাকর রূপবান্—পটলচেরা চোক—রোহিণী দেখিয়াছিল যে মনুষ্যমধ্যে নিশাকর একজন মনুষ্যত্বে প্রধান। রোহিণীর মনে মনে দৃঢ়সঙ্কল্প ছিল যে, আমি গোবিন্দলালের কাছে বিশ্বাসহন্ত্রী হইব না; কিন্তু বিশ্বাসহানি এক কথা—আর এ আর এক কথা। বুঝি সেই মহাপাপিষ্ঠা মনে করিয়াছিল, "অনবধান মৃগ পাইলে কোন্ ব্যাধ, ব্যাধ-ব্যবসায়ী হইয়া তাহাকে না শরবিদ্ধ করিবে?" ভাবিয়াছিল, নারী হইয়া জেয় পুরুষ দেখিলে কোন্ নারী না তাহাকে জয় করিতে কামনা করিবে? বাঘ গোরু মারে,—সকল গোরু খায় না। স্ত্রীলোক পুরুষকে জয় করে—কেবল জয়পতাকা উড়াইবার জন্য, অনেকে মাছ ধরে—কেবল মাছ ধরিবার জন্য, মাছ খায় না, বিলাইয়া দেয়। অনেকে পাখী মারে, কেবল মারিবার জন্য—মারিয়া ফেলিয়া দেয়। শীকার কেবল শীকারের জন্য—খাইবার জন্য নহে, জানি না, তাহাতে কি রস আছে, রোহিণী ভাবিয়া থাকিবে, যদি এই আয়তলোচন মৃগ এই প্রসাদপুর কাননে আসিয়া পড়িয়াছে—তবে কেননা তাহাকে শরবিদ্ধ করিয়া ছাড়িয়া দিই।" রোহিণীকে মহা পাপিষ্ঠা বলিতে লেখক অধিকারী, কেননা তাঁহার সাধের ভ্রমরের মনে সে বড় কষ্ট দিয়াছে। ভদ্র বিধবার প্রেম—ব্যভিচার বই আর কিছু নহে। এ অপরাধে কুন্দ অপরাধিনী, রোহিণী নহে। রোহিণীর সমগ্র জীবনে ঐ অপরাধের নিমিত্তভূতমাত্র হওয়া ছাড়া অন্য দোষ নাই। কুন্দের অনেক দোষ, প্রথম দোষ অভিভাবক পিতৃস্থানীয় নগেন্দ্রের উপর আসক্তা; দ্বিতীয় দোষ—বিধবা হইয়া জড়সুখে আত্মার সুখ হারায়; তৃতীয় দোষ—স্বামীপ্রেমের অমর্য্যাদা করে; চতুর্থ দোষ—স্নেহভাষিণী ভগিনীস্বরূপিণী সূর্য্যমুখীর গৃহে থাকিয়া সূর্য্যমুখীর স্বামীধনে হাত বাড়াইয়া কৃতজ্ঞতার শিরশ্চর্ব্বন করে। নগেন্দ্র একদিন কুন্দকে জিজ্ঞাসা করিলে—"কুন্দ তুমি কুন্দ তাহাতে স্পষ্ট উত্তর দিয়াছিল.—'না'। এইধারণা কুন্দ নগেন্দ্রের বরাবর রাখিতে পারিলে এ সর্ব্বনাশ হইত না, কুন্দকেও আত্মহত্যা করিতে হইত না। অন্তরের পাপবহ্নি গোপনে অন্তরে রাখাই উচিত ছিল। তুষানলে যদি প্রাণ পুড়িয়া যাইত সেও ভাল হইত,—নগেন্দ্রের পরিণয় সরোবরে অবগাহন করিয়া জ্বালা জড়াইতে জ্বালা বাড়াইয়া কুন্দ ভাল করে নাই। কিন্তু কুন্দের এই 'না' কথা বড় সুন্দর, বড় মধুর। কুন্দের মুখে সাবধানতায় হৌক অসাবধানতায় হৌক এই 'না' কথা নির্গত হইয়া কুন্দচরিত্র উজ্জ্বলস্ফুরণ করিয়াছে। এই মিথ্যা কথা, সরলা বালিকার মিথ্যা কথা, প্রণয়িনীর প্রণয়ীর কাছে গোপনে মিথ্যা কথায় এত দিব্যদৃষ্টি এত স্বার্থত্যাগ আর কোথাও দেখি নাই, কোথাও শুনি নাই শুধু সেক্ষপীয়রের ডেস্‌ডিমেনার মুখে এমনি কথা একবার শুনা যায়—

Emil : O, who hath done this deed ?
Des : No body ; I myself ; farewell ;
Commend me to my kind Lord ; o, farewell.

(Othello. Act V. Se II)

এমন একটা মিথ্যা কথায় স্বর্গের রুদ্ধদ্বার খুলিয়া যায়, মুক্তদ্বার রুদ্ধ হওয়া দূরের কথা। "ভালবাসি না" বলিলে যদি নগেন্দ্র অসৎ পথহইতে ফিরে, তাহা হইলে সূর্য্যমুখীর সর্ব্বনাশ হয় না, ইহাতে এ যজ্ঞে কুন্দ, আপনা প্রাণ আহুতি দিতেও প্রস্তুত, দেখিতে পাই। কুন্দের কর্ত্তব্যজ্ঞান, ধর্ম্মজ্ঞান, কৃতজ্ঞতাধ্যান এখানে বড় উজ্জ্বল,ডেস্‌ডিমেনার আরও সুন্দর,আরও উজ্জ্বল, ডেস্‌ডিমেনা আপনিই আহুতি—আহুত পড়িয়া আপনার প্রাণ দিয়া প্রাণের প্রাণকে বাঁচায়। কাব্যজগতে এমন চিত্র আর নাই। কুন্দ রোহিণীর তুলনায় কাকে বাড়াইলাম কাকে নামাইলাম তাহা সাধারণে এখন বুঝুন।

উপসংহারে, বিষবৃক্ষ—বাঙ্গালা উপন্যাস নয় কেন, তাহা বলিয়া প্রতিশ্রুতি পূরণ করিয়া আজিকার মত বিদায় লইব। পিতৃতুল্য অভিভাবক নগেন্দ্রের অপত্যবিশেষ কুন্দের ভল্লগামী হওয়া—কুন্দের বিধবাবিবাহ—সূর্য্যমুখীর গৃহনিষ্ক্রমণ—নগেন্দ্রের সূর্য্যমুখীকে পুনর্গ্রহণ, এ সব হিন্দুসমাজের উপযোগী নহে,—হিন্দু সমাজে ইহার সকল গুলিই বিষম বিসদৃশ! "বাঙ্গালা উপন্যাস বলিতে বাঙ্গালিজাতি—হিন্দুজাতির জাতীয় চরিত্র সামাজিক চিত্রই বুঝি, অন্যথা, বাঙ্গালা উপন্যাস নহে বলায়" বুঝা উচিত কি বিষবৃক্ষ বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত নহে? বিষবৃক্ষ দ্বিতীয় শ্রেণীর উপন্যাস কেন, এ কথার কৈফিয়ৎও এখানে দিতে হইবে। যে উপন্যাস ইংরাজি ধরণে ইংরাজি ঢংএ ইংরাজি ভাবে ম্লেচ্ছ প্রকরণে লিখিত, তাহা বিশেষ শ্রেণীবাচক উপন্যাস, সার্ব্বভৌমিক নহে। প্রথম শ্রেণীর উপন্যাস বা উৎকৃষ্ট উপন্যাস বিশেষ শ্রেণীবাচক হয় না, general বা সার্ব্বভৌমিক হয়। সত্য সকলের পক্ষে সমান। উপন্যাসে, নাটকে, কাব্যে যদি কোন সত্য ঘোষিত হয়, তবে তাহার স্থান বিশাল জগতের সকল সমাজে! দৃষ্টান্তস্বরূপ মহাজনের একটা কথা বলিয়া আমার কথার উজ্জ্বল পোষক প্রমাণ দিলাম,—

Ham : You are the queen, your husband's brother's wife.

(Hamlet. Act III, Se IV)

এই যে কথা—স্বর্গীয় কথা—স্ত্রীলোকের এক পতিই পতি, জীবনে মরণে পতি সম্বন্ধ যায় না, পত্যন্তর গ্রহণ—ব্যভিচার,এ কথা পুত্রমুখে ম্লেচ্ছনাটককার ডাইভোর্স প্লাবিত দেশে গর্ব্বধারিণী জননীকে পর্য্যন্ত শুনাইতে ইতস্ততঃ করেন নাই। সত্য শত মিথ্যায় বিকৃত হয় না, ইহাপেক্ষা উজ্জ্বল প্রমাণ আর কোথায়? হিন্দু বিবাহের মূলমন্ত্রও এই—

"ধ্রুবমসি ধ্রুবা
অহং পতিকুলে ধ্রুবা"

এই পবিত্র সত্য ধ্যান করিতে করিতে আসুন আমরা সকলে পবিত্র হই!!

শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু।

কুলপুরোহিত

কলির প্রবলতায় আজকাল গ্রামে গ্রামে গৃহে গৃহে দলাদলী চলিতেছে। দলের বলে সময়ে সময়ে হিন্দু সমাজে জাতীয় পুরোহিতসম্বন্ধে অনেকে ঘৃণার ভাব প্রকাশ করিয়া থাকেন। সেই কর্ম্মটি কতদূর হিন্দুয়ানীর পোষক, তৎসম্বন্ধে সংক্ষেপে কয়েকটি কথার অনুস্মরণ করিয়া শাস্ত্রের তাৎপর্য্য গ্রহণ করা যাইতেছে।

পুরোহিত কে? এই বিষয়ের উত্তর একজন ব্রাহ্মণ। সে ব্রাহ্মণ কিরূপ, তাহা শব্দ শাস্ত্রে এইরূপ দেখা যায় ;- পুরস্ (দৃষ্টাদৃষ্টফলক কর্ম্মেতে)—ধা—(আরোপণ করা) + ত, কর্ম্ম-বাচ্যে ; অথবা পুরস্ (অগ্রে) স্থিত, ধৃত কিম্বা সম্মানিত,—ঋত্বিক্, পুরোধা, ধর্ম্ম-কর্ম্মাদিকারক, যাজক।

মন্বাদি সংহিতাকারগণ পুরোহিতের লক্ষণ এইরূপ লিখিয়াছেন ;

অগ্ন্যাধেয়ং পাকযজ্ঞানগ্নিষ্টোমাদিকান্ মখান্।
যঃ করোতি বৃতো যস্য স তস্যর্ত্বিগিহোচ্যতে॥

মনু ২ অঃ ১৪৩ শ্লোক॥

আহবনীয়াদ্যগ্ন্যুৎপাদকং কর্ম্ম অগ্ন্যাধেয়ং অষ্টকাদীন্, পাকযজ্ঞান্ অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞান্, কৃতবরণো যস্য যঃ করোতি স তস্য ঋত্বিগিহ শাস্ত্রেঽভিধীয়তে॥ ব্রহ্মচারিধর্ম্মেষনুপযুক্তমপি ঋত্বিক্ লক্ষণমাচার্য্যাদি বদৃত্বিজোঽপি মানত্বং দর্শয়িতুং প্রসাদুক্তং। (কুল্লুক)।

যিনি বৃত হইয়া কাহারও আহবনীয়াদি বহ্নি স্থাপন কর্ম্ম, অষ্টকাদি পাকযজ্ঞ ও অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ কার্য্য করিয়া থাকেন, তিনি তাহার ঋত্বিক্ অর্থাৎ পুরোহিত নামে কথিত হন। ব্রহ্মচারি-ধর্ম্মের মধ্যে পুরোহিতের লক্ষণ কথন অনুপযুক্ত হইলেও আচার্য্যাদির ন্যায় পুরোহিতের সম্মাননা দর্শাইবার জন্য ইহা কথিত হইল॥ ১৪৩॥ (ভরত)

স্মৃতি-উদ্বাহতত্ত্বে গোত্রোচ্চারণ-স্থলে রঘুনন্দন এইরূপ বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

"যমদগ্নিভরদ্বাজো বিশ্বামিত্রাত্রিগোতমাঃ।
বশিষ্ঠকাশ্যপাগস্ত্যা মুনয়ো গোত্রকারিণঃ।
এতেষাং যান্যপত্যানি তানি গোত্রানি মন্যতে॥

যমদগ্নিপ্রভৃতি ঋষিগণ গোত্রকারী। ইহাদের অপত্যগণের প্রকৃত গোত্র স্বীকার করা যায়। তাহার পর লিখিয়াছেন।

"এবঞ্চ যদি রাজন্য বিশাং প্রাতিস্বিকগোত্রাভাবাৎ প্রবরাভাব স্তথাপি পুরোহিতগাত্রপ্রবরৌ বেদিতব্যৌ।

নব্যস্মৃতি-উদ্বাহতত্ত্ব।

ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য পুরোহিতহইতে গোত্রও প্রবর পাইয়াছে বলিয়া, উহাদের গোত্রকে অতিদিষ্ট গোত্র বলে। শূদ্র ঐরূপ পূর্ব্ব-পুরোহিত হইতে গোত্রমাত্র পাইয়াছে বলিয়া, তাহাকে অতিদিষ্টাতিদিষ্ট গোত্র বলে। ফল কথা, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য দৈব ও পৈত্র্য কর্ম্ম করিবার জন্য পুরোহিত হইতে গোত্র প্রবর পাইয়াছে। শূদ্র কেবল শ্রাদ্ধ ও তর্পণ করিবার জন্য গোত্রমাত্র পাইয়াছে।

পৃথিবীতে যত প্রকার ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহারা মনুষ্যমাত্রেরই পূজ্য ; কিন্তু ঋত্বিক্ ততোধিক্ পূজ্য। যেহেতু তাঁহাহইতে গোত্র ও প্রবর লাভ হইয়াছে পিতৃগণ ও দেবগণও যাঁহাদ্বারা ভক্ষ্য বস্তু প্রাপ্ত হইয়া তৃপ্তি লাভ করিতেছেন ; তিনি কখন কেবলমাত্র ব্রাহ্মণইনহেন, পুরুপংক্তি

ভুক্ত। ঋত্বিক্দ্বারা নিজের সংস্কার এবং দৈব ও পৈত্র্য কর্ম্ম অনায়াসে সিদ্ধ করা যায় বলিয়াই তাঁহার এরূপ মহিমা। স্বয়ং অসমর্থ হইলে ঋত্বিক্দ্বারা পূর্ণফলান্বিত কর্ম্ম সম্পন্ন হইয়া থাকে। সে বিষয়ে স্মৃতির তিথিতত্ত্বে ও দুর্গোৎসবে রঘুনন্দন এইরূপ বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন ;—

"স্বয়ং করণাসামর্থ্যেঽন্যদ্বারা তথাবদ্দক্ষঃ।"

"স্বয়ং হোমে ফলং যত্তু তদন্যেন ন জায়তে॥
ঋত্বিক্ পুত্রোগুরুর্ভ্রাতা ভাগিনেয়োঽথবিট্‌পতিঃ।
এভিরেব হুতং যত্তু তদ্ধুতং স্বয়মেবহি॥
বিট্‌পতির্জামাতা এবঞ্চ ঋত্বিগাদিত্যত্র ফল ন্যূনতা॥"

স্বয়ং কর্ম্ম করিলে যে ফল হয়, অন্যদ্বারা তাহা হয় না ; কিন্তু ঋত্বিকাদিকর্ত্তৃক যাহা হুত হইয়া থাকে, তাহা স্বয়ং-কৃতের ন্যায় ফলপ্রদ হয়, ন্যূনতা হয় না। এই নিয়মে জানা যায়, ঋত্বিগাদি বচনোক্ত ছয় জন ভিন্ন অন্য লোককর্ত্তৃক প্রতিনিধি কর্ম্মে ফল হানি হইবে।

পুনঃ অন্যত্র——

"ঋত্বিক্ পুত্রোঽথবাপতিঃ শিষ্যোবাপি সহোদরঃ॥
প্রাপ্যা পূজাং বিশেষণে জুহুয়াদ্ বা যথাবিধিঃ॥"

কূর্ম্ম পুরাণ।

পূর্ব্ব পুরুষকৃত গোত্রদাতা কুলপুরোহিতভিন্ন অন্য প্রকারের পুরোহিতও দৃষ্ট হয়। তাঁহারা কুলপুরোহিত নহেন। তাঁহারা কর্ম্ম করিবার জন্য বরণকালহইতে দক্ষিণান্তপর্য্যন্ত পুরোহিত-পদ গ্রহণ করিয়া থাকেন। অথবা——

"নিক্ষিপ্যাগ্নিং স্বদারেষু পরিকল্প্যর্ত্বিজং তথা।
প্রবসেৎ কার্য্যবান্ বিপ্রো বৃথৈবনাচিরং ক্বচিৎ॥"

ইতি ছান্দোগপরিশিষ্টোক্তবদত্রাপি প্রতিনিধীয়তে॥

এবঞ্চ বরণং বিনাপি যদি কশ্চিৎ স্বয়ং প্রবর্ত্ততে তথাচ তৎ
কর্ম্ম-সিদ্ধি দক্ষিণাচ তস্মৈ শুচিকালে দাতব্যেতি॥

তথাচ বিবাদ-কল্পতরু-রত্নাকর-শান্তিদীপিকাসু নারদঃ,—

ঋত্বিক্ চ ত্রিবিধোদৃষ্টঃ পূর্ব্বৈর্বৃষ্টঃ স্বয়ং কৃতঃ।
যদৃচ্ছয়া চ যঃ কুর্য্যাদার্ত্বিজ্যং প্রীতিপূর্ব্বকং।

যদৃচ্ছয়া এতৎ প্রপঞ্চিতং শুদ্ধিতত্ত্বে, অতএব শঙ্খ লিখিতৌ ;—

রাজ্ঞা পুরোহিতোঽমত্যঃ শুদ্ধিস্তস্য তদাশ্রয়া॥

স্মৃতি—তিথিতত্ত্বে,দুর্গোৎসবে ও উদ্বাহতত্ত্বে কন্যাদানাধিকারে॥

টীকায় শ্রীকাশীরাম বাচস্পতি এইরূপ লিখিয়াছেন,—পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বপুরুষৈঃ, স্বয়ং-কৃত যজমানেন ঋত্বিক্ তেন বৃতঃ॥ এতৎ প্রপঞ্চিতমিতি তদ্যথা তদ্ভেদ প্রয়োজনন্তু তত্রৈব।

ঋত্বিক্যাজ্যমদুষ্টং য স্ত্যজেদনপকারিণং।
অদুষ্টমৃত্বিজং যাজ্যো বিনেয়ৌতা বুভাবপি।
ক্রমাগতষ্বেষ ধর্ম্মো বৃতেষ্বতিষ্কুদ স্বয়ং।
যাদৃচ্ছিকেতু সংযৈহে তত্যাগেনাস্তিকিল্বিষং।
বিনয়ৌ দণ্ডনীয়ৌ, সংযোহেপ্রেষনার্হে ঋত্বিজি।

ইত্যাদিকংশুদ্ধিতত্ত্বে উক্তং। তদ্ভেদ প্রয়োজনং
ঋত্বিগ্ভেদ প্রয়োজনং, তত্রৈব নারদং যজ্ঞপার্শ্বগ্রন্থএব।

ঋত্বিক্ তিন প্রকার,পূর্ব্ব পুরুষ কৃত এক প্রকার,নিজ কৃত অর্থাৎ কর্ম্ম করিবার জন্য কল্পিত এক প্রকার আর বিনাবরণে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হন এরূপ স্বতঃ-প্রবৃত্ত এক প্রকার। এই তিন প্রকার ঋত্বিকের মধ্যে, আদ্য পূর্ব্বপুরুষ কৃত অদুষ্ট ও অনপকারী ঋত্বিক্ ত্যাগযোগ্য নহে। অন্য দুইটি ত্যাগযোগ্য। শেষোক্ত দ্বিবিধ পুরোহিত কোন দোষযুক্ত হইলে দণ্ডযোগ্য কিন্তু পূর্ব্বকৃত ঋত্বিক্ কখন দণ্ডনীয় নহে। পূর্ব্বকৃত ঋত্বিকের ঋত্বিকত্ব কখনই ত্যাগ হইবে না। অপর পরবর্ত্তী দুইটির ঋত্বিকত্ব দক্ষিণান্তে ত্যাগ হইবে।

এই তিন প্রকার ঋত্বিক্ হইতে কার্য্যভেদে অনেক প্রকার ঋত্বিক্ হইয়া থাকে। তাহাদের অংশও পৃথক পৃথক শাস্ত্রে উল্লেখ আছে। পূর্ব্ব পুরুষকৃত কুলপুরোহিতই তন্মধ্যে সর্ব্ব প্রধান।

সর্ব্বেষামর্দ্ধিনো মুখ্যা স্তদর্দ্ধেনার্দ্ধিনোঽপরে।
তৃতীয়িন স্তৃতীয়াংশা শ্চতুর্থাংশাশ্চপাদিনঃ॥
মনু ৮ অঃ ২১০ শ্লোক।

ষোড়শ ঋত্বিক্-সাধ্য জ্যোতিষ্টোম-প্রকৃতিক যাগ বিশেষে গো-শত দক্ষিণার অংশ নিরূপণ করা আছে। উক্ত ষোড়শ ঋত্বিকের মধ্যে হোতা অধ্বর্য্যু, ব্রহ্মা ও উদ্‌গাতা এই চারিই প্রধান। ইঁহারা অষ্টচত্বারিংশৎ গো দক্ষিণা পাইবেন। এমতে ইঁহারা প্রত্যেকে দ্বাদশ দ্বাদশ করিয়া পাইবেন। মৈত্রাবরুণ প্রতিস্তোতা, ব্রাহ্মণাচ্ছংসি ও প্রস্তোতা ইঁহারা মুখ্যঋত্বিকের অর্দ্ধেক দক্ষিণা পাইবেন। অর্থাৎ চতুর্ব্বিংশতি গো দক্ষিণাভাগী হইবেন; প্রত্যেকে ছয় ছয় গো দক্ষিণা প্রাপ্ত হইবেন। অচ্ছাবাক্, নেষ্টা, অগ্নিধ্ ও প্রতিহর্ত্তা,—ইঁহারা মুখ্য ঋত্বিকের তৃতীয়ভাগী অর্থাৎ ষোড়শ গো দক্ষিণাভাগী সুতরাং প্রত্যেকে চারি চারি গো দক্ষিণা প্রাপ্ত হইবেন। প্রাবস্তুৎ, উন্নেতা, পোতা ও সুব্রহ্মণ্য এই চারি ঋত্বিক্ মুখ্য ঋত্বিকের চতুর্থভাগী হইবেন সকলে অর্থাৎ দ্বাদশ গো দক্ষিণা পাইবেন; সুতরাং প্রত্যেকে তিন তিন গো দক্ষিণা পাইবেন। মনু ৮অ (২১০ শ্লোক) এই বচনদ্বারা অনেকগুলি ঋত্বিক্ এবং তন্মধ্যে মুখ্যতম ঋত্বিক্ থাকার বেশ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

কুলপুরোহিত ত্যাগ করিলে রাজশাসনে শাসিত হইবারও বিধি আছে।

ঋত্বিজং যস্ত্যজেদ্ যাজ্যো যাজ্যং চর্ত্বিক্ত্যজেদ্ যদি।
শক্তং কর্ম্মণ্যদুষ্টং চ তয়োর্দ্দণ্ডং শতং শতং॥
মনু ৮ অঃ ৩৮৮ শ্লোক।

যে যজমান কর্ম্মানুষ্ঠানক্ষম ঋত্বিক্‌কে নিষ্কারণ ত্যাগ করে এবং পাতকাদি দোষরহিত যাজ্যকে যে পুরোহিত অকারণ ত্যাগ করে, রাজা ঐ উভয়ের এক এক শত পণ দণ্ড করিবেন। ইহাদ্বারা বেশ প্রতিপন্ন হইতেছে যে, পূর্ব্ব-পুরুষকৃত পুরোহিত অত্যাজ্য। ইনি এবং গুরু এক পদার্থ। ইহাঁদের সহিত যজমান ও শিষ্যের পরস্পর অশৌচ-সম্বন্ধ রহিয়াছে।

মাতৃস্বস্রমাতুলয়োঃ শ্বশ্রূশ্বশুরয়োগুরৌ।
ঋত্বিজে বা চোপরতে ত্রিরাত্রমিতি শিষ্যকে॥
প্রচেতাঃ। ব্যবস্থাসমুদ্র ২২৩ পৃষ্ঠা।

মাতৃস্বসা অর্থাৎ মাসী, মাতুল, শ্বশুর, শাশুড়ী, আচার্য্য,গুরু,পুরোহিত ও শিষ্য যদি আপনার গৃহে বা নিকটে মরে, তবে ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে।

মাতুলে পক্ষিণীং রাত্রিং শিষ্যর্ত্বিগ্‌বান্ধবেষু চ।
মনু, ব্যবস্থাকল্পদ্রুম ১০৬ পৃষ্ঠা।

মাতুল, শিষ্য, পুরোহিত ও বান্ধব—ইঁহাদের দাহাদি না করিলে, পক্ষিণী, দাহাদি করিলে

ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে। এ সকল বচনে যেরূপ বিধান দেখা যায়, তাহাতে পুরোহিত একটি মহান্ গুরুতর ব্যক্তি বলিয়া বোধ হইতেছে।

দান গ্রহণ-স্থলে যে সকল দান গ্রহণ করা ব্রাহ্মণের পক্ষে দোষ-জনক, তাহা পুরোহিত অবাধে গ্রহণ করিয়া যজমানের মঙ্গল কামনা করিয়া থাকেন। যদি ঋত্বিকের এ ক্ষমতা না থাকিত, তাহা হইলে কেবল ব্রাহ্মণদ্বারা অনেক কর্ম্ম অসম্পন্ন থাকিয়া যাইত।

ছাগাশ্বতৈলমাতঙ্গধেনুসীসক লৌহকান্।
ব্রাহ্মণঃ প্রতিগৃহ্নন্বৈ সদ্যশ্চণ্ডালতাং ব্রজেৎ॥
স্মৃতি।

ছাগ, ঘোড়া, তৈল, হস্তী, সবৎসাগাভী, সীসা, লোহা—এই সকল দ্রব্য ব্রাহ্মণে গ্রহণ করিলে সদ্য চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইবেন। এখানে সন্দেহ হইতে পারে যে, ব্রাহ্মণই দানের পাত্র; এই সকল দান যদি ব্রাহ্মণকে দান না করেন, তবে আর কাহাকে দান করা যাইবে? ব্রাহ্মণে গ্রহণ করিলেও তিনি পতিত হইবেন। এ স্থলের সার তাৎপর্য্য এই যে ব্রাহ্মণমাত্রেই এই সকল দান গ্রহণ করিবেন না; যজমানের যাঁহার সহিত ঋত্বিগত্ব সম্বন্ধ আছে, তিনিই ঐ সকল দান গ্রহণ করিবেন। ঋত্বিক্ ভিন্ন অন্য ব্রাহ্মণকে নিষেধ করিবার জন্য এ বচন বলা হইয়াছে। ঋত্বিকের প্রতি বিধান ঐ স্মৃতিতেই ধরিয়া গিয়াছেন।

"হোম-দক্ষিণা চ স্বয়ং হোতৃপক্ষে ব্রাহ্মণে দেয়া।
ব্রাহ্মণে দক্ষিণা দেয়া যত্র যাপয়ি কীর্ত্তিতা।
কর্ম্মান্তেঽনুচ্যমানায়াং পূর্ণপাত্রাদিকা ভবেৎ॥

এই সকল দক্ষিণা কর্ম্মান্তে হোতৃপক্ষ ব্রাহ্মণগণকে দিবে। আরও মৎস্যপুরাণে এরূপ লিখিয়াছেন,—

যজমান সপত্নিক ঋত্বিজস্তান্ সমাহিতঃ।
দক্ষিণাভিঃ প্রযত্নেন পূজয়েদ্‌গতবিস্ময়ঃ॥

যজমান পত্নীর সহিত সন্দেহহীন হইয়া দক্ষিণাদিদ্বারা যত্নের সহিত ঋত্বিক সকলকে পূজা করিবে।

যজমান যথাশক্তি সৎকার করিয়া ঋত্বিক্‌গণকে ভোজন করাইয়া দক্ষিণা দিবে। দক্ষিণা-সম্বন্ধে মুখ্যের শ্রেষ্ঠাংশ, অন্যের ক্রমে ক্রমে ন্যূন হইবে; তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ঋত্বিক্‌গণ ভিন্ন বৃহৎ কর্ম্মের দান দক্ষিণা অন্য ব্রাহ্মণমাত্রেই গ্রহণ করিতে পারিবেন না। ইহাতে ঋত্বিকের বিশেষ গুরুত্ব দেখা যাইতেছে। ঋত্বিক্‌গণের মধ্যে কুলপুরোহিতর আরও গুরুত্ব দেখা যাইতেছে।

পুরাণাদি আলোচনা করিলে ঋত্বিকের অনেক মহিমা পাওয়া যায়। যাঁহাহইতে গোত্র, যাঁহা হইতে ইহপরকালের সুখ লাভ হইয়াছে, যিনি গমনভোজনাদিতেও সদা বিঘ্ন-নিবারণ করিতেছেন, তিনি কি সামান্য মর্য্যাদার পাত্র? ত্রেতাযুগে রামচন্দ্রের বশিষ্ঠ লইয়া বনে পিতৃশ্রাদ্ধ করা ও দ্বাপর যুগে যুধিষ্ঠিররের ধৌম্য লইয়া বনগমন করাই ঋত্বিক্ রাখিবার নির্ম্মল উদাহরণ বিরাজ করিতেছে। অতএব হিন্দুত্ব হারাইবার আশা ত্যাগ করিয়া ঋত্বিকের শরণ অবশ্য লওয়া কর্ত্তব্য। ঋত্বিক্‌কে সাধারণ ব্রাহ্মণ জ্ঞান করা পাষণ্ডতামাত্র। যাঁহারা ভ্রমে পড়িয়াছেন, তাঁহারা ভ্রম সংশোধন করুন।

শ্রীযজ্ঞেশ্বর সান্দকী,—শ্যামগঞ্জ চতুষ্পাঠী।

ইংরাজী মনোবিজ্ঞান ও ন্যায়শাস্ত্রের সারসঙ্কলন

(৩।১৭১ পৃষ্ঠার পর)

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, অভিলষিত বস্তুরূপে মানবের পূর্ণতা এবং উপায়রূপে অর্থাৎ লভ্য বস্তুর সংগ্রহার্থ যন্ত্ররূপে মানবের পুর্ণতা—এ দুটী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদার্থ। শুদ্ধ স্বতন্ত্র নহে, ইহাদের একের সহিত অপরের ঠিক বিপরীত সম্বন্ধ; সুতরাং উভয়ের প্রাপ্তি-উপযোগী শিক্ষাও স্বতন্ত্র। উচ্চ শিক্ষা ও ব্যবসায়োপযোগী শিক্ষা—এই দুই নামেই সাধারণতঃ ঐ দুই প্রকারের শিক্ষা অভিহিত হইয়া থাকে। এমন দুই-একটী ব্যবসায় আছে, যাহাদের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মানব-হৃদয়ের অনেকগুলি উচ্চতর বৃত্তির উৎকর্ষতা-সাধন এরূপ ভাবে সংশ্লিষ্ট যে, ঐ সমস্ত ব্যবসায়ে জ্ঞানলাভ করিতে হইলে, পূর্ব্ব কথিত উচ্চ শিক্ষার অল্পাধিক প্রয়োজন হয় এবং সেই জন্যই উহাদিগকে সম্ভ্রান্ত বা উচ্চ অঙ্গের ব্যবসায় কহে; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে এ প্রকারের ব্যবসায় অতি অল্প এবং অনেক সময়েই ইহাদের দ্বারা আত্মোন্নতিরূপ মানব জীবনের প্রধানতম লক্ষ্য পদার্থ অতি সামান্যরূপেই লব্ধ হইয়া থাকে।

মানব সমাজে সাধারণতঃ লক্ষিত ভ্রম দুইটীর মধ্যে প্রথমটীর সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত আলোচনা করা গেল, এক্ষণে দ্বিতীয়টী সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। জ্ঞান ও মনোবৃত্তির ঔৎকর্য্য-সাধন, এই উভয়ের মধ্যে প্রত্যেকটী যে অপরটীর অধীন, ইহা অনেকেই অস্বীকার করেন। পক্ষান্তরে তাঁহারা মনে করেন যে বুদ্ধি-বৃত্তির ঔৎকর্য্য-সাধন কেবলমাত্র জ্ঞানোপার্জ্জনের জন্যই প্রয়োজনীয়। বস্তুতঃ অনুধাবন করিয়া দেখিলে, যাহা বুঝিতে পারা যায় তাহা সম্পূর্ণ বিপরীত। প্রথমতঃ জ্ঞানোপার্জ্জন এবং বুদ্ধিবৃত্তির ঔৎকর্য্য-সাধন—এই দুটী কখনই এক পদার্থ নহে। দ্বিতীয়তঃ মনোবৃত্তির ঔৎকর্য্য-সাধনের সহিত তুলনা করিলে, জ্ঞানোপার্জ্জন যে কেবল তাহার উপায়ভিন্ন অপর কিছুই নহে, ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। তৃতীয়তঃ মানবান্তঃকরণের আভ্যন্তরীণ অনুশীলন ব্যতীত অপর কোন বিষয়েরই অনুশীলনদ্বারা মনোবৃত্তির ঔৎকর্য্য-সাধন পূর্ণমাত্রায় সম্পাদিত হয় না। পাঠকগণের সন্দেহ দূরীকরণার্থ জ্ঞান ও মনোবৃত্তির ঔৎকর্য্য-সাধন—এই দুটীর বিশেষ পার্থক্য দেখাইয়া দিতেছি।

সত্য অর্থাৎ জ্ঞাতব্য বিষয় সমষ্টির অবগতিকে আমি জ্ঞান বলি এবং মানব হৃদয়ের উচ্চতর বৃত্তিগুলির প্রকৃষ্ট অনুশীলনদ্বারা যে সমস্ত বিভিন্ন প্রকারের কালব্যাপিনী ও তেজস্বিনী মানসিক ক্ষমতা জন্মে, তাহাকেই মনোবৃত্তির ঔৎকর্ষ্য বলি। যে পরিমাণে মনোবৃত্তির পরিচালনা হইবে, সেই পরিমাণেই উহার ঔৎকর্ষ্য সাধিত হইবে; কিন্তু জ্ঞানের পরিমাণের সহিত ইহার সামঞ্জস্য কখনই সম্ভবে না, কারণ একটি জ্ঞাতব্য বিষয় আয়ত্ত করিতে গেলে, যেমন কিছু অধিক পরিমাণে মানসিক আলোচনার প্রয়োজন; সেইরূপ আবার অপর একটী জ্ঞাতব্য বিষয় আয়ত্ত করিতে গেলে, অতি অল্পপরিমাণে মানসিক আলোচনার প্রয়োজন হয় কোন নূতন বিষয় আবিষ্কার করিতে গেলে, যেমন পূর্ণমাত্রায় বলবতী মানসিক চর্চ্চার আবশ্যক তেমনি আবার আবিষ্কৃত বিষয়ের জ্ঞানলাভ করিতে অতি সামান্য মানসিক পরিমাণে চর্চ্চার প্রয়োজন হয়।

এক্ষণে পূর্ব্বকথিত মনোবৃত্তির অনুশীলন এবং জ্ঞান লাভ—এ উভয়ের মধ্যে কোন্‌টী প্রধান অর্থাৎ কোন্‌টী কোন্‌টীর অধীন এক্ষণে ইহাই দ্রষ্টব্য এবং এই প্রশ্নের মীমাংসাই সমগ্র দর্শন-শাস্ত্রমধ্যে সর্ব্বাগ্রগণ্য ও প্রধানতম বিবেচ্য বিষয়। সহসা দেখিতে গেলে এরূপ

আলোচনাকে যেন অত্যন্ত অন্যায় ও অসঙ্গত আলোচনা বলিয়া বোধ হয়; কারণ জ্ঞানোপার্জ্জন অপেক্ষা জ্ঞানোপার্জ্জনার্থ মনোবৃত্তির অনুশীলনকে উচ্চস্থান দিতে গেলে, লভ্য পদার্থ অপেক্ষা লভ্য পদার্থের সংগ্রহার্থ উপায়কে উচ্চস্থান দিতে হয়; কিন্তু একটু স্থিরভাবে বিবেচনা করিলে সে সমস্যা একেবারেই দূর হইয়া যায়।

জ্ঞান দুই প্রকার,—কর্ম্ম-প্রসূত এবং চিন্তা-প্রসূত। কর্ম্ম-প্রসূত জ্ঞানে আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাই যে, জ্ঞাতব্য বিষয়ই যে অভিলষিত বস্তু, তাহা নহে; জ্ঞানলাভদ্বারা উক্ত জ্ঞানকে কার্য্যে পরিণত-করণই অভিলষিতবস্তু। ধর্ম্মজ্ঞানই হউক বা রাজনৈতিক জ্ঞানই হউক, আলোচনাদ্বারা কার্য্যে পরিণত করা-ভিন্ন ইহাদের অপর কোন স্বার্থকতা নাই। পক্ষান্তরে চিন্তাপ্রসূত জ্ঞান সম্বন্ধেও এইরূপ; কারণ পূর্ব্ববর্ত্তী চিন্তাশক্তির আলোচনার জন্যই চিন্তাপ্রসূত জ্ঞান মূল্যবান্। প্রসিদ্ধ দর্শনবিদ্যাবিৎ পণ্ডিত সেনেকা বলিয়াছেন যে, জ্ঞাতব্য বিষয় যে মুহূর্ত্তেই আবিষ্কৃত হয়, সেই মুহূর্ত্তেই তাহার স্বার্থকতা একেবারেই দূর হইয়া যায়; কারণ সেই মুহূর্ত্তেই তাহার লাভের জন্য মনোবৃত্তির কালব্যাপিনী, উদ্যমশীলা এবং বলবতী আলোচনা একেবারেই রহিত হইয়া যায়। অতএব স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, সকল দিকেই লভ্যবস্তুর প্রাপ্তি অপেক্ষা তৎপূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনাই শ্রেষ্ঠ পদার্থ।

যাহা বিজ্ঞান-শাস্ত্রানুমোদিত অর্থাৎ বিজ্ঞান-শাস্ত্রানুসারে যাহা সত্য, লক্ষ্য করিয়া দেখিলে মানবের ক্রিয়াকলাপের মধ্যেও তাহা যথার্থ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত প্যাস্কাল বলিয়াছেন, আমরা মনে মনে ভাবি যে আমরা কেবল শান্তিরই অনুসন্ধান করি; কিন্তু বস্তুতঃ আমরা কেবল অস্থিরতা বা অশান্তির অনুসন্ধান করিয়া বেড়াই। সুবিখ্যাত জগদ্বিজয়ী আলেক্‌জণ্ডার মনে করিতেন, তাঁহার আকাঙ্ক্ষিত অর্দ্ধ-পৃথিবী জয় করা হইলে তিনি হৃদয়ে শান্তি পাইবেন এবং তিনি কেবল সেই শান্তিই অনুসন্ধানেই ব্যস্ত থাকিতেন, কিন্তু তখন তিনি বিন্দুমাত্রও বুঝিতে পারেন নাই যে, অর্দ্ধ পৃথিবীর আধিপত্য অর্পিণী শান্তি খুঁজিতে গিয়া বস্তুতঃ তিনি অপরার্দ্ধের জয়োদ্যোগরূপিণী অশান্তি ও অস্থিরতাকেই খুজিতেছেন। বীরের হৃদয় কেবল যুদ্ধেই সন্তুষ্ট থাকে, যুদ্ধান্তে জয়লাভ হইলে কখনই সেরূপ থাকে না। কি ক্রীড়া, কি পশু-শীকার, কি সত্যান্বেষণ, সকলই একপ্রকার। মানব-জীবনের প্রত্যেক কার্য্যই ঐ একই নিয়মে পরিচালিত, ইহাহইতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, কোন বস্তুর জ্ঞানলাভ অপেক্ষা উক্ত বস্তুর জ্ঞানলাভার্থ বিবেক ও বুদ্ধিশক্তির পরিচালনাই অপ্রকাশ্যভাবে সর্ব্বত্র মানবের আদরণীয় এবং প্রকৃত উপকারী। বহির্জগতের সমস্ত ঘটনা এত সুস্পষ্টরূপে পরিদৃশ্যমান্ যে কোন এক ব্যক্তি সে সমস্তগুলির জ্ঞানলাভ করিতে পারিলে, অপরাপর ব্যক্তি তাহার দৃষ্ট বস্তুর বর্ণনাহইতে সহজেই উক্ত বস্তুসকলের জ্ঞানলাভ করিতে পারেন; কিন্তু অন্তর্জগতের অবস্থা সেরূপ নহে। সেখানকার ঘটনাবলী কখনই পরিষ্কৃতরূপে বর্ণনা করা সম্ভবে না। অন্তর্জগতের জ্ঞানলাভ সম্বন্ধে পূর্ব্ব-দর্শক কেবল এইমাত্র বলিতে পারেন যে, যে ভাবে এবং যে নিয়মে চিন্তা করিয়া তিনি তত্রস্থ নানাবিধ বিচিত্র জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, সেই সমস্ত উপায় ও পদ্ধতি দেখাইয়া দিয়া যাহাতে অপরাপর ব্যক্তি সেই পথাবলম্বী হইয়া তাঁহারই মত জ্ঞানলাভে ক্ষমতাশালী হইতে পারে, তিনি তাহারই উপায় করিতে পারেন; সুতরাং দর্শনশাস্ত্রদ্বারা কেবল অন্তর্জগতের ভিন্নভিন্ন জ্ঞানলাভের উপায়স্বরূপ মনোবৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা করিতে শিক্ষা পাওয়া যায়। (ক্রমশঃ)

শ্রীশরচ্চন্দ্র রায় চৌধুরী বি, এ, বি, এল্‌

রামকৃষ্ণ পরমহংস অবতার কি না ?*

অদ্য আমি যে প্রস্তাব লইয়া সাধারণ সমীপে উপস্থিত হইয়াছি, তাহা বর্ত্তমান কালের বিশেষতঃ পাশ্চাত্য সভ্যতা এবং বিবিধ বৈজ্ঞানিক শিক্ষার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধভাবাপন্ন, তদ্বিষয়ে কিছুই সন্দেহ নাই ; কিন্তু আমাদের শাস্ত্রমতে এরূপ কথা নূতন কিম্বা বিজাতীয় নহে। রামকৃষ্ণদেব পরমহংস কিম্বা তিনি অবতাররূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এ প্রসঙ্গ লইয়া যদিও প্রকাশ্যরূপে আন্দোলন করা হয় নাই কিন্তু এক হিসাবে তাহাও হইয়া গিয়াছে। ১২৯৭ সালে রামকৃষ্ণদেবের জীবনবৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার পরিশিষ্টে আমি অবতারবাদসম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছি। এতদ্ভিন্ন রামকৃষ্ণসম্বন্ধীয় বিবিধ প্রকাশ্য মহোৎসবাদি এবং তাঁহার সেবকদিগদ্বারা ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বস্থানে এই বিষয় লইয়া বিশেষ আন্দোলন হইতেছে, এমন কি স্থানে স্থানে তাঁহার মূর্ত্তির নিত্য পূজা এবং নির্দ্দিষ্ট উৎসবাদি সম্পন্ন হইতেছে। এ কথা সাধারণের অবিদিত নাই। এই নিমিত্ত আমার অদ্যকার প্রস্তাব যে একেবারে সম্পূর্ণ নূতন তাহা কখনই নহে।

যদিও স্থানে স্থানে রামকৃষ্ণের পূজাদি ও তাঁহাকে ভগবান্ জ্ঞান করিয়া অনেকে দিন যাপন করিতেছেন কিন্তু সর্ব্বদাই এ বিষয়ে নানাবিধ তর্কবিতর্কও হয়, অনেক সময়ে অনেকে অনেক কথাই বলিয়া থাকেন, অনেকে তাঁহাকে সিদ্ধ পুরুষ এবং প্রকৃত পরমহংস জ্ঞান করিয়া ভগবানে পর্য্যবসিত করেন। কখন কখন তাঁহাকে সামান্য জীবশ্রেণীর অন্তর্গত করিয়া অনেকে অপরিমিত নিন্দা রটনা করিয়া থাকেন। সাধারণের এই সাধারণ সংস্কার মীমাংসা হওয়া আবশ্যক ; কিন্তু তাহার মীমাংসক কে ? আমরা কেহই সে পদের যোগ্য নহি। জীবদ্বারা তাহা কখন সম্পাদিত হইতে পারে না। রামকৃষ্ণদেব বলিতেন, "যেমন অন্ধকার রাত্রিতে পাহারাওয়ালা নিজ আলোকদ্বারা ইচ্ছানুসারে সকলদিকের পদার্থ দেখিতে পায় কিন্তু সেই আলোকটী আপনার প্রতি ঘুরাইয়া না ধরিলে তাহাকে কেহই দেখিতে পায় না !" অথবা কাহার, "কি ঐশ্বর্য্য আছে কাহার কতগুলি কোম্পানীর কাগজ আছে, তিনি যাহাকে সিন্দুক খুলিয়া দেখাইয়া দেন, সেই ব্যক্তিই তাহা জ্ঞাত হইয়া থাকে। কেবল বাহিরের অবস্থা দেখিয়া কোন প্রকার সিদ্ধান্ত (যেমন আমরা সর্ব্বদা করিয়া থাকি) তাহা সম্পূর্ণ বাহিরের কথা মাত্র।" সেইরূপ ভগবানসম্বন্ধে জানিতে হইলে, তাঁহার নিজ মুখের কথা শ্রবণ করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। রামকৃষ্ণের বৃত্তান্ত যাহা আমি বলিব, তাহা আমার কথা নহে, আমার শোনা কথাও নহে, তাহা তাঁহার শ্রীমুখের কথা জানিবেন তাঁহার কথা কিন্তু কেবল তাহাই যে আমি অন্ধ-বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া বাতুলতা করিতে আসিয়াছি তাহা নহে। তাঁহার কথা, হিন্দুশাস্ত্র, বর্ত্তমান শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক বিচার এবং প্রত্যক্ষ ফলদ্বারা তাহার যে সিদ্ধান্ত প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাই অদ্য বর্ণনা করিতে প্রয়াস পাইব। যদ্যপি তাঁহার ইচ্ছা হইয়া থাকে, যে সর্ব্বসাধারণে তাঁহাকে ধারণা করিতে শিক্ষা করুক, তাহা হইলে আপনারা তাহা বুঝিতে পারিবেন। যদ্যপি তাহা না হয় তবে বুঝিবেন যে এখন সময় হয় নাই। তাঁহাকে অবতার বলিয়া বুঝিতে পারুন বা নাই পারুন, এই উভয়স্থলেই আমার দোষ বা গুণের কোন কথা গণনায়

* ১২৯৯ ১৯শে চৈত্র শুক্রবার ষ্টার থিয়েটারে শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই বিষয়টি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। এ প্রস্তাব সম্বন্ধে কোন বাদ প্রতিবাদ গৃহীত হইবে না। সা-ক সং।

স্থান দিবেন না ; অর্থাৎ আমি যন্ত্রবিশেষ, কার্য্য করা তাঁহারই কার্য্য। তাঁহার উপদেশে আছে, "যেমন ঘটীর ছাদে জল পড়িলে কোথাও বাঘের মুখ এবং কোথাও নলের মধ্য দিয়া বাহির হয় বাঘের মুখ বা নল জলের কারণ নহে।" সেইরূপ বর্ত্তমান ক্ষেত্রও বুঝিতে হইবে।

সে যাহা হউক এক্ষণে আমাদের অদ্যকার আলোচ্য বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতেছি। এই বিষয়টী পূর্ব্বকথিতমতে তিনভাগে বিভক্ত করা যাইতেছে, রামকৃষ্ণ পরমহংস অবতার কি না ? তদ্বিষয়ে ১ম শাস্ত্রীয়, ২য় বৈজ্ঞানিক এবং ৩য় প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

১ম। শাস্ত্রীয় প্রমাণ।

গীতায় কথিত হইয়াছে যে ;—

যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥

অর্থাৎ—যে যে সময়ে ধর্ম্মের নিন্দা এবং অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়, সেই সময়ে নিমিত্ত আপনার স্বরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকি। এবং—

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

অর্থাৎ—সাধুদিগের পরিত্রাণ দুর্বৃত্তদিগের বিনাশ ও ধর্ম্মস্থাপনের নিমিত্ত আমি যুগে যুগে আবির্ভূত হইয়া থাকি।

হিন্দুদিগের এই পরম রত্ন গীতা, ভগবান শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক প্রকটিত হইয়াছে সুতরাং ইহা কাহার অন্যথা করিবার অধিকার নাই। অতএব শাস্ত্রান্তরকথিত দশাবতারাদি ব্যতীত অন্য অবতার হইতে যে পারে না তাহা কখন স্বীকার করা যায় না। যেহেতু গীতার উল্লেখিত শ্লোকদ্বয়ে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, "ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের অভ্যুদয় ও সাধুদিগের পরিত্রাণ এবং অসাধুদিগকে দলন করিবার নিমিত্ত যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকি।" এই শ্লোকদ্বয়ে কারণ এবং কার্য্য উভয়ই বর্ত্তমান আছে। কারণ অর্থাৎ পৃথিবীর অবস্থা কার্য্য ভগবানের অবতরণ। এক্ষণে এই শ্লোকদ্বয়ে, কার্য্যকারণ ভাব আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা এবং রামকৃষ্ণের প্রতি প্রয়োগ করিয়া বিচার করিলে কি ফল হয় তাহা পর্য্যালোচনা করা কর্ত্তব্য।

বর্ত্তমান কালে ধর্ম্মের অবস্থা বিচার করিলে আমাদের ধর্ম্মের কি শোচনীয়াবস্থা উপস্থিত হইয়াছে তাহা প্রত্যেক ধর্ম্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তির অজ্ঞাত বিষয় নহে। ধর্ম্ম পদার্থটা কি ? ঈশ্বর কেমন ? তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় কি না ? তাঁহার স্বরূপ কি প্রকার ? তিনি সাকার নিরাকার কিম্বা কালী দুর্গা শিব মনসা মাকাল এবং এই জীবনে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়া মনুষ্যদেহের কর্ত্তব্য সাধনহইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় কি না ? ইত্যাকার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে সাধারণ মানবসমাজে ইহাদের মীমাংসা একেবারে দুষ্প্রাপ্য। একদা বর্দ্ধমান রাজদরবারে কতিপয় ব্রাহ্মণ, শিবকে বিষ্ণু অপেক্ষা এবং আর কতকগুলি ব্রাহ্মণ বিষ্ণুকে শিবঅপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। রাজসভার পণ্ডিতেরা ইহার সন্তোষজনক মীমাংসা করিতে না পারায় মহারাজা লজ্জিত হইয়া কলিকাতাহইতে জনৈক পণ্ডিতবরকে নিমন্ত্রণপূর্ব্বক লইয়া যান এবং তাঁহার প্রতি হরহরির শ্রেষ্ঠতাসম্বন্ধীয় বিচারের ভার অর্পণ করেন। সুবিবেচক পণ্ডিত মহাশয় এই কথা শ্রবণ করিয়া অতি বিনীতভাবে বলিয়াছিলেন যে মহারাজ! আমার প্রতি এ গুরুতর ভার কিজন্য প্রদত্ত হইল ! আমার সহিত শিবের কিম্বা বিষ্ণুর কোন পুরুষে দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই ; কাহাকে বড় ছোট বলিব ! যদি কখন তাঁহাদের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়

ফিরিয়া আসিয়া শিব বড় কি বিষ্ণু বড়, এবিষয়ের মীমাংসা করিয়া দিব। তাঁহার কথায় সকলের ভ্রম বিদূরিত হইল এবং সকলে বুঝিলেন, যে শাস্ত্রীয় বিচার এবং ভাব, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বিষয়। আমাদের দেশে শাস্ত্রের,শাস্ত্রের দ্বারা মীমাংসা হইতে পারে কিন্তু ভাব লইয়া আন্দোলন করিতে যাইলে সকল দিক শূন্যময় হইয়া আইসে। এই নিমিত্ত আমাদের দেশে ধর্ম্মশাস্ত্র লইয়া এত গণ্ড-গোল চলিতেছে। প্রত্যেক ব্যক্তির স্বতন্ত্র ধর্ম্ম বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না এবং সকলেই নিজ নিজ ধর্ম্মকে অন্যান্য যাবতীয় ধর্ম্মহইতে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করেন। সুতরাং পরস্পর দ্বেষাদ্বেষীর ভাব সর্ব্বদা বলবতী দেখা যায়। এই নিমিত্ত আমাদের মধ্যে ধর্ম্ম লইয়া সময়ে সময়ে কত বিশৃঙ্খলা ঘটিতেছে এবং কত বাদানুবাদ চলিতেছে। বৈষ্ণব বলেন আমার ধর্ম্মাপেক্ষা সুমার্জ্জিত ধর্ম্ম আর নাই, শাক্ত তাহার ঠিক বিপরীত ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন শৈবের সহিত কাহার মিল নাই, বৈদান্তিক ব্রহ্মজ্ঞানীর কথা স্বতন্ত্র প্রকার, তন্ত্রের বিচিত্র কাহিনী,গৌরাঙ্গীয় কর্ত্তাভজা, বাউল, দরবেশ, নবরসিক সম্প্রদায়ের ব্যাপার এবং আধুনিক ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা তত্ত্বের তত্ত্ববোধ করিতে যাইলে কি বিভীষিকা সমুৎপন্ন হয় তাহা যিনি এক দণ্ড চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন তিনিই কিয়ৎ পরিমাণে বুঝিতে পারিয়াছেন। যাহার নিকটে যাইয়া ধর্ম্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করা যায় তিনিই পৃথিবীর সমুদয় ধর্ম্মসম্প্রদায়কে ভ্রমাবৃত্ত দেখাইয়া আপনার ধর্ম্মকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সত্য বলিয়া সাব্যস্ত করিয়া দেন। এইরূপে সকলেই নিজ নিজ ধর্ম্মের গৌরব বিস্তার করিয়া পরস্পরের ধর্ম্মকে অবজ্ঞা করিলে সত্য অনুসন্ধানকারীর তরুণ মনে কি হইবে? তাহার হৃদয় শুষ্কপ্রায় ও মন আশঙ্কায় অভিভূত হইয়া পড়িবে। সে কোথায় যাইবে এবং কাহার কথায় বিশ্বাস করিবে এই ভাবিয়া আকুলিত হইয়া থাকে। যাহারা সত্য অনুসন্ধান করেন তাঁহারাই সাধু। এইরূপ সাধুরা ভগবানের জন্য যখন নিতান্ত ব্যাকুলিত হন ভগবান তখন তাহাদের নিমিত্ত অবতীর্ণ হইতে বাধ্য হইয়া থাকেন।

আমাদের দেশের যে প্রকার ধর্ম্মের ভাব তাহাতে তাহার বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে, একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। যদ্যপি কাহার প্রকৃত ধর্ম্মবোধ হয় তাহার ধর্ম্ম কি কেবল অন্য ধর্ম্মকে নিন্দা করায় পরিণত হইবে? ইহাকেই কি সনাতন হিন্দুধর্ম্ম কহে? তাহা কখন নহে। অতএব ধর্ম্মের গ্লানি হওয়া বর্ত্তমান কালের অবস্থা বুঝা গেল।

হিন্দুসম্প্রদায়ব্যতীত অন্যান্য শ্রেণীর ধর্ম্মেরও সংখ্যা নাই এবং সেই সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের আবার অগণন শাখা ও উপশাখা বাহির হইয়া গিয়াছে। প্রত্যেক মূল ও শাখা প্রশাখা ধর্ম্মের দোহাই দিয়া লক্ষ লক্ষ লোক অবস্থিতি করিতেছেন। কিন্তু কয়জনের মুখে এক সত্য সকল ধর্ম্মের মেরুদণ্ড এ কথা শ্রবণ করা যায়? কে বলেন যে যে যাহা করিতেছ সকলই সত্য? কে বলিতেছেন যে, উপাস্য দেবতা প্রত্যেকের এক অদ্বিতীয় ভগবান। যখন ধর্ম্ম লইয়া ছোট বড় বিচার চলিতেছে তাঁহাদের তখন ধর্ম্মের মর্ম্মবোধ হয় নাই একথা সিদ্ধান্ত না করা যাইবে কেন? সুতরাং এরূপ অবস্থায় ধর্ম্মরাজ্যের বিশৃঙ্খলতা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। ধর্ম্মের বিপর্য্যয় হইলে ধর্ম্মস্থাপন করা ও সত্যানুসন্ধায়ীর মনোসাধ পূর্ণ করিবার নিমিত্ত যখন ভগবানের অবতীর্ণ হওয়া প্রয়োজন হয় তখন তিনি অবতাররূপে পৃথিবীবক্ষে ভ্রমণ করিয়া থাকেন এ সম্বন্ধে দ্বিরুক্তি করা যায় না। আমাদের ধর্ম্মের অবস্থা বিচার করিলে অবতারের আবশ্যক হইয়াছে তাহা আমরা প্রত্যাশা করি পারি।

যে যে অবস্থায় ভগবান নররূপে আবির্ভূত হইয়া থাকেন সেই সকল অবস্থা দেখিতে পাইলে অর্থাৎ কারণ উপস্থিত হইলে তাহার কার্য্য অর্থাৎ অবতারের আবশ্যই উদয় সম্ভব।

আমাদের বর্ত্তমান কালের ধর্ম্মের যে প্রকার মতভেদ দৃষ্ট হইতেছে তাহার সামঞ্জস্য করা অবতারের কার্য্য। যদ্যপি রামকৃষ্ণদ্বারা সেরূপ কোন কার্য্য হইয়া থাকে তাহা হইলে তাঁহাকে

অবতার বলিয়া স্বীকার না করিলে চলিবে না। ফলে রামকৃষ্ণদেব সর্ব্ব ধর্ম্ম সমন্বয় করিয়া দিয়া গিয়াছেন। অনেকেই শুনিয়াছেন যে রামকৃষ্ণ দেব সাধন ভজন ছলে, ভারতবর্ষের যত প্রকার ধর্ম্ম পন্থা আছে তৎসমুদয় গুরুকরণপূর্ব্বক তিন দিবস সাধন করিয়া তাহাতে সিদ্ধাবস্থা লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ আছে। তিনি যে বাস্তবিক সর্ব্ব ধর্ম্মে সিদ্ধ ছিলেন তাহার প্রমাণ এই যে যখন যে কেহ যে কোন ধর্ম্মের উপদেশ চাহিয়াছেন, সেই ব্যক্তিই তাহাতে সিদ্ধ মনোরথ হইয়াছেন। কে না জানিত যে তিনি কেবল বেদ, পুরাণ ও তন্ত্রাদি সঙ্গত পুরাকালীন ও আধুনিক সাধ্য সাধনা ব্যতীত মন্দীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া তিন দিন সাধন করিয়াছিলেন এবং সর্ব্বশেষে তিনি খৃষ্টভাবেও তিন দিন নিমগ্ন থাকিয়া ইহারও সত্য বাহির করিয়াছিলেন? মোটের উপর তিনি পরমহংস, কৌল, অবধৌত, দরবেশ, সাঁই, বাউল, নবরসিক, পঞ্চনামী, কর্ত্তাভজা, শীখ রামাৎ, নিমাৎ, বৌদ্ধ প্রভৃতি যাবতীয় হিন্দু এবং মুসলমান, খৃষ্টান ও বর্ত্তমান কালের ব্রাহ্ম ধর্ম্মের ভাব, তাঁহাতে ছিল এবং এই সমুদয় ধর্ম্মের আভ্যন্তরিক "ভাব কি? তাহাও তিনি যেন প্রত্যক্ষ করিয়া সর্ব্ব ধর্ম্ম সমন্বয়ের নিমিত্ত বলিতেন; যেমন জল এক পদার্থ, পৃথিবীতে জল কখন দুই হয় না। যে দেশে যাও, যে কোন জলাশয়হইতে জল গ্রহণ কর, ইহা কখন দুই হইতে পারে না। ভারতবর্ষে যে জল ইংলণ্ডেও সেই জল, আমেরিকায়ও সেই জল; কিন্তু নামে প্রভেদ। জলকে কেহ নীর বলেন, কেহ পানি বলেন, কেহ ওয়াটার এবং কেহ অ্যাকোয়া কহেন। জল, ওয়াটার, অ্যাকোয়া এক শব্দ নহে কিন্তু বস্তুগত কি কোন প্রভেদ দৃষ্টহয়? সেইরূপ প্রকার, এক ভগবানের একই ধর্ম্ম কেবল নামের প্রভেদমাত্র।" তিনি আরও বলিতেন", "সূর্য্য, পৃথিবীমণ্ডলে অদ্বিতীয় কিন্তু দেশভেদে, নামের প্রভেদ আছে; সূর্য্য এবং সান্, এক নহে কিন্তু বস্তুগত এক ব্যতীত দুই হয় না।" মনুষ্যেরা এক জাতীয় পদার্থদ্বারা সংগঠিত তাহা নরদেহতত্ত্ববিদ্‌মাত্রেই অবগত আছেন, কিন্তু প্রত্যেক মনুষ্য স্বতন্ত্র প্রকার দেখায়। সেই প্রকার ধর্ম্মমত নানাবিধ কিন্তু মূল সত্য সকলেরই এক। রামকৃষ্ণদেব এই সত্য, সর্ব্ব ধর্ম্মের ভাব মন্থনপূর্ব্বক বাহির করিয়া দিয়া গিয়াছেন, তাহা সত্য ত্রেতা দ্বাপর এবং কলিকালে রামকৃষ্ণের পূর্ব্বে কেহ কখন সাধনদ্বারা সকল ধর্ম্মের ভাব স্বতন্ত্র এবং মূলে এক সত্য দেদীপ্যমান আছে এ কথা বলেন নাই। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় এই ভাবের উপদেশ দিয়া গিয়াছেন যথা;—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥

অর্থাৎ—যে যেরূপে ভজনা করে আমি সেইরূপে তাহার মনোরথ পূর্ণ করিয়া থাকি হে অর্জ্জুন যদিও পৃথিবীর লোকেরা নানাবিধ মতাবলম্বী কিন্তু তাহারা সকলে আমারই উপাসনা করিতেছে। ভগবান দ্বাপরে যে কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছিলেন তাহা রামকৃষ্ণদ্বারা সমাধা হইয়াছে না তাহা সাধারণে বিশেষ করিয়া বিচার করিয়া লউন। গীতার এই শ্লোকটীর ভাষান্তর করিয়া অনেকে গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু রামকৃষ্ণের ন্যায় সাধন করিয়া ঠিক তাঁহার মত মীমাংসা কেহ কখন করিয়াছেন কি না তাহার কোন ইতিহাস নাই।

সিদ্ধ রামপ্রসাদ একটী গীতে বলিয়াছেন যে "কালী হলি মা রাসবিহারী,নটবর বেশে বৃন্দাবনে" ইত্যাদি। এস্থানে রাসবিহারীর উৎপত্তির কারণ কালী অর্থাৎ কালী কৃষ্ণে পরিণত হইয়াছেন। আর একটি গীতে—

"মন করোনা দ্বেষাদ্বেষী।
যদি হবি রে কৈবল্যবাসী॥

রামরূপে ধর ধনু, কৃষ্ণরূপে বাজাও বাঁশী,
শিব রূপে ধর শিঙ্গা, কালীরূপে ধর অসি।"

ইত্যাদি, নানা কথার পর "সবই আমার এলোকেশী" বলিয়া গীতটি সমাপ্ত করিয়াছেন, এই গীতটী বিশিষ্ট করিলে দেখা যায় যে রামপ্রসাদ এলোকেশীতে যাবতীয় ভাবের পর্য্যবসান করিয়াছেন।

কমলাকান্তের একটী গীতে আছে;—

"জাননারে মন পরম কারণ শ্যামা শুধু মেয়ে নয়,
মেঘের বরণ করিয়া ধারণ, কখন কখন পুরুষ হয়।
কভু বাঁধে ধড়া, কভু বাঁধে চূড়া, ময়ূরপুচ্ছ শোভিত তায়।
কখন পার্ব্বতী, কখন শ্রীমতী কখন ধানুকী হয়॥
যেরূপে যে জন করেরে সাধন, সেইরূপে তার মানসে রয়।
কমলাকান্তের হৃদিসরোবরে কমলে কামিনী হয় উদয়॥"

এই গীতটী "যে যথা মাং" শ্লোকের অবিকল ভাষান্তর তাহার সংশয় নাই। এস্থানেও রামপ্রসাদের ন্যায় শ্যামারূপে সকল রূপের উৎপত্তি স্বীকার করা হইয়াছে। কিন্তু গীতার যাহা প্রকৃতভাব তাহা এই সংগীতে প্রকাশ পাইতেছে না। কারণ শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণব্রহ্ম বলিয়া উল্লিখিত, ব্রহ্মহইতে সকল ভাবের উৎপত্তি হয়, এই ভাব রূপবিশেষ বলিয়া কথিত; ভাবহইতে ভাবের উৎপত্তি গণনা করিলে মূলে অশুদ্ধ হয়। এই নিমিত্ত রামকৃষ্ণদেব কহিয়াছেন যে "গঙ্গাহইতে ঢেউ হয়, ঢেউহইতে গঙ্গা হইতে পারে না।" যদিও গঙ্গা এবং ঢেউ এক কিন্তু তবে প্রভেদ আছে। গঙ্গা না থাকিলে ঢেউ হয় না সুতরাং গঙ্গা কারণ, এবং ঢেউ কার্য্য-বিশেষ। যদিও কার্য্য দেখিয়া কারণ স্থির হয় কিন্তু তাই বলিয়া কার্য্য কারণ একহইতে পারে না। কার্য্য আছে, পরে থাকিবেনা, কিন্তু কারণ আছে, ছিল, থাকিবে, ত্রিকাল যাহার অস্তিত্ব আছে তাহাকেই কারণ কহা যায়। গঙ্গা ছিল, আছে এবং থাকিবে; কিন্তু ঢেউ সেরূপ নহে। রূপাদিসম্বন্ধেও রামকৃষ্ণ অবিকল ঐ প্রকার মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, "শক্তি সকলের নিদান; রূপ, জ্যোতি, ভাব, অবতারাদি যাহা কিছু হয় সমুদয় শক্তিহইতে জন্মিয়া থাকে।" এই শক্তি ব্রহ্মকে অবলম্বন করিয়া আছেন। সুতরাং ব্রহ্ম পুরুষ, এবং শক্তি প্রকৃতি। যদিও ব্রহ্ম শক্তি বা প্রকৃতি পুরুষ দুই বলিয়া কথিত হয় কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা অভেদ, যিনি ব্রহ্ম তিনিই শক্তি। যেমন অগ্নি বলিলে কি বুঝায়? উত্তাপ, লোহিত বর্ণ, দাহিকা শক্তি ইত্যাদি অর্থাৎ কতকগুলি ধর্ম্মের সমষ্টিকে অগ্নি কহা যায়। সেই রূপ বিবিধ প্রকার শক্তির সমষ্টিকে ব্রহ্ম কহা যায়, তখন তাঁহাকে শক্তিসম্বন্ধে অভেদ বলিলে কোন দোষ হয় না। যেমন কোন ব্যক্তি নাচিতে পারে, গাইতে পারে লিখিতে পারে, পড়িতে পারে ইত্যাদি নানাবিধ কার্য্য করিবার শক্তি ধারণ করিয়া থাকে। যখন সে কোন কার্য্য না করে তখন তাহার কোন শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না। শক্তি সকল নিহীতাবস্থায় থাকে। এই অবস্থাটী ব্রহ্মের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। যখন সে কোন কার্য্য করে তখনই শক্তিবিশেষের প্রকাশ পায়। ব্রহ্মসম্বন্ধে ঐ প্রকার। তিনি যখন কার্য্য করেন তখনই শক্তির বিকাশ কহা যায়। এই শক্তিহইতে কালী, কৃষ্ণ, শিব, রামপ্রভৃতি সকল রূপ বা অবতারের সৃষ্টি হয় অথবা সেই শক্তি কিম্বা শক্তিধরের রূপান্তরবিশেষ বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে। ব্রহ্ম বা শক্তি আদিকারণ, রূপাদি কার্য্যবিশেষ; এই নিমিত্ত রামপ্রসাদ ও কমলাকান্তের ভাবে প্রকৃত ভাব বিকাশ হয় নাই এবং তাহা হইবারও নহে। শক্তি এবং শক্তির রূপান্তর ভাবে এক হইলেও রূপে প্রভেদ কহিতে হইবে। যেমন তিনি বলিয়াছেন

"পুষ্করিণীর চারটী ঘাট আছে, এক্ষণে বিচার করা হউক যে ঘাটের পুষ্করিণী কিম্বা পুষ্করিণীর ঘাট।" কার্য্যকারণ হিসাবে পুষ্করিণীর ঘাট হইয়া থাকে, ঘাটের পুষ্করিণী হয় না। যেহেতু পুষ্করিণী আদি কারণস্বরূপ; পুষ্করিণী ছিল বলিয়া ঘাট হইয়াছে। অথবা অলঙ্কারবিশেষ, যেমন এক স্বর্ণহইতে প্রস্তুত হইয়া, রূপে প্রভেদ হইয়া থাকে। কাণের এবং গলার অলঙ্কার সোণার হিসাবে এক কিন্তু ভাবে, প্রভেদ। সেইরূপ এক শক্তিহইতে সকল রূপের উৎপত্তি হয় বটে, কারণ হিসাবে সকলেই এক; কিন্তু রূপের হিসাবে সকলেই প্রভেদ, সুতরাং কালী, কৃষ্ণ, শিব রাম ইত্যাদি ভাব লইয়া বিচার করিলে কখন এক বলা যায় না এবং তাহা বলিলে ভাবে অশুদ্ধ হয়। কালী বলিলে আমরা যে ভাব উপলব্ধি করিয়া থাকি, কৃষ্ণ বলিলে কি তাহা হয়, না হইবার সম্ভাবনা? রামের সহিত দুর্গার কি কোন সদৃশ আছে। তবে সব এক, বলা কিরূপে সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করা যাইবে? রামকৃষ্ণদেব এই বলিয়াছেন যে "রূপ ধরিলে সকলের স্বতন্ত্র স্বীকার করিতে হইবে কিন্তু ভাব ধরিলে তথায় আর রূপ থাকিবে না।"

একহইতে বহু রূপের উৎপত্তি হয় কিনা? তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত আমাদের চক্ষের সম্মুখে অবিরত বিরাজ করিতেছে। মনুষ্য এক এবং রূপ বহু। রূঢ় পদার্থ যথা স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহাদি এক কিন্তু রূপে বহু। তরবারি এবং হীরাকসে লৌহ এক, কিন্তু রূপে সে রূপ দেখা যায় না। তাই বলিয়া হীরাকসে কি লৌহ নাই? অথবা কারণে তাহার এবং তরবারি কর্ণের লৌহের কোন প্রভেদ হইতে পারে? একটী পরিধি অঙ্কিত করিয়া তাহার মধ্য বিন্দু হইতে পরিধির সমুদয় বিন্দুপর্য্যন্ত সরল রেখা টানিয়া বিচার করিলে, মধ্যবিন্দু এবং পরিধির বিন্দু সকল স্বতন্ত্র বলিয়া জ্ঞাত হওয়া যায়।

সেইরূপ ব্রহ্ম, মধ্যবিন্দুর ন্যায়, এবং পরিধির বিন্দু সকল ব্রহ্মহইতে উদ্ভূত, রূপবিশেষ অর্থাৎ মধ্যবিন্দুহইতে যেন রূপ সকল বাহির হইয়া গিয়াছে। এই রূপ সকল আমাদের ভিন্ন ভিন্ন দেবতাবিশেষ; আমরা এই দেবতাদিগের উপাসনা করিয়া যখন আদিকারণ মধ্য বিন্দু রূপ ব্রহ্মে গমন করি, তখন আমরা তথাহইতে অন্যান্য রূপের উৎপত্তি স্থান এক বুঝিয়া থাকি। এই নিমিত্ত রামপ্রসাদ এলোকেশীরূপ পরিধির বিন্দুহইতে ব্রহ্মে উপস্থিত হইয়া তথা হইতে অন্যান্য রূপকে অনুমান দ্বারা এলোকেশীতেই পর্য্যবসিত করিয়াছেন, কারণ এলোকেশীর রূপ ব্যতীত অন্য রূপে তাঁহার অধিকার ছিল না। রামকৃষ্ণদেব সেই জন্য পরিধির সমুদয় বিন্দুরূপ নানাবিধ ধর্ম্ম-পথে ভ্রমণ করিয়া প্রত্যেক ধর্ম্মের পার্থক্য এবং তাহাদের মধ্যবিন্দুরূপ সত্য, সর্ব্বত্রে এক বলিয়া গীতার শ্লোকের অভিনয় করিয়া গিয়াছেন। এখন বলা যায়, যে যে যেরূপ ভাবে, যেরূপ কার্য্যের দ্বারা ধর্ম্মানুষ্ঠান করে, তাহার তাহাতে কখন ভুল হয় না। ধর্ম্মের মর্ম্ম অবগত হইবার জন্য ধর্ম্ম সাধন করুক বা অজ্ঞানির ন্যায় যাহাকে অন্ধে বিশ্বাস বলিয়া আমরা অহঙ্কারের পরিচয় দিয়া থাকি তাহাই করুক পরিণাম বা উদ্দেশ্যসাধনের পক্ষে কখন ব্যত্যয় ঘটিতে পারে না? যেমন চক্ষুবিশিষ্ট এবং অন্ধের নিকট তিক্ত, কটু মিষ্ট পদার্থ আহার কালে আস্বাদনের তারতম্য হয় না। কেহ ইচ্ছা করিয়া জলে নাবিলে তাহার শরীর যেমন ভিজিয়া যায় একজনকে জলে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিলেও তাহারও তেমনি গাত্রাদি ভিজিয়া থাকে। যেমন একটী ঘরে একজন বসিয়া আছে তথায় তাহার নাম জানিয়াই হউক কিম্বা না জানিয়াই হউক যদ্যপি কেহ গমন করে তাহা হইলে সেই ব্যক্তিকেই তাহার দর্শন হইবে। ধর্ম্মসম্বন্ধেও তদ্রূপ জানিতে হইবে। এই ভাব, সাধনদ্বারা প্রত্যক্ষ মীমাংসা, রামকৃষ্ণদ্বারা সাধিত হইয়াছে বলিয়া আমরা তাঁহাকে অবতার বলিতে বাধ্য হইয়াছি। আমরা যখন সকলে এইভাব শিক্ষা করিয়া প্রাণে প্রাণে তাহা উপলব্ধি করিতে পারিব, যখন বুঝিব যে এক আকাশ আমাদের সকলের মস্তকোপরি অবস্থিতি করিতেছে, যখন বুঝিব

যে এক জল এক বায়ু আমাদের সকলের সম্ভোগের জিনিস, যখন বুঝিব যেমন এক ব্যক্তি কাহার পুত্র, কাহার স্বামী, কাহার পিতা, কাহার জ্যেষ্ঠতাত, কাহার মাতুল, কাহার শিক্ষক, কাহার বন্ধু ইত্যাদি বিবিধ ভাবে অবস্থিতি করিতে পারে, তখন সকলের সকল ভাবের একজন ভগবান না হইবে কেন? সীমাবিশিষ্ট মনুষ্য যখন একাকী এত ভাবের কার্য্য করিতে সমর্থ হয় যে অসীম ভগবানে তাহা বিচিত্র বা অসম্ভব হইবে কিরূপে তখন এই ভাব প্রচার হইলে কাহার তখন ধর্ম্মের জন্য ভাবিতে হইবে না? কেবল শাস্ত্রের স্থূল আভাষ লইয়া আন্দোলন করিতে হইবে না কোন্ ধর্ম্মটী ভাল, কোন ধর্ম্মটী সত্য, এরূপ তর্ক করিতে হইবে না; সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম প্রচারকদিগের মুখ আপনি বন্ধ হইয়া যাইবে, সুতরাং দ্বেষাদ্বেষী ভাব, ধর্ম্মের অসামঞ্জস্য ভাব, বিদূরিত হইতে আর কত বিলম্ব হইবে! অমানিশির অন্ধকার কি অরুণোদয় নষ্ট হয় না, হাজার বৎসরের অন্ধকার কি আলোক প্রকাশ হইবামাত্র তিরোহিত হয় না? সেইরূপ রামকৃষ্ণকথিত নবভাব যখনই যাহার অজ্ঞানরূপ অন্ধকারময় হৃদয়ে প্রকাশিত হইবে তৎক্ষণাৎ তথায় জ্ঞানসূর্য্য উদয় হইয়া সকলদিকের প্রকৃত বোধ বোধে হইবে। তখনই দুষ্কৃতেরা প্রদমিত হইয়া আসিবে। দুষ্কৃত—অর্থাৎ যাঁহারা ধর্ম্মের তাৎপর্য্য স্বেচ্ছামত ব্যাখ্যা করিয়া প্রকৃত তত্ত্বহইতে লোককে বিপথে নিপতিত করেন, তাঁহাদেরই কহা যায়। এবং তাঁহাদের অপেক্ষা অধার্ম্মিক আর কাহাকে বলা যাইবে? একটী সরল মাতাল এবং একজন ধর্ম্মের বিকৃত ব্যাখ্যাকারীকে তুলনা করিলে অধার্ম্মিক কাহাকে কহা যাইবে? যে ধর্ম্মের সত্য অপলাপ করে যে ধর্ম্মের মর্ম্ম উল্টাইয়া দেয়, তাহাদ্বারা কত লোকের ধর্ম্ম পথে প্রতিবন্ধক পতিত হয় তাহা চিন্তা করিয়া ভাবিতে হইবে না। যাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত অবস্থা অবগত না হইয়া যথেচ্ছা গ্লানি বিস্তার করেন অথবা যে হিন্দুরা মহম্মদীয় কিম্বা খৃষ্টীয় ধর্ম্মের প্রতি বিদ্রূপ বা দোষারোপ করেন তাঁহারাত বাস্তবিক দুষ্কৃত। চোরদ্বারা ধর্ম্ম বিপ্লবও হয় না কিন্তু মিথ্যা বিদ্যাভিমানীরাই এই কার্য্যের গুরুমহাশয়, চোর কিঞ্চিৎ অর্থাপহরণ করিয়া একজনের বা পাঁচজনের প্রাণে সাময়িক আঘাত দিয়া থাকে কিন্তু যাহারা ধর্ম্ম ভাব বিকৃত করেন তাঁহারা সহস্র সহস্র লোকের ইহ এবং পরকালের আশান্তির প্রশস্ত পথ খুলিয়া দিয়া থাকেন। এই অশান্তিনিবারক রূপে যিনি আবির্ভূত হন তাঁহাকে অবতার বলিয়া পরিগণিত করা শাস্ত্রের অভিপ্রায়। রামকৃষ্ণ তাহা করিয়াছেন সুতরাং তিনি অবতার।

আমরা যদ্যপি আমাদের অবতারদিগের কার্য্যপরম্পরা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখি তাহা হইলে রামকৃষ্ণকে তাঁহাদের শ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়া উল্লেখ করিতে হইবে। প্রয়োজন অর্থাৎ দেশ কাল এবং পাত্রহিসাবে অবতারগণ কার্য্য করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের দ্বারা সর্ব্বত্র অশান্তি বিদূরিত হইয়া শান্তি স্থাপিত হয় এবং এক প্রকার নূতন ধর্ম্মের স্রোত প্রবাহিত হইয়া থাকে। অবতার নানাবিধ অলৌকিক কার্য্যদ্বারা জীবের চিত্ত বিমোহিত করিয়া থাকেন। তাঁহাদের নিকট সাধন ভজন থাকে না। কথায় কথায় জীবগণকে কৃপা করিয়া বিমল চরণ-ছায়া প্রদান করিয়া থাকেন। পাপী তাপী অনাথ নিরাশ্রয় পতিতদিগকে অতিশয় ভালবাসেন এবং তাঁহাদের জন্য যেন সর্ব্বদাই ব্যতিব্যস্ত হইয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করেন। রামকৃষ্ণ সেরূপ কার্য্য করিয়াছেন। ধর্ম্মের যে সামঞ্জস্য ভাব প্রকটিত করিয়া গিয়াছেন তাহা যখন কার্য্যকারী হইবে তখন বাস্তবিক এই দুঃখময় সংসারে শান্তি লাভ হইবে তদ্বিষয়ে তিলমাত্র সংশয় নাই। যে নবধর্ম্মভাব তাঁহাতে প্রকাশ পাইয়াছে তাহা এক্ষণে আমাদের অবগত হওয়া কর্ত্তব্য।

যদিও আমাদের অগণন উপাসনাপ্রণালী প্রচলিত আছে এবং তাহা যাহারা সাধন করিবে তাহাদের তাহাতেই আশা ফলবতী হইবে বলিয়া কথিত হইয়াছে কিন্তু বর্ত্তমান কালে পাত্র

বিচার করিয়া দেখিলে পুরাকালের সাধনপ্রণালী তাহাদের পক্ষে নিতান্ত সুকঠিন বলিয়া পরিলক্ষিত হয়। বিবেক বৈরাগ্যের আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক কয়জন ব্যক্তি কুম্ভকাদি যোগ করিতে সমর্থ? কয়জন ব্যক্তি কঠোর তপশ্চরণাদির নিয়ম রক্ষা করিয়া যাইতে পারেন? পৌরাণিক যাগযজ্ঞ না করাই শ্রেয় করিতে যাইলে বিশেষ শুভ ফল প্রাপ্ত না হইয়া অনেক সময়ে বিশেষ ক্লেশ পাইতে হয়। এইরূপ পাত্রদোষের নিমিত্ত আমাদের দেশে কলিকালে,—

"হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।"

এই বত্রিশ অক্ষরীয় মন্ত্র জপ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু এমনি কালের প্রবল গতি যে তাহাতেও বিভীষিকা সমুত্থিত হইয়াছে। সাধনপথের কণ্টক কামিনী কাঞ্চন একথাটী রামকৃষ্ণদেব বার বার বলিয়াছেন, তাহার হেতুও আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। কামিনী কাঞ্চন সঙ্গে রাখিয়া যদ্যপি কেহ ধর্ম্ম সাধন করিতে চাহেন তাহা হইলে পদস্খলিত হইয়া যাইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা এবং তজ্জন্যই ধর্ম্মপ্রণালীবিশেষের যে দুর্নাম শ্রবণ করা যায় তাহা ধর্ম্মের অসম্পূর্ণতা হেতু নহে কেবল অনধিকারী পাত্রদোষই তাহার একমাত্র কারণ। কামিনীসম্বন্ধে আমাদের যেরূপ সংস্কার তাহা আমরা আপনাপনি বিলক্ষণ জানি সুতরাং স্ত্রীলোকের সংশ্রবে চিত্তের যেরূপ স্থৈর্য্য ভাব লাভ হয় তাহাও প্রকাশ করিয়া বলিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই। এই নিমিত্ত ধর্ম্মসাধন করিতে যাইয়া অনেকে বিপরীত ফল লাভ হইয়া থাকে। দুরন্ত লোকেরা নিজের ইন্দ্রিয়চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত ধর্ম্মের ভাব যেরূপ বিকৃত করিয়া থাকে তাহার একটী দৃষ্টান্ত বর্ণনা করিতেছি। "কোন সন্ন্যাসী কৌশল করিয়া কোন স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম নষ্ট করে পরে এই কথা শ্রবণ করিয়া যখন সকলে সেই সন্ন্যাসীকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন, তখন তিনি বলিয়াছিলেন যে বেদান্তমতে সবই মায়া আর আমার এই কার্য্যটীই কি সত্য? দেখুন কি আশ্চর্য্য রহস্য!" আর এক সময়ে কোন ধর্ম্মোপদেষ্টা তাহার তরুণবয়স্ক শিষ্যার প্রতি কুভাব উপস্থিত হয় কিন্তু নিজ মুখে তাহা প্রকাশ করিতে অসক্ত হওয়ায় তাহার বৃদ্ধা শিষ্যাকে অতি বিনীত ভাবে আত্মদৌর্ব্বল্য প্রকাশ করেন। বৃদ্ধা, গুরুর আদেশ অনুসারে ঐ যুবতীকে কহিতে লাগিল, দেখ তুইত মালা লইয়া জপ করিতে শিখিয়াছিস্ কিন্তু মন্ত্রের মানে বুঝিয়াছিস্ কি? সে বলিল ভগবানের নাম করিয়া থাকি তাহা বুঝিব না কেন? বৃদ্ধা কহিল তবেই হইয়াছে? আমরাও এক সময়ে ঐরূপ বুঝিয়াছিলাম যাহা না শিখাইলে কি শিক্ষা করা যায়। দেখ হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে মানে শোন্ দেখিস্ কাহাকে বলিস্ নি আমাদের প্রভুকে রাম ও কৃষ্ণ মনে করে বলবি, হ'রে রাম হ'রে রাম রাম রাম হ'রে হ'রে হ'রে কৃষ্ণ হ'রে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হ'রে হ'রে। তুই নিজে শ্রীমতী রাসরসেশ্বরী রাধা কিম্বা জানকী এবং ওঁকে রাধিকাবল্লভ কৃষ্ণ অথবা রামচন্দ্র বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে। এ ভাব যত দিন না হয় ততদিন ভাবের ঘরে প্রবেশাধিকার জন্মিবে না। এইরূপ বিবিধ বিভীষিকার নিমিত্ত সাধনপথ নিতান্ত দুর্গম্য হইয়া উঠিয়াছে। ভগবান্ কলির জীবতমণি তারকব্রহ্ম রামকৃষ্ণ নাম ধারণ করিয়া রামকৃষ্ণ রূপে উদয় হইয়াছিলেন। এই নবাবতারের নব লক্ষণ অতিশয় আনন্দপ্রদ। রামকৃষ্ণের নিকটে প্রথম গমন করিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিতেন তোমার কি গুরুকরণ হইয়াছে? যিনি তাহা হইয়াছে বলিতেন তাঁহাকে তাহাতেই ভক্তিসহকারে সংলগ্ন থাকিতে কহিতেন। যাহার গুরুকরণ হয় নাই, তাহাকে হরি কালী যাহা হয় একটী নাম জপ করিতে বলিতেন কিন্তু প্রকারান্তরে তাঁহাকে বকলমা বা আমমোক্তার নামা দিতে কহিতেন। এইটী তাঁহার নব ভাব। বকলমায় কেবল তাঁহাকে দর্শন, পদসেবন এবং প্রসাদভক্ষণব্যতীত অন্য কোন কার্য্য থাকিত না। যাঁহারা তাঁহার এই কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারিতেন তাঁহারাই সাধন ভজন লইয়াছেন।

তিনি অনেক সময়ে বিষাদিত হইয়া বলিয়াছেন যে "গুরু, কৃষ্ণ, বৈষ্ণবের তিনের দয়া হল; একের দয়া না হতে জীব ছারে খারে গেল", অর্থাৎ মন বিরোধী হইলে কোন কার্য্য ফলবতী হয় না।

শ্রীকৃষ্ণও অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন,—

সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি ভারত॥

হে অর্জ্জুন! সমুদায় ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আমার শরণাপন্ন হও, আমি তোমাকে সকল প্রকার পাপহইতে মুক্ত করিব। শ্রীকৃষ্ণের ভাব রামকৃষ্ণের বকল্‌মা ভাবের সহিত বিশেষ পার্থক্য আছে। বকল্‌মা বলিলে প্রতিনিধির স্বরূপ বুঝায়। এই নিমিত্ত তিনি "আম্‌মোক্তার" শব্দটীও ব্যবহার করিতেন। যে কোন কার্য্য করিতে স্বয়ং অসমর্থ হয়, তাহার প্রতিনিধি হইয়া কার্য্য সম্পন্ন করার নাম আম্‌মোক্তার। শরণাপন্ন এবং বকল্‌মা এই দুইটী শব্দের দ্বারা ঐশ্বর্য্য এবং মাধুর্য্য ভাবের আভাষ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, দেশ,কাল পাত্রভেদে ভগবান অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। যে সময়ে কৃষ্ণচন্দ্র অর্জ্জুনকে শরণাপন্ন হইবার কথা বলিয়াছিলেন, সে এক সময় আর রামকৃষ্ণদেব বকল্‌মার কথা বলিয়াছেন, সে আর এক সময়। এ সময়ে সকলেই জ্ঞানগর্ব্বিত, পাণ্ডিত্যাভিমানী এবং স্ব স্ব প্রধান। ভগবানের অস্তিত্ব নাস্তিত্ব সকলের যেন আয়ত্তাধীন হইয়া গিয়াছে এমন সময়ে কিরূপে কার্য্য করিতে হয় তাহা সর্ব্বান্তর্যামীই অবগত হইবার একমাত্র পাত্র সুতরাং ভগবান নিরহংকারে অবতার রামকৃষ্ণের বকল্‌মার ভাবে আমাদিগকে পরিত্রাণ নিমিত্ত অবতীর্ণহইতে বাধ্য হইয়া ছিলেন। এই নিমিত্ত এই ভাবটী নূতন সুতরাং রামকৃষ্ণ অবতার।

কথিত হইয়াছে যে, অবতারেরা অলৌকিক কার্য্য করিয়া থাকেন। সর্ব্বদেশের অবতারদিগের এই একটী বিশেষ লক্ষণ শ্রবণ করা যায় কিন্তু বর্ত্তমান কালে অলৌকিক কার্য্য ভগবান আসিয়া আর কি দেখাইবেন? মনুষ্যদিগদ্বারা যে সকল অমানুষিক কার্য্য সাধিত হইতেছে, তাহারই ইয়ত্তা করিতে আমরা পরাজিত হইয়া পড়ি। ভগবানের অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় তাঁহার জড় জগতেই দেদীপ্যমান রহিয়াছে। এখনকার লোকেরা গিরি উত্তোলনকরণ দেখিতে চাহেন না, সমুদ্রবন্ধন করা দেখিতে চাহেন না, তাঁহারা যাহা চাহেন, তাহারই ব্যবস্থা করিতেই রামকৃষ্ণের আগমন হইয়াছিল। লোকে এক্ষণে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণপ্রক্রিয়াদ্বারা সত্য ব্যবহার করিতে শিখিয়াছেন, রামকৃষ্ণ তন্নিমিত্ত এই বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় সমুদায় ধর্ম্মের সত্য বাহির করিয়া দিয়া গিয়াছেন। যাহার বাস্তবিক সত্য অনুসন্ধান করিবার বাসনা সঞ্চারিত হইয়াছে, তাঁহারই মস্তক রামকৃষ্ণের চরণে আপনি নিপতিত হইয়া যাইবে। এই স্থানে তাঁহার অলৌকিক ভাবের কার্য্য হইতেছে। যদ্যপি কাহারও দেখিবার সাধ থাকে তাহা হইলে রামকৃষ্ণের অলৌকিক শক্তির বিকাশ দেখিয়া লউন। এই ঊনবিংশ শতাব্দির অবসানকালে বিলাতি জ্ঞান ও বিজ্ঞান বিদ্যায় সুপণ্ডিত যাহারা তাঁহারাই রামকৃষ্ণকে পূর্ণব্রহ্ম বলিয়া আপনারা স্বইচ্ছায় তাঁহার পাদপদ্মে মস্তক বিলুণ্ঠিত করিতেছেন। তাঁহার চরণাশ্রিত সেবকদিগের প্রতি চাহিয়া দেখুন, তাহারা কেহ অজ্ঞান নহে, অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী অনেকেই শ্রীমান্‌ও পেটের জ্বালায় কিম্বা প্রলোভনে পতিত হইয়া রামকৃষ্ণ নাম অবলম্বন করে নাই। সামান্য কার্য্যের লালসায় যে মনুষ্যেরা কি না করিতেছেন, কি না করিতে পারেন সেই অর্থের লোভ তাঁহারা পদে দলিত করিতে পারিয়াছেন, এ সকল কি রামকৃষ্ণের অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় নহে? কৃষ্ণাবতারে বিপুল ঐশ্বর্য্য ভাব লইয়া অবতীর্ণ

হইয়াছিলেন তদ্দৃষ্টে সকলেই বশীভূত হইতে বাধ্য হইয়াছিল। রামাবতারে শক্তির পরিচয় দিয়া সকলের চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিলেন, বৌদ্ধাবতারে পাণ্ডিত্য প্রভাবে সকলের উপর অধিকার স্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন, গৌরাঙ্গাবতারে রূপ বিদ্যা এবং প্রেমের দ্বারা সকলকে বিমোহিত করেন কিন্তু রামকৃষ্ণ অবতারে না রূপ, না বিদ্যা, না ঐশ্বর্য্য, না বীর্য্য বাহ্যিক সমুদায় ভাব লুক্কাতিত রাখিয়া দীনহীনের আকারে অবস্থিতি করিয়া কেশববাবু প্রভৃতি কত শত ব্যক্তিকে নবভাবে পরিবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছিলেন। যে শক্তিদ্বারা তিনি লোককে এইরূপে পরিবর্ত্তিত করিতেন, তাহা লোকে জানে না সুতরাং অলৌকিক। যখন অলৌকিক কার্য্য তাঁহার দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছে তখন তাঁহাকে অবশ্যই অবতার কহিতে হইবে, যাহাকে তিনি কৃপা করিয়াছেন তিনি তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতা সম্বন্ধে অবগত আছেন, তাহার পরিচয় প্রচুর পরিমাণে প্রকাশিত আছে। তথাপি দুই একটী দৃষ্টান্ত এ ক্ষেত্রে দেওয়া প্রয়োজন। একদিন তাঁহাকে দর্শন করিতে যাইবার সময় আমি শ্যামবাজারের পুলের নিকটস্থিত ময়রার দোকানহইতে কয়েক পয়সার জিলিপি ক্রয় করিয়া গাড়িতে উঠিবার সময় একটী অনুমান ৬।৭ বৎসরের মুসলমানের ছেলে, একখানি জিলিপির জন্য আমার কাছে বার বার যাচ্ঞা করিতে লাগিল, আমি কিছুতেই তাহাকে দিলাম না। সে বালকটী গাড়ির পশ্চাৎ দৌড়াইতে লাগিল। তখন আমার মনে হইল হয়ত ভগবান ছলনা করিয়া আমাকে পরীক্ষা করিতেছেন, আরও স্মরণ হইল যে, একদা কোন সাধু রুটি প্রস্তুত করিয়া ঘৃত আনিতে গিয়াছিলেন, প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলেন যে, একটা কুকুর রুটী গুলি মুখে করিয়া লইয়া পালাইতেছে। সাধু তাহার পশ্চাৎ দৌড়াইতে দৌড়াইতে বলিতে লাগিলেন, "রাম অপেক্ষা কর" রুটী গুলিতে ঘি মাখাইয়া দিই।" আমি তখন ইতস্ততঃ ভাবিয়া এক খানি জিলিপি তাহাকে ফেলিয়া দিলাম কিন্তু একথা কাহাকেও বলিলাম না। অপরাহ্ণকালে রামকৃষ্ণদেব আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কি আনিয়াছ?" আমি অতিশয় আশঙ্কিত ভাবে জিলিপিগুলি তাঁহার নিকটে রাখিয়া দিয়া পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিলাম। তিনি বাম হস্তে জিলিপি চূর্ণকরতঃ হস্ত ধৌত করিয়া ফেলিলেন। সে জিলিপি ভক্ষণ ও করিলেন না এবং তখন আমাকেও কিছু বলিলেন না। পরে এক দিন আমার কোন বন্ধুকে গোপনভাবে এই বিষয়ে উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, "উহাদের সাবধান করিয়া দিও", দ্রব্যের অগ্রভাগ বাহির হইয়া যাইলে তাহা কোন মতেই ঠাকুরের সেবায় ব্যবহার হয় না।

একদিন তাঁহার কোন ভক্তের পালিতা কন্যার কয়েক বার ভেদবমী হয় সেই ব্যক্তি ইহাতে নিতান্ত অধৈর্য্য হইয়া রামকৃষ্ণকে স্মরণ করিতে লাগিল। অনতিবিলম্বে তিনি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। এইরূপ সর্ব্বদাই নানা প্রকার ঘটনা সংঘটিত হইত। সেইজন্য তাঁহাকে অবতার কহা যায়।

নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মপ্রণালীমতে এবং সাধু মহাত্মদিগের নিকট ভাল মন্দ, সৎ অসৎ, ইত্যাকার দুইটী তালিকা থাকে, উক্ত তালিকার বিরুদ্ধাচারীদিগের তথায় কোন উপায় হয় না। যেমন মাতাল, লম্পট, নাস্তিকপ্রভৃতি ব্যক্তিদিগের জন্য, কোন্ ধর্ম্ম বা কোন্ সাধু হস্তপ্রসারণ করিয়া অপেক্ষা করিতেছে? এরূপ পতিত যাহারা তাহারাই অবতারদ্বারা পরিত্রাণ পায়। তাহাদের পরিত্রাণ করিতে আর কাহার শক্তিতে সঙ্কুলান হয় না। রামকৃষ্ণের দ্বারা সে প্রকার সংখ্যাতীত ব্যক্তিরা পরিবর্ত্তিত হইয়া ধর্ম্মজীবন লাভ করিয়াছে। পতিত আশ্রয়বিহীন, অনাথদিগের যিনিপরিত্রাতা তিনিইত পতিতপাবন, অনাথ নাথ ভগবান! রামকৃষ্ণদেব সে প্রকার দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন সুতরাং তিনি অবতার, অতএব যে সকল লক্ষণ থাকিলে অবতার বলিয়া অবগত হওয়া যায়, রামকৃষ্ণে তৎসমুদায়ই বর্ত্তমান ছিল। সংক্ষেপে অবতারেরা যে কয়েকটী লক্ষণদ্বারা

লক্ষিত হইয়া থাকেন তাহা বর্ণিত হইতেছে। ১ম জীবে দয়া, ২য় পতিতদিগের উদ্ধার কর্ত্তা, ৩য় সর্ব্ব ভূতে সমজ্ঞান, ৪র্থ ধর্ম্মের সামঞ্জস্যভাব, ৫ম পরম বৈরাগী, ৬ষ্ঠ জৈবধর্ম্মবিবর্জ্জিত, ৭ম অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন, ৮ম আদিষ্ট ধর্ম্মের নূতন ভাব, ৯ম সেবকদিগের কর্ম্মনাশ। রামকৃষ্ণে এ সকল ভাব পূর্ণরূপে প্রকাশ পাইয়াছে, তজ্জন্য তাঁহাকে অবতারাতীত অন্তশ্রেণীর অন্তর্গত করা যায় না।

রামকৃষ্ণকে অবতার বলিবার অন্য হেতু আছে। আমরা যদাপি ধর্ম্ম জগৎ অনুসন্ধান করিয়া দেখি, তাহা হইলে ইহার দুইটী শাখা, জ্ঞান ও ভক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই ভাব দুইটী অবতারদিগদ্বারা নানাদেশে দেশ কাল পাত্র বিচারদ্বারা বর্দ্ধিত হইয়া আসিয়াছে। রাম অবতারে সংসারের অসারতা পূর্ণ পরিমাণে অভিনয় করিয়াছেন এবং সেই সঙ্গে তাঁহার অপূর্ব্ব নামের মহিমাও বিস্তার করিয়া গিয়াছেন। রাম নামে সমুদ্রে পাথর ভাসিয়াছিল, অর্থাৎ এই সংসার জলধিতলে আমাদের মনরূপ প্রস্তর নিয়ত ডুবিয়া থাকে। যে কেহ মুখে রাম নাম উচ্চারণ করে, তাহার সেই পাষাণ মন ভাসিয়া উঠে, অর্থাৎ সংসারহইতে স্বতন্ত্র হইয়া থাকে।

কৃষ্ণ অবতারে সংসারের সহিত বিবেকবৈরাগ্যসংযোগ করিয়া প্রেমানন্দের রঙ্গ-ভূমি গঠিত করিয়াছিলেন। সংসারের ভিতরহইতে ভাব শিক্ষা করিতে হয় তাহা তিনি আপনি শিক্ষা করিয়া জীবকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। সংসারে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর, এই পঞ্চরসের প্রস্রবণ খুলিয়া দিয়া আপনি তাহা সম্ভোগ করেন এবং তৎসমুদয় কিরূপে ভগবানে প্রয়োগ করিতে হয় তাহারও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। রাধাকৃষ্ণের ভাবে অতি সুমধুর প্রেমকাহিনী বিস্তারিত রূপে প্রকটিত করিবার অভিপ্রায়ে উভয়ে একাঙ্গ হইয়া গৌরাঙ্গ অবতারের সৃষ্টি হইল। এই অবতারে নাম ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতাসাধন ও তাহার পরিণাম সম্যকরূপে বিস্তার করিয়া যান। ভাব, প্রেম, মহাভাব; ইত্যাদি ভক্তির বিবিধ অবস্থা কাহাকে বলে এবং তাহা কিরূপ প্রকার, এই অবতারে প্রকাশিত হয়। গৌরাঙ্গ অবতারকালে জীবের অবস্থা পূর্ব্বের ন্যায় না থাকায়, সহজ নাম সাধনের পন্থাই প্রদর্শিত হইয়া আধ্যাত্মিক তত্ত্বের অভিনয় হেতু, অদ্বৈত চৈতন্য এবং নিত্যানন্দ, এই তিনের স্বতন্ত্র রূপের ও সৃষ্টি হইয়াছিল। অদ্বৈতরূপে জীবের একমেবাদ্বিতীয়ং জ্ঞান, লাভ হওয়া নিতান্ত আবশ্যক অদ্বৈতজ্ঞান জন্মিলে তবে সর্ব্বত্রে চৈতন্য স্ফূর্ত্তি হইবার কথা, চৈতন্যময় সংসার বোধ হইলে তবে তাহার নিত্য আনন্দ উপস্থিত হইয়া থাকে। এই তিনটী ভাব তিনভাবে পৃথক পৃথক করিয়া দেখাইয়া রামকৃষ্ণরূপে একাধারে তাহা পরিণত করিয়াছেন। রামকৃষ্ণ কেবল রাম এবং কৃষ্ণের যৌগিক নহেন, তাহাতে অদ্বৈত গৌরাঙ্গ এবং নিত্যানন্দ এই তিনটী ভাব ও বর্ত্তমান আছে। সকল ধর্ম্মের মূল এক সত্য বাহির করা, তথায় অদ্বৈত। মূলহইতে সংশ্লেষণপ্রণালীক্রমে প্রত্যাগমন করায় চৈতন্য, কারণ সত্যের বিকাশ যাহা তাহাও সত্য এবং সর্ব্বত্রে চৈতন্যবোধ হইলে আনন্দের হ্রাস হয় না সুতরাং নিত্যানন্দের ভাব প্রকাশ পাইতেছে এই সকল কারণেই আমরা রামকৃষ্ণকে অবতার বলিতে বাধ্য হইয়াছি। *

---

* রামকৃষ্ণ অবতার সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক মীমাংসা ও ৩য় প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমরা উদ্ধৃত করিলাম না। আবশ্যক হইলে অন্য সময়ে এ বিষয় আলোচনা করা যাইবে। সা-কঃ সং।

বিদ্যাসাগরের জীবনী ও শ্রীযুক্তবিহারীলাল সরকার।

"তোমারি শিক্ষিত বিদ্যা দেখাব তোমারে।"

বঙ্গের সৌভাগ্য বঙ্গে বিদ্যাসাগর জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। "অবনত অবস্থায়ও ভারতমাতা রত্ন-প্রসবিনী!" বিদ্যাসাগর বলিলে আর আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা কাহারও বুঝিতে বাকি থাকে না, যে, বিদ্যাসাগর—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগরের সাগরে যে যত নামিয়াছে সে ততই রত্নলাভ করিয়াছে। বিদ্যাসাগরের বিদ্যার পরিচয় আর কি দিব, এই ক্ষুদ্রলেখক তাঁহারই কৃত বর্ণপরিচয় পড়িয়া বর্ণজ্ঞ হইয়া কথামালা, আখ্যানমঞ্জরী, ব্যাকরণ, সীতার বনবাস, বেতাল, শকুন্তলা, ভ্রান্তিবিলাস প্রভৃতি পাঠে বাঙ্গালা শিখিয়া সাগরের পরিমাণ করিতে আপনার ক্ষুদ্রবুদ্ধির পরিচয় দিতেছে। বিদ্যাসাগর আমাদিগকে বাঙ্গালা শিখাইয়াছিলেন কি, তাঁহার জন্য বাঙ্গালাভাষায় একদিন কাঁদিতে হইবে বলিয়া? আমরা কাঁদিতে কাঁদিতে বলি,—"তোমারি শিক্ষিত বিদ্যা দেখাব তোমারে"। বিদ্যাসাগরের বিশাল বিদ্যাসাগর দেখিয়া যেমন আমরা বিস্মিত, তেমনি ঈশ্বরচন্দ্র এই নামের নামকরণে ঈশ্বরচন্দ্রের মহত্ত্বের প্রতিষ্ঠা ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনে দেখিয়া আমরা পুলকিত; নামের উপাধির অক্ষরে অক্ষরে সত্য রহিয়াছে। ক্ষণজন্মা বিদ্যাসাগর কি অসাধারণ পাণ্ডিত্য অলোকসামান্য হৃদয় লইয়াই জন্মিয়াছিলেন। বিশাল হৃদয়ে অসাধারণ মস্তিষ্কে কুত্রাপি তাঁহার জীবনে বিরোধ ঘটে নাই। বিদ্যাসাগর স্বনামা পুরুষো ধন্য। মহাপুরুষেরা পিতৃপুরুষের আশ্রয়ে থাকিয়া মহত্ত্ব উপার্জ্জন করে না, শাক্যসিংহ, যীশু, চৈতন্য, রামমোহন, বিদ্যাসাগর আর কত দৃষ্টান্ত দিব। বিদ্যাসাগর এই জন্যই দরিদ্রতার পীড়নে দেশকালের গ্রহবৈগুণ্যে জন্মিয়া কষ্টে দুরাশায় লক্ষ্মী সরস্বতীর একত্র উপাসনা করিয়াছিলেন, উপাসনা সার্থক হইয়াছে।

পুরুষ-মহাপুরুষ আদর্শ না হইলে জীবনীর প্রয়োজন নাই সত্য, কিন্তু আদর্শ বলিতে জনবিশেষের সকল কর্ম্মই কি অনুকরণীয় বুঝায়? আদর্শ পুরুষ এরূপ হইলে জাতিবিশেষের আদর্শ জাত্যন্তর-সমাজে কিরূপে আদর্শ বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে? সংসার শুধু পুণ্যের স্থান নহে, পাপেরও স্থান বটে। কে এমন ভাগ্যবান্ মানুষ হইয়া জন্মিয়াছে যে, পাপের ছায়া না মাড়াইয়া পুণ্যে পুণ্যে দিন কাটাইয়াছে? এ আদর্শ মানুষে নাই, এ আদর্শ ভগবানে থাকিতে পারে। আদর্শ পুরুষ বলিতে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে আদর্শ বুঝিতে হইবে এবং তাঁহার ঐ বিশেষ বিশেষ কর্ম্মই অনুকরণীয়, সুতরাং আদর্শ পুরুষ বিশেষজাতিগত নহে, বিশেষসমাজগত নহে, বিশেষধর্ম্মগত নহে; যিনি মহৎ তিনি মহাপুরুষ, সকল জাতির কাছে, সকল সমাজের কাছে, সকল ধর্ম্মের কাছে। বিদ্যাসাগর আদর্শ পুরুষ নহেন এ কথা কে বলিতে পারে? সাগর-চরিতে পূর্ণাদর্শ না হইতে পারে, অসম্পূর্ণ মানুষের পূর্ণ আছে কি অসম্পূর্ণের পূর্ণতা থাকা যেমন অসম্ভব অসম্পূর্ণের পূর্ণতা প্রত্যাশাও তেমনি অসম্ভব। সাগর-জীবনে আমাদের শিখিবার দেখিবার অনেক আছে—শুধু দেখিবার শিখিবার নহে, সাধন করিবারও বিস্তর আছে; কষ্টে পড়িলে অসামান্য সহিষ্ণুতায় কিরূপে নীতিমার্গে বিচরণ করিতে হয় তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সাগর-চরিত। পুরুষের পুরুষকার কি, তাহা সাগর জীবনে দেখিতে হয়। আত্মখ্যাতিপ্রিয়তা যাহা মানুষের প্রধান দৌর্ব্বল্য সাগরের (কি পুণ্যফলে) আদৌ ছিল না, তাহা কি মানুষের দ্রষ্টব্য নহে? প্রদীপ্ত চিতানল বক্ষে ধরিয়া, সংসারে থাকিয়া দুঃখীর দুঃখে দ্রবীভূত হওয়া কত বড় মহত্ত্বের কাজ, সাগর জীবনী না পড়িলে বুঝিবে কেমন করিয়া? দুঃখে অবিশ্রান্ত দুঃখে কঠিন হইয়া প্রতারণার প্রতারণায় প্রতারিত হইয়াও

যে নর হৃদয় কোমল থাকিতে পারে, প্রতারণাশূন্য থাকিতে পারে, তাহার দৃষ্টান্ত আর অন্যত্র মিলে কি? প্রতিকূল নিয়তির সহিত ক্ষুদ্র মানব ক্ষুদ্র চেষ্টায় বিচিত্র সমরে যে নশ্বর জীবন অতিবাহিত করিতে পারে, তাহা ক্ষীণ বাঙ্গালীর পক্ষে উপন্যাস নহে কি? সুলেখক শ্রীযুক্ত বাবু বিহারীলাল সরকার বহু অনুসন্ধানে বহু পরিশ্রমে সরল সরল ভাষায় এহেন সাগর-চরিত জন্মভূমিতে আদ্যোপান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। বিহারী বাবু ইহার প্রচারে শুধু ধন্যবাদার্হ নহেন, অধিকন্তু আমাদিগকে সাগরী-ঋণহইতে কতকটা মুক্তও করিয়াছেন। এ ঋণ মুক্তি কিন্তু একেবারে ঋণ-মুক্তি নহে, ছিলাম সাগরের কাছে, রহিলাম বিহারী বাবুর কাছে, শুধু এই ক্ষুদ্র শুষ্ক কৃতজ্ঞতায় সরকারী ঋণ-মুক্তি হয় কি? প্রভাতীর আমলহইতে জন্মভূমির এ কাঁল পর্য্যন্ত বিহারী বাবু লেখকসমাজে উত্তরোত্তর কিরূপ কৃতিত্বলাভ করিয়া আসিতেছেন, এই বিদ্যাসাগরের জীবনী প্রচার তাহার নিদর্শনস্থল। প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগরের উদারচরিত বর্ণনায় বিহারী বাবুর ভাষাও বড় লীলাময়ী বড় রসময়ী। বিহারী বাবু ভাগ্যবান, বিদ্যাসাগরের জীবনের অনেক রহস্যভেদ করিলেন। ভাগ্যবানেই ভাগ্যবানকে দেখায়! ভাগ্যবানকে ভাগ্যবানে দেখে নাকি? ভাগ্যবানকে ভাগ্যবানে না দেখুক, ভাগ্যবান দেখিয়া লোকে ভাগ্যবান হয়। জন্মভূমিহইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া বিহারীবাবুর গুণগণার পরিচয় দিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু কোন্ অংশ পরিত্যাগ করিয়া কোন্ অংশ উদ্ধৃত করিব তাহার ঠিকানা করিতে না পারায় অগত্যা গুণের মর্য্যাদা রাখিতে নীরব থাকিতে হইল। আমাদের অনুরোধ,—বিহারী বাবু সাগরের জীবনী একত্র সংগ্রহে একখানি নূতন উপাদেয় গ্রন্থ করিয়া বঙ্গের ঘরে ঘরে বিতরণ করুন। মূল্য দিয়া এমন অমূল্য গ্রন্থ সাধারণে না লইলে শুধু সাধারণে অমূল্য সামগ্রীর অমর্য্যাদা করিবে না, বিহারী বাবুও মূল্যের আশায় অমূল্য ধন গোপন রাখিলে ঐ দুষ্কৃতের ফলভাগী হইবেন।

সম্পাদক।

কি করে।

ছিঁড়েছে বীণার তার
থেমেছেতো তান,
জাগিছে হৃদয়ে তবু
সুখ-দুঃখ-গান।
ফুলতো শুকায়ে গেছে
বহুদিন হতে,
তবু সেই ফুল-গন্ধ
জাগে মরমেতে।
পাখীতো উড়িয়ে গেল
গেয়ে দুঃখ-গান,
তবুতো তাহার সুর
আকুলিছে প্রাণ।
সবতো ফুরায়ে যায়
তবু জাগে স্মৃতি
তবে, কি করে ভুলিব
তোমার মূরতি।

শ্রীযশোদাকুমার মজুমদার

রম্য সরোবর।

নহে রূপরাশি অপরূপ জল,
কেশদাম তাহে শৈবাল কেবল।
মুখখানি নহে ফুটন্ত নলিনী,
বিকসিত আছে দিবস যামিনী।
চটুলা সফরী নয়ন নেহারি,
করিতেছে ক্রীড়া দিবা বিভাবরী,
নহে করদ্বয় সুগোল মৃণাল,
ধরিবার তরে পুরুষ-মরাল.
নহে পয়োধর সরোবর কুলে
চক্রবাকদ্বয় আছে কুতুহলে।
কামী তাপী হেরি এই সরোবর;
তীরে গিয়া হয় প্রফুল্ল অন্তর।
নাহিক নিস্তার নামিলে উহায়
শৈত্য আশে গেলে বিষে জ্বলে যায়।
যেও না উহার কাছে বড় ভয়ঙ্কর,
বিধাতা নির্ম্মিত রম্য সরোবর।

শ্রীবরদাকান্ত ঘোষ

ইংরাজী মনোবিজ্ঞান ও ন্যায়শাস্ত্রের সারসঙ্কলন

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কতকগুলি বস্তু আছে, যাহারা স্বতঃই মূল্যবান এবং নিতান্ত প্রয়োজনীয়; ইহাদিগকে অভীষ্ট পদার্থ কহে এবং অপর কতকগুলি বস্তু আছে, যাহারা স্বতঃ প্রয়োজনীয় না হইলেও কোন না কোন অভীষ্ট পদার্থের লাভার্থ তাহাদের আবশ্যক হয়; একারণ ইহাদিগকে উপায়কর পদার্থ কহে। অভীষ্ট পদার্থের কার্য্যকারিতা স্বাভাবিক এবং অবশ্যম্ভাবী; কিন্তু উপায়কর পদার্থের কার্য্যকারিতা সাম্বন্ধিক, কারণ প্রথমোক্ত পদার্থের লাভ বা সংগ্রহ সম্বন্ধেই ইহার প্রয়োজন। যাহা স্বাভাবিক ও অবশ্যম্ভাবী তাহাকেই সার পদার্থ বলা যায়; আর যাহা কেবল সাম্বন্ধিক তাহাকে পদার্থের কার্য্যকারিতা বলা যায়, মানব জীবনে অবশ্যম্ভাবী লক্ষ্য বস্তু দুইটীমাত্র পূর্ণতা ও পরমানন্দ। কি দৈহিক, কি মানসিক, কি আধ্যাত্মিক, মানবের সমগ্র বৃত্তির সর্ব্বতোভাবে পূর্ণ-বিকাশকে আমি পূর্ণতা বলি; এবং মানবদেহ, মানবান্তঃকরণ ও মানবাত্মা যত প্রকার এবং যে পরিমাণে আনন্দ-সম্ভোগে সমর্থ তাহার চরম সীমাকে আমি পরমানন্দ বলি।

এইরূপে দেহান্তঃকরণের পূর্ণতা ও মানব-চিত্তের পরমানন্দ এই দুইটীকে পদার্থ দেখিতে যদিও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, কিন্তু বাস্তবিক ইহারা উভয়ে সর্ব্বদাই এরূপ অদৃশ্যভাবে সংলগ্ন যে চিন্তা করিয়া দেখিলে এ দুইটীকে পরস্পরের সহিত সম্পূর্ণরূপে সংমিশ্রিত ও এক অভিন্ন পদার্থে পরিণত বলিয়া স্পষ্টই অনুমিত হয়।

যেমন পূর্ণতা লাভ করিতে গেলে মানবদেহের বা মানব-হৃদয়ের সমগ্র বৃত্তির সম্যক্ পরিচালনা আবশ্যক, তেমনই আবার সেই পরিচালনাই সুখ বা আনন্দের মূল ও একমাত্র কারণ। কি দৈহিক সুখ বল, কি মানসিক সুখ বল, বৃত্তিসকলের পরিচালনাই তাহার মূলীভূত কারণ। এই পরিচালনার আতিশয্যই সুখের আতিশয্য ইহারই ব্যাপ্তিতে সুখের ব্যাপ্তি এবং ইহারই অভাবে সুখের অভাব বা ক্লেশের আবির্ভাব। মানবের দৈহিক বা মানসিক বৃত্তিমাত্রই স্বতঃ পরিচালনোন্মুখ সুতরাং পরিচালনার অভাবেই মানবের ক্লেশের উৎপত্তি। অতএব স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে মানবের যে পরিমাণে পূর্ণতা সংসাধিত হয়, ঠিক সেই পরিমাণেই সুখ বা আনন্দ বর্দ্ধিত হয়। সুতরাং মানব আপনাকে অভীষ্ট পদার্থ স্বরূপ মনে করুন বা পরম পিতার কীর্ত্তি ঘোষণার্থ উপায় স্বরূপ মনে করুন, পূর্ণতা-সম্পাদনই যখন তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য তখন যে সকল উপায় অবলম্বনদ্বারা এই পূর্ণতা সাধিত হইতে পারে, সেই সকল উপায় অবলম্বনই মানবের একান্ত কর্ত্তব্য ও নিতান্ত প্রয়োজনীয়। ইহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে, যে প্রকারেই হউক দর্শনশাস্ত্রের আলোচনাদ্বারা আমরা মনোবৃত্তির ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য-কলাপের বিষয়েই পর্য্যালোচনা করিতে সমর্থ হইয়া থাকি, অধিকন্তু মানবান্তঃকরণের বা মানবাত্মার তথ্যানুসন্ধান করা বা স্বরূপ অবগত হওয়া অপেক্ষা মানবের প্রধানতম কর্ত্তব্য কর্ম্ম আর কি আছে? এবং এই কারণেই দর্শনশাস্ত্রের আলোচনার আরও অধিকতর প্রয়োজনীয়তা।

মানবান্তঃকরণের এই সমস্ত কার্য্য-কলাপের বিষয় পর্য্যালোচনা করিতে গেলে আমরা দেখিতে পাই যে, ইহার অস্তিত্বের সঙ্গে সঙ্গেই এক সর্ব্বাগ্রগামী আদি-কারণের প্রয়োজনীয়তা আসিয়া পড়ে; কারণ যে সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন বিষয় বা অবস্থা সমগ্র সৃষ্টির মূলীভূত তাহা এক আদি কারণ বা সৃষ্টিকর্ত্তাভিন্ন অন্য কাহাতেও কোন মতে সম্ভবে না, সে সমস্তই মানবান্তঃকরণে প্রকৃষ্ট-

রূপে বর্ত্তমান। প্রকারান্তরে কেবল মাত্র বাহ্য জগতের বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে, সে রূপ কোন আদি পুরুষের অস্তিত্বের বিষয় স্পষ্ট বুঝা যায় না বরঞ্চ অনাস্তিত্বের কথা মনে হইবার বিশেষ কারণ হইয়া উঠে। কিন্তু বাহ্য জগতের ক্রিয়াকলাপ অন্তর্জগতের ক্রিয়াকলাপের সহিত অতি ঘনিষ্টভাবে সম্বন্ধ; সুতরাং এ উভয়কে মিশ্রিতভাবে চিন্তা করিলে আবার সেই আদি কারণের অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা প্রতীত হয়। পরম পিতা পরমেশ্বরের অস্তিত্বের কথা ভাবিতে গেলে; আমরা একাধারে যে কয়েকটী গুণের আবশ্যকতা দেখিতে পাই, তাহা এই; তিনি আদিপুরুষ, অর্থাৎ তিনিই সকলের মূলীভূত, তাঁহার মূলে কেহ নাই; তিনি, সর্ব্বশক্তিমান্ অর্থাৎ কোন শক্তিরই অভাব তাঁহাতে হইতে পারে না। তিনি জ্ঞানবুদ্ধিময় অর্থাৎ তিনি সমগ্র জগতের ক্রিয়াকলাপ জানিতেছেন ও বুঝিতেছেন এবং স্বকীয় বুদ্ধি কৌশলে ইহ সংসার সৃষ্টি করিয়াছেন ও করিতেছেন তিনি বিবেকী অর্থাৎ ন্যায়াস্যায় বা হিতাহিত বিষয় তাঁহার প্রত্যেক কার্য্য বর্ত্তমান।

এই কয়েকটী গুণ বা শক্তি একস্থানে একত্রীভূত করিলে আমরা সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বরের কল্পনা করিতে পারি। ঈশ্বরবাদীই হউন বা নিরীশ্বরবাদীই হউন জগদ্সৃষ্টির জন্য, প্রথমোক্ত দুইটী গুণের একত্র মিলন কেহই অস্বীকার করেন না। নিরীশ্বরবাদী, যিনি কেবল পরমাণু ও তদন্তর্নিহিত এক অনন্ত শক্তিহইতে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি কল্পনা করেন, স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে তাঁহাদের মতে কোন সর্ব্বশক্তিমান্ আদি পদার্থহইতে সমগ্র জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে কিন্তু সৃষ্টির মূলীভূত ঐ আদি পদার্থ যে জ্ঞানবুদ্ধিময়, হিতাহিতবিবেক-সম্পন্ন, তাহা তাঁহারা স্বীকার করেন না, সুতরাং তাঁহাদের মতে কোন সৃষ্টিকর্ত্তার অস্তিত্ব নাই; ইঁহাদিগকেই পরমাণুবাদী কহে। এক্ষণে আমাদের দেখিতে হইবে এই যে ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী সৃষ্ট পদার্থসমূহ যাহাদের প্রতি নেত্রপাত করিলেই কোন না কোন স্রষ্টার অস্তিত্বের কথা স্বতঃই অনুমিত হয়, ইহাদের সমগ্র অবস্থা বিশেষ লক্ষ করিয়া বিবেচনা বা বিচার করিলে শেষোক্ত দুইটী গুণের অস্তিত্ব বা প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হয় কি না? প্রথমতঃ আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে মানবের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি সমগ্র পদার্থের মধ্যে মানবান্তঃকরণই সর্ব্ব প্রধান। মন দেহাদি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সুতরাং দেখা যাউক যে সেই মনহইতে আমরা কি কি পদার্থ উপলব্ধি করিতে পারি। ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন যে প্রত্যেক মানবেরই মানসিক অবস্থার মধ্যে আমরা স্বতঃই বুদ্ধি ও বিবেক এই দুইটী পদার্থ দেখিতে পাই। একটীদ্বারা মানব সমস্ত পদার্থ বা কর্ম্ম জানিতে বুঝিতে বা করিতে পারে। অপরটীহইতে মানব হিতাহিত বা ন্যায়ান্যায় বিচারদ্বারা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া জীবনপথে চলিতে পারে। মানব যে একটী সৃষ্ট পদার্থ এ বিষয় নিশ্চয়ই কাহারও সন্দেহ হইতে পারে না; অতএব সৃষ্ট পদার্থে যখন পূর্ব্ব কথিত এই দুইটী শক্তি সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান তখন সেই মানব স্রষ্টার বা মূলীভূত কারণে যে উক্ত দুই প্রকার শক্তি থাকিবেক ইহা যুক্তিযুক্ত এবং সর্ব্বথা বিশ্বাসযোগ্য। অতএব দেখা যাইতেছে যে সৃষ্টির মূলীভূত আদিকারণ চারি বিভিন্ন প্রকার গুণ বা শক্তির সমষ্টি। ১ম আদিত্ব, ২য় সর্ব্বশক্তিমত্ত্ব, ৩য় জ্ঞানবুদ্ধিময়ত্ব, ৪র্থ বিবেকিত্ব বা হিতাহিত-বিচারক্ষমত্ব এবং এই চারিটী শক্তি একত্র করিলে এক আদিপুরুষ পরমেশ্বর যে সকলেরই মূলে, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ থাকে না। (ক্রমশঃ)

শ্রীশরচ্চন্দ্র রায় চৌধুরী বি, এ, বি এল্

প্রহেলিকা

[ক]

কালচক্রের অনন্ত আবর্ত্তনে জীবন-নাট্যের একটী অঙ্ক সমাপ্ত হইল। গর্ভাঙ্কের পর গর্ভাঙ্ক অতিক্রম করিয়া অন্তরালহইতে একবার যবনিকা পড়িল আশা, উৎসাহ, উদ্যম, অধ্যবসায় অনন্তের অনাবিল স্রোতে নীরবে ধীরে ধীরে লুকাইল। জগতের কোলাহল, চিন্তা-তরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাতে প্রতিহত হইয়া কে জানে কোন নিশ্চিন্তপুরে ভাঙ্গিয়া গেল। জীবন-সংগ্রাম, প্রেম, ভালবাসা, প্রণয়, সৌহার্দ্দ্য মন্থরগতিতে নিরাশার দীর্ঘশ্বাসে পরিণত হইল। রূপণের স্বচ্ছপটে সুখচ্ছায়া ফুটিতে না ফুটিতে আপনাপনি অন্তর্হিত হইল।

[খ]

সংসারে সুখ কোথায়? সুখ কি?—শান্তিই সুখ। শান্তি খুঁজি নাই, খুঁজিয়া ছিলাম সুখ। তাই এ মহাভুল। তখন ভাবিবার অবসর ছিল না, বুঝিবার অবকাশ ছিল না, দেখিবার সময় ছিল না। তখন উন্মত্ততায়, বালকসুলভ চপলতায়, পুথিগতজ্ঞানে হৃদয় পূর্ণ, তখন আকাশকুসুম রচনায় ব্যতিব্যস্ত। তখন ভাবি নাই, ভালবাসা যাতনার মহাকূপ, অশান্তির কলধৌত-বাহিনী নির্ঝরিণী। তখন বুঝি নাই চিরদিন সমান না যায়। পরিবর্ত্তন সংসারের কঠোর নিয়ম। তখন জানি নাই, প্রণয়ে বিরহ, দ্বিধাভাব আছে, কার্য্যে বৈফল্য ঘটে, আশায় নৈরাশ্যের ছায়া পড়ে। তখন দেখি নাই, বিধাতার অদ্ভুত লীলা, দুর্ব্বোধ্য জটীল নিদারুণ নিয়মসমষ্টি, নিয়তির অভেদ্য বন্ধন। তাই তখন সুখান্বেষণই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য করিয়াছিলাম, শান্তির গম্ভীর, প্রশান্ত, মনোহর বপু হেয়জ্ঞান করিয়া গন্তব্যপথে চলিতেছিলাম, সেই সে মহাভুল।

[গ]

অতীতের স্মৃতি বড় মধুর। বর্ত্তমান অন্তর্দৃষ্টি-হীন, ভবিষ্যৎ কল্পনাময়, বিভীষিকাময়। অতীতের নিকট ভবিষ্যৎও শ্রীহীন, বিকারগ্রস্ত। অতীত মানসপটে চিরাঙ্কিত, মধুর, তৃপ্তিকর, সুখদ, ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়, প্রহেলিকাময়, বর্ত্তমান সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যবিহীন তাই অতীত বড় ভালবাসি, অতীতের কথা শুনাইতে আসি, তোমরা শুনিবে না কি?

[ঘ]

সে আজ অনেকদিনের কথা। ক্ষীণ চন্দ্রালোকে তখন পৃথিবী হাসিতেছিল, তারকারাজির অস্ফুট জ্যোতি আলোকান্ধকারে মিশাইয়া মধুরতরভাবে দীপ্তি পাইতেছিল, সংসার-কোলাহল তখন বিভাবরী-সুলভ নীরবতাস্রোতে ভাসিয়া যাইতেছিল, সুশীতল মলয় পবন আর পাখীর কুজন তখন অনন্তের ক্রোড়ে মহানিদ্রায় অভিভূত! সেই সে দারুণ নীরবতায়, সংসারের বহুদূরে দুইজনে দাঁড়াইয়া কি যেন এক অভূতপূর্ব্ব সুখ-দুঃখ-আনন্দ-বিপত্তি সংমিশ্রিত চিন্তালহরী তখন উভয়ের মানসসরোবরে ক্রীড়া করিতেছিল, নাচিয়া নাচিয়া প্রবাহে প্রবাহে অনির্ব্বচনীয় ভাব সঞ্চার করিতেছিল, কখন বা হর্ষের অন্তর্দৃষ্টিহীনতা, কখন বা বিষাদের গাম্ভীর্য্য আনয়ন করিতেছিল, আর ধীরে ধীরে অতলস্পর্শ হৃদয় সাগরাভ্যন্তরে আপনাপনি অজ্ঞাতভাবে লুকাইতেছিল। সেই সে প্রথম সম্ভাষণ, অথবা প্রেমাভিধান অনুসারে সেই সে প্রথম মিলন, সেই সে জীবনমরুর একমাত্র গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গম।

[ঙ]

প্রাণে প্রাণ মিশিলে প্রাণ আপনি আকৃষ্ট হয়। বাধা বিঘ্ন তুচ্ছীকৃত, অনুকূল বা প্রতিকূল সাধারণের মত বিপর্য্যস্ত হইয়া থাকে। সার্ব্বভৌমিক বা বিশ্বজনীন প্রেম বুঝিনা ক্ষুদ্রে মহত্ত্ব উপলব্ধি হয় না এই ক্ষুদ্র মনুষ্যদেহ লইয়া যে এই মহান্ ভাব কার্য্যে পরিণত করিতে পারে তাহাকে মহৎ বলিতে পারি, নরূপা দেবতা বলিতে পারি, কিন্তু তাহাকে সম্পূর্ণ, সর্ব্বদিগ্‌দর্শী জ্ঞানী বলিতে পারি না। সংসারীর এইটুকু বিশেষত্ব। প্রতিদিন চক্ষের সমক্ষে সহস্র সহস্র লক্ষ লক্ষ লোক চলিয়া যাইতেছে, সেদিকে দৃষ্টি নাই। এই লক্ষের মধ্যে একজন প্রাণের মা প্রতীক্ষায় মানুষ পাগল; যেন এই একেই সৃষ্টীতত্ত্ব সপ্রমাণ। কিন্তু কেন? সে কথা তুলি বিধাতার লীলা, তোমার আমার বোধাতীত দুরূহ সমস্যা;

[চ]

ধীরে ধীরে দুইটা হৃদয় একই তানে সম্মিলিত হইল। তখন আর বিভিন্নভাবে ললিত, বিভাস, মল্লার বাজিত না। বীণায় ঝঙ্কার দিলেই, স্পষ্ট শুনা যাইত, একই তালের সুমধুর ধ্বনি, কোথাও অস্পষ্টতা নাই, বিভিন্নতা নাই, তাল-ভঙ্গই নাই সমস্বরের প্রাধান্য।

[ছ]

কিছুকাল মধ্যেই অধিকতর গাঢ়তা জন্মিল। ক্রমবিকাশের নিয়মানুসারে, উন্নতিবাদের অনিবার্য্য পরিণামে, এক বৃন্তে দুটী ফুল ফুটিল। আহা! সে সৌরভ, সে শোভা জগতে দুর্লভ।

[জ]

দুটী ফুল একবৃন্তে ফুটিল। চুম্বকের আকর্ষণ শক্তি দুই হৃদয়ে পরিব্যপ্ত হইল। কেহ কাহাকে মুহূর্ত্তের নিমিত্তও চক্ষের অন্তরালে রাখিতে দেয় না; তাহাতে অকথ্য যন্ত্রণা অনুভূত হয়। দিবারাত্র একই স্থানে অবস্থানে, একই বিষয়ের আলোচনায় দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর আনন্দের সুবিমল ছায়ায় দ্রুতভাবে অতিবাহিত হইতে লাগিল। তবে মাসে মাসে নূতনত্ব স্পৃহাহেতু মনোমালিন্য, অভিমানপ্রভৃতির অভিনয়ও যে না হইত তাহা নহে।

[ঝ]

এইরূপে বাল্য, কৈশোর, যৌবনের প্রারম্ভভাগ কাটিল, কিন্তু মানুষের সহ্য হইল না। লোকে দ্বেষ, হিংসা, বিদ্রূপ করিতে লাগিল, যেন 'সত্য' এ পৃথিবীর জিনিস নয়, যেন সৌহৃদ্য মহাগর্হিত কর্ম্ম, যেন প্রণয় সৃষ্টীবহির্ভূত অপূর্ব্ব পদার্থ তাহার স্তরে স্তরে নিষেধবাণী অঙ্কিত! কিন্তু কেন, মিত্রতা দুষণীয় কেন, নিন্দার্হ কেন, অকর্ত্তব্য কেন? মানুষ কি? মানুষের হৃদয় কি! মানুষ চায় কি? কবি গাহিয়াছেন—

"হৃদয় হৃদয় চায়
নহিলে কি শোভা পায়
একা প্রাণ বাঁচে কয় দিন?"

ভিন্ন কবি ভিন্নসুরে গাহিয়াছেন—

"ধ্বনি খুঁজে প্রতিধ্বনি, প্রাণ খুঁজে মরে প্রতি প্রাণ
জগৎ আপনা দিয়ে খুঁজিছে তাহার প্রতিদান।"

অনন্ত উচ্ছ্বাসময়, অনন্ত ভাবময়, অনন্ত জ্ঞানময়, কবির এ মহদুক্তি কি চিরসত্য নয়! মানুষ আসে একা, যায় একা, মাঝে দুইজন। এই দুইজন, এই মহামিলন কি তবে অহৈতুকী? না, ইহা মহাসত্য—সত্যে ইহার উৎপত্তি, সত্যেই ইহা অনুপ্রাণিত, অনুশাসিত, অন্তর্নিবিষ্ট। হৃদয়ের দ্বার একবার খুলিলে তাহা আর সহজে পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয় না। 'খুলিলে মনের দ্বার

না লাগে কপাট; দ্বাররোধ করিবার হৃদয় না মিলিলে তাহা ধীর, স্থির, গম্ভীর ভাবে জগতের পানে চাহিয়া থাকে। হৃদয়ে হৃদয় না মিলিলে, মানুষ আঁধারময়—সে জাগ্রতে দেখে—আঁধার, নিদ্রায় দেখিতে পায়—আঁধার, স্বপ্নে দেখিতে থাকে—দারুণ বিভীষিকা, আঁধার! জগৎ চিরদিন একরূপ, সেই মানুষ, সেই কোলাহল, সেই দোকানদারী, সেই দুঃখ-তাপক্লান্তময় সুখ, সেই সব অথচ কি যেন নাই, কে যেন নাই, কি যেন চায়, যেন তাহা পায় না। যেন তাহা পাইবে, যেন তাহা আসিয়াও আসে না। মানুষ আশায় বুক বাঁধিয়া নিয়তির পানে তাকাইয়া দিন গুণে। হয়তো বিধাতা সদয় হইলেন—মানুষ আবার সংসারে প্রফুল্লতা দেখিল, কোমলতা দেখিল, কমনীয়তা দেখিল—ফল হইল বিস্ময়। নয়তো অদৃষ্টের ফেরে মানুষ হতাশ হইয়া ঊর্দ্ধ দৃষ্টিতে অশান্তির ভার বহন করিতে লাগিল; কিন্তু তাহাতেও যে সুখ—সে সুখ সংসারে অন্যকোথাও মিলিবে না।

মানুষ হৃদয় খুঁজে—না খুঁজিয়া স্থির থাকিতে পারে না, অনন্ত ভালবাসাপূর্ণ ক্ষুদ্র হৃদয় লইয়া সে কোথায় দাঁড়াইবে—চারিদিকে অকূল পাথার—দৃষ্টি কল্পনা পৌঁছায় না। মানুষ কত সহিবে? মানুষ মরে।

তাই বলিতেছিলাম—সৌখ্য নিন্দনীয় কেন? সংসারে যাহার কেহ নাই, সংসারে যাহার দিকে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়া চায় না যদি তাহার হৃদয় থাকে—তবেই সে সুখী—তাহার সখা আছে, নয় মিলিবে।

কিন্তু মানুষ বুঝিতে চায় না—বলিতে চায়। বুঝি তাই জগতে স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচারিতা, প্রণয়ের নামে হলাহল, হা-হুতাশ!

[ঞ]

যখন মানুষ দেখিল—তাহার কথায় প্রণয় কর্ণপাত করিল না, তাহার উপদেশ বৃথায় ব্যয়িত হইল—তখন সে স্বমূর্ত্তি ধরিল, প্রণয়ের মূলে কুঠারাঘাত করিতে লাগিল। কে জানিত, সে কৃতকার্য্য হইবে, কে জানিত ক্ষুদ্র সমষ্টিই বৃহতের উপাদান, ক্ষুদ্রবাষ্পকণাই মহাসাগরের কারণ, বিন্দুপরিমিত বালুকণাই সমুদ্রতটের মহাভীতি জনক।

শেষে বুঝি কুলোকেরই জয় হইল দুর্দ্দান্তের নিকট বুদ্ধিমন্তের পরাজয় হইল—বাল্য-কৈশোর যৌবন পরিপোষিত অনন্ত আকাঙ্ক্ষাময়, অনন্ত কমনীয়ময় আশারাজি শূন্যে পরিণত হইল কিন্তু তাহা সত্যবিরোধী। যে ক্ষুদ্র মহত্ত্ব শরীর প্রাণ স্পর্শ করিতে পারে না সসীমতায় সহায় একারণ, তাহার সাধ্য কি এ অকূল প্রবাহ বিপরীত দিকে টানিয়া লইয়া যায়!

এ পরিবর্ত্তনের এ জীবননাট্যের প্রথম পঞ্চসমাপ্তির কারণ—এক মহাশক্তি। ভ্রমে পড়িয়া অতৃপ্তি লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম। সে ভ্রম ঘুচিয়াছে, শান্তির ছায়া দেখিয়াছি, সেই পথ চাহিয়া যাই ফলাফল দেখিবার আবশ্যক নাই, মহাশক্তির কার্য্যে এ অধম মূক—হৃদয়ে একভাব—

"যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি"

শ্রীকালী চরণ মিত্র

বসন্তে

(১)

কাতর হৃদয়ে মোর
বসন্ত জাগিল কি রে !
তাই কি রে থাকি থাকি
নিকুঞ্জে কূজিছে পাখী
তাই কি রে হাসি লয়ে
প্রকৃতি আসিল কি রে ?
কাতর অন্তরে মোর
বসন্ত জাগিল কি রে !

তাই কি রে সাধ যায়
মৃদু মধু জ্যোছনায়
পাতিয়ে অবশ কায়
যমুনার উপকূলে,
কুসুমিত উপবনে,
সুরভিত সমীরণে,
উছলিত যমুনার
কল কল তানে ভুলে,
চাঁদিমার মুখ চাই
অলস গাহনি গাই,
রাধা রাধা রাধা নামে
দিগন্ত কাঁপায়ে তুলি ;—
শৃঙ্খল পড়ুক খসে'
ঘুচুক মলিন ধূলি !
অতীত কাহিনী যত
তাই কি তারার মত
একটি একটি করে
পরাণে জাগিছে ধীরে।
কাতর হৃদয়ে মোর
বসন্ত জাগিল কি রে।

(২)

নবীন বসন্ত আজি
মাতিয়া উঠিল প্রাণ !
ঘুমঘোর গেল ছুটি
অলসতা পড়ে টুটি
আঁধার বিষাদ-ছায়া
হৃদি হতে অবসান,
নবীন বসন্তে আজি
মাতিয়া উঠিল প্রাণ।
আঁখের কোমল কায়ে
তারা উঠে ভাতিয়া।
মুহু মুহু পিক গায়,
তারি সাথে মন ধায় ;
দূরহতে আসে বায়
ফুলবাসে মাতিয়া,
কত আশা, কত গান,
কত হাসি, কত প্রাণ,
কতই সুখের ছায়া
উঠিতেছে জাগিয়া ;
যেন বা নদীর পরে
কার মধুস্বর ঝরে,
লহরী-লীলায় দুহে
তাই আসে নাচিয়া ;
প্রাণের মর্ম্মের তার
বেজে ওঠে বারবার,
প্রাণে করে রেখাপাত
সে সুরভি, সেই গান।
মধুর মধুর গানে
মাতিয়া উঠিল প্রাণ !

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র ঘোষ।

ঢেউ।

—*—

এক এক সময় কোত্থেকে যে
ঢেউটী কেমন আসে,
গাছপালা যা উপ্‌ড়ে নে যায়
মড়ার মত ভাসে।
সাধ্য কি যে মানুষ তাতে
ঠিক হয়ে রয় টেঁকে,
থর্‌থরিয়ে হাত্‌ পা কাঁপে,
শরীর পড়ে বেঁকে।
তেমন তেমন মানুষ যদি
অশথ গাছের প্রায়
শিকড় দিয়ে মাটী ছেঁকে
আশ্রয় বিলায়,
তবেই তো ভাই রক্ষে, নইলে
নাইক তো আর পথ,
সে কালের সেই রাস্তা জোড়া
জগন্নাথের রথ।
আজ কালটা ঢেউটা যেন
বড়ই বাড়াবাড়ি,
চল্‌ছি ভেসে আপ্‌না আপ্‌নি—
কাজেই ছাড়াছাড়ি।
ডুবে মরি,—কাজেই ভয়ে
হাত পা ছোড়া বেশী,
ছাড়্‌ব মরণ যতই ভাবি
ততই তারে ঘেঁসি।
কেই বা কারে বলে কিবা,
নিজ বাঁচান ভার,
কেই বা শোনে কাহার কথা,
আপ্‌নি অবতার।
গাছ পালা কি ধর্‌বে বল,
সব চলেছে ভেসে,
লোভ দেখিয়ে নে যায় টেনে
আপন কোটে শেষে।
চার্‌দিকে নাই কূলকিণারা
হাঁপিয়ে ওঠে প্রাণ;
হাত পা অবশ,—প্রাণও বুঝি
ঢেউয়ে ভেসে যান্‌।

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র ঘোষ।

উপদেশ।

রক্ত, মাংস, অস্থি, মজ্জা, শ্লেষ্মা, শুক্র, মল,
কেশ, চর্ম্ম আদি করি দেহের সম্বল ॥
ভস্মমাত্র মরণান্তে পরিণাম যায়।
তাহার রক্ষার তরে যতন সবার ॥
দেহের রক্ষায় এত ব্যস্ত কেন ভাই।
যায় যাবে যাক ইহা আপদ্‌ বালাই ॥
বড়তো সুখের স্থান পৃথিবী তোমার।
রোগ শোক জরা মৃত্যু যেথা অনিবার ॥
সেখানে থাকিতে এত যত্ন কর কেন।
যত শীঘ্র পার ভাই কর পলায়ন ॥
ধরা যদি হত শুধু সুখের আগার।
স্বর্গে যেতে লোক তবে চাহিত না আর ॥
সুখ-দুঃখময় ধরা ধাঁদা পথ প্রায়।
সুখ-দুঃখময় প্রাণ কি হবে হেথায় ?
যোগেতে রোগের নাশ যোগিগণে কয়।
মরণতো হবে শেষে, অমরতো নয় !
তবে কেন রাখিবারে নশ্বর জীবন ॥
নশ্বর সংসারে এত যত্ন কর কেন।
পিতা মাতা দারা পুত্র কেহ নয় কার।
সেবায় পালনে ছল তবে কেন তার ॥
যে জন জীবন দেছে সে জন সবার।
আহার দিবেন নিতি তুমি কেবা তায় ?
গুরু দত্ত নাম লয়ে সরে পড় তুমি।
বৃথা কেন জ্বালা সয়ে থাক কর্ম্মভূমি ?
অবিচ্ছিন্ন সুখ যেথা লোকে আশা করে।
সেথা যেতে চেষ্টা কর গুরু নাম ধরে ॥
অজানা নূতন পথে একেলা চলো না।
গুরু দত্ত সোজা পথ কখন ছেড়ো না ॥

শ্রীগুরুদাস শর্ম্মা

সমালোচনা

কন্যা ও এবং পুত্রোৎপাদিকা শক্তির মানবেচ্ছাধীনতা।—শ্রীরমানাথ মিত্র প্রণীত ও ১৩নং বৃন্দাবন পালের লেন, কলিকাতাহইতে প্রকাশিত, মূল্য ১৲ টাকা। পুস্তকখানির আকার ক্রাউন ৮পেজী ১৭০ পৃষ্ঠা। এধরণের পুস্তক বাঙ্গালায় এই নূতন। স্যামুয়েল এচ্ টেরিনামক একজন মার্কিণ সাহেব ইংরাজীতে এ সম্বন্ধে Controlling Sex in Generation নামে পুস্তক রচনা করেন। তিনি তন্মধ্যে ভূয়োদর্শন, পর্য্যালোচনা অনুসন্ধান, প্রমাণ, পরীক্ষা ইত্যাদির ফলে এসম্বন্ধে যাহা কিছু মীমাংসা করিয়াছেন, তাহাই সবিস্তারে লিখিয়া গিয়াছেন। আমাদিগের সমালোচ্য গ্রন্থখানি তাহারই ভাবালম্বনে ভাষান্তরিত।

মূল গ্রন্থকর্ত্তা নানাদেশের বৃক্ষ, লতা, মৎস্য, খেচর, ভূচর, জলচর, কীটাদির মধ্যে পুং ও স্ত্রীজাতির জীবোৎপত্তির নিয়মাদি পর্য্যালোচনা ও পরীক্ষাদ্বারা প্রমাণিত করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, যে জাতীয় জীব সঙ্গমকালে অধিক কামুক এবং বলবান হইবে, সেই জাতীয় জীবের বিপরীত জাতীয় জীব উৎপন্ন হইবে অর্থাৎ পুরুষের দেহ বলিষ্ঠ ও কামেচ্ছা বলবতী থাকিলে কন্যাসন্তান এবং স্ত্রীর দেহ বলশালী ও কামেচ্ছা বলবতী থাকিলে পুত্রসন্তান হইবে। সকল স্থলেই যে এনিয়ম অক্ষুণ্ণভাবে প্রয়োগ করা যাইতে পারে, গ্রন্থকর্ত্তা অতি বিশদরূপে প্রমাণাদি-দ্বারা তাহা দেখাইয়াছেন। তিনি আরও স্বীকার করিয়াছেন যে, পিতামাতাহইতে শরীর দোষদুষ্ট হইলে এই নিয়মের ব্যত্যয় ঘটে; বংশের ধারানুসারে সন্তানের বংশও কতকটা নিয়ন্ত্রিত হয় অর্থাৎ মাতা যদি কেবল কন্যা-প্রসবিনী হয়, তবে তাহার সন্তানেরও তদ্রূপ হইবে। এসকল কথার বিস্তৃত আলোচনা বারান্তরে করা যাইবে।

কিরূপে পুত্রলাভ করা যায়, কিরূপে কন্যালাভ করা যায়, তৎসম্বন্ধে শাস্ত্রে ও জ্যোতিষে হিন্দুর জন্য যথেষ্ট বিধি আছে। পূর্ব্বে অভিভাবক পিতামাতারাই ভাবী সন্তানের মঙ্গল-কামনায় পুত্রকন্যাগণকে এই সকল বিষয়ের নিয়মাদি ও সংযম শিখাইতেন, কিন্তু এখন পুত্র-পুত্রবধূ বা কন্যা-জামাতা সুপুত্র-কামনায় কিরূপে সহবাস করিবে, কি নিয়মে ঋতুরক্ষা করিবে, কিরূপে ঋতুকালব্যতীত অন্য সময়ে (কেবল কাম-তুষ্টির জন্য) সহগমন করিবে এসকল বিষয়ে পিতামাতা বা শ্বশুর-শাশুড়ী অথবা অধ্যাপক-শিক্ষকের নিকট উপদেশ লইতে লজ্জা বোধ করে। এখনকার সর্ব্বনাশিনী সভ্যতা-রাক্ষসী এই শিক্ষাকে সমূলে গলাধঃকরণ করিয়াছে। যাহাতে বংশরক্ষক, বংশের মর্য্যাদা-রক্ষক, পিতামাতার আনন্দদায়ক, বলিষ্ঠ, মেধাবী, সুবুদ্ধি গুণাকর পুত্র জন্মিবে, তৎসম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক কি না, তাহা পুত্রগণের হিতাকাঙ্ক্ষী প্রত্যেক পিতা ও প্রত্যেক সমাজহিতৈষী এবং সমাজ-সংস্কারকেরা বিবেচনা করিবেন। আমাদের মতে কেবল অশ্লীলতার দোহাই দিয়া, এতবড় একটা অতি প্রয়োজনীয় শিক্ষার পথ রুদ্ধ করা একান্ত অনুচিত। "মানবজাতির উৎপত্তি ও পালন-বিষয়ে কোন উপদেশ-কথা বলিলে, তাহা কদর্য্য বলিয়া ঘৃণা করা শিক্ষিত বুধমণ্ডলীর কোন রূপেই কর্ত্তব্য নহে। তবে যে সকল কথাহইতে সহবাসস্পৃহা প্রশ্রিত হয় অথবা লম্পট স্বভাব-হেতু কথিত হয়, সে সকল কথা অবশ্যই ভদ্র সমাজে নিন্দার্হ"; কিন্তু সুসন্তান-লাভরূপ ধর্ম্মো-দ্দেশে (যাহাতে দেশ, সমাজ ও বংশের উপকার হইবে, তজ্জন্য) সহবাসের বিষয়ে কোন কথার উপদেশ দিলে, তাহা পবিত্র বলিয়া গ্রহণ করা উচিত। এই উদ্দেশে এ সকলের আলো-

চনায় এবং পিতামাতার আনন্দস্বরূপ ও জগতের হিতকারী পুত্রোৎপাদনার্থ উপদেশ দেওয়া বা গ্রহণ করায় কোন দোষ হয় না বা সে সময়ে কোনরূপ লজ্জাও মনে আনা উচিত নহে। পুত্রের হিতকাঙ্ক্ষা পিতা যেমন করিয়া থাকেন, এমন আর কে করিবেন? সুতরাং সেই পুত্রের পুত্র কিসে ভাল হইবে, তাহারই শিক্ষা দেওয়া কি সামান্য লজ্জার জন্য পরিত্যাগ করা উচিত? আর পিতাই যদি এ শিক্ষা না দেন, তবে আর কাহারও প্রয়োজন কি? বংশরক্ষা বা বংশ উজ্জ্বল কাহার হইবে? বলিষ্ঠ ও গুণবান্ পৌত্র কাহার হইবে?

এক্ষণে বাঙ্গালীর সন্তান অনুকরণ-দোষে যে রূপ হীনাবস্থা, রুগ্ন, দুর্ব্বল, তেজোহীন, দৃঢ়তা-বর্জ্জিত হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে ইহাদের পক্ষে সুপুত্র। জননরূপ বিজ্ঞানালোচনার একান্ত আবশ্যক হইয়াছে। পতিপত্নীর সহবাস-সম্বন্ধেও ইহাদিগের বিশেষ শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক হইয়াছে। হিন্দুশাস্ত্রেও এসম্বন্ধে যে সমস্ত সূক্ষ্ম উপদেশ আছে, তাহা এখনকার বাঙ্গালী-সমাজ অবিকৃত ভাবে গ্রহণ করিতে পারে না। রুচিদোষে তাহাই আবার ইউরোপীয় বিজ্ঞানের আবরণে আবরিত হইয়া প্রচারিত হইলেই গ্রহণীয় হইবে। এ সম্বন্ধে আজকাল আমাদের সমাজে ভিতরে ভিতরে একটা অভাববোধ হইতে আরম্ভ হওয়াতে ক্বচিৎ কখন এ সম্বন্ধে দু-এক কথা শুনা যাইতেছে। এ সময়ে রমানাথ বাবুর এই পুস্তকখানিতে কিছু কার্য্য হইতে পারে। তবে সমাজ এখনও এ সকল পুস্তকের উপদেশ গ্রহণ করিতে উপযুক্তরূপে প্রস্তুত হয় নাই। রমানাথ বাবুর অনুবাদ বেশ সরল ও কৌতূহলোদ্দীপক হইয়াছে। পুস্তকখানির প্রচার ও আদর হইলে আমরা সুখী হইব। মূল্যও সুলভ হইয়াছে, কিন্তু আরও সস্তা হইলে পুস্তকখানির উদ্দেশ্য সফল হওয়া সম্বন্ধে বিশেষ ভরসা থাকিত।

সুচিন্তা।—মাসিক পত্রিকা। গতপ্রায় ১২৯৯ সালে যে কয়খানি মাসিক পত্রিকা নূতন প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে 'সুচিন্তা' একখানি। ইহার আকার ৩ ফর্ম্মা, মূল্য ও বার্ষিক ২৲ টাকামাত্র। কয়েকখানি মাসিক পত্রিকা বাঙ্গলায় বর্ত্তমান আছে বটে, কিন্তু দু-একখানি প্রাচীনও দু-একখানি নূতন পত্রিকাভিন্ন পাঠোপযোগিণী সৎকথাপূর্ণ পত্রিকা নাই বলিলেই হয়। 'সুচিন্তা'র তত্ত্বাবধান পণ্ডিতবর সামাশ্রমী মহাশয় ও মান্যবর বিচারক গুরুদাস বন্দ্যো-পাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীহারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বিএলের হস্তে নিহিত। আমরা ইহার চৈত্র সংখ্যাপর্য্যন্ত পাইয়াছি। অনেকের বিশ্বাস হিন্দুস্মৃতি ও ইংরাজী হিন্দু-ল এক পদার্থ কিন্তু তাহা নহে, হারাণ বাবু ইহার ২য় সংখ্যাহইতে তাহাই সাধারণকে বুঝাইয়া দিতেছেন। "মনু-ষ্যের পরমায়ু", "রাজযোগ-রহস্য" প্রভৃতি অতি সুপাঠ্য ও শিক্ষাপ্রদ প্রবন্ধ। "লুপ্ত-রত্নোদ্ধার" বলিয়া শ্রীশরচ্চন্দ্র সরকার মহাশয় যে ৺কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী রসসাগরের বিবরণ নূতন করিয়া প্রকাশ করিতেছেন, তাহা বাঙ্গালা ভাষায় বস্তুতঃ নূতন নহে; চর্ব্বিতচর্ব্বণমাত্র। ৺হরিমোহন মুখো-পাধ্যায় তাহা বহুকাল পূর্ব্বে "জ্ঞানাঙ্কুর" নামক পত্রে প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং পরে অতি বিস্তৃত ভাবে সংগৃহীত হইয়া স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে বিক্রয় হইতেছে। শরৎবাবুর সংগ্রহ-প্রণালীও বিশুদ্ধ নহে। পুরাতন জিনিস সংগ্রহ করিতে হইলে ওরূপ বিশৃঙ্খলভাবে লেখা উচিত নহে। ৪র্থ সংখ্যায় "মুকুল-মুঞ্জরা"র নিরপেক্ষ সমালোচনাটি মন্দ নহে; কিন্তু এ প্রবন্ধেও লেখক নায়ক-নায়িকারচরিত্র-স্ফূর্ত্তি-বিষয়ে বিশেষ কোন কথা না বলায় প্রবন্ধটি অসম্পূর্ণ হইয়াছে। নায়ক মুকুল যে স্বভাবের লোক, তাহাতে তাহার প্রথম নায়িকা মিলনের কালহইতে জড় ভাবের হ্রাসতা এমন ভাবে দেখান হইয়াছে যে, তাহাতে আমরা বুঝিতে পারি না যে কি উপায়ে এ পরিবর্ত্তন ঘটিল? অচ্যুতানন্দের উপদেশে হইল বলিয়াই বোধ হয় কারণ মুঞ্জরার সহিত প্রথম দর্শনের দিন মুকুলে যে পরিবর্ত্তন দেখা যায়, তাহার কারণ মুঞ্জরা-প্রেম বা মুঞ্জরার রূপজ প্রভাব হইতে পারে না। কিন্তু প্রেমের প্রভাবে জড়তা

দূর করাই গ্রন্থের উদ্দেশ্য বলিয়া বোধ হয়। মুকুলে কিন্তু সে ক্রম-বিকাশ দেখান হয় নাই। মুঞ্জরা মুকুলের সরলতা ও রূপে ভুলিল কিন্তু তাহাতেও ক্রম-বিকাশ দেখান আবশ্যক করে, কবি তাহাও দেখান নাই; কবি হয় ত বলিতে পারেন, অভিনয়ার্থ নাটকে ক্রম-বিকাশ দেখাইতে গেলে, তাহা অভিনয় করিতে পারা যায় না, যথেষ্ট সময়ের আবশ্যক করে,—আমরা বলি সময়ের অভাব হইলে, চিত্রখানি অসম্পূর্ণ করিয়া চিত্রিত করা উচিত হয় নাই, আর যদি বলেন, বৃত্তি-বিকাশের ক্রম দেখাইবার আবশ্যক নাই, প্রথম অবিকশিত, তৎপরে অর্দ্ধবিকশিত, তৎপরে পূর্ণবিকশিত ভাব দেখাইলেই যথেষ্ট হয়; কিন্তু এক কথা 'মুকুল-মুঞ্জরার; উদ্দেশ্য কি? প্রেমে পূর্ণ বিকশিত মুকুল দেখানই কি উদ্দেশ্য, না প্রেমে মুকুলের জড়তা দূর হইল, তাহাই দেখান উদ্দেশ্য অর্থাৎ জড়তানাশে প্রেমের প্রভাব দেখানই উদ্দেশ্য? আমরা অভিনয় দেখিয়া যতদূর বুঝিয়াছি,তাহাতে শেষোক্তটিই পুস্তকের উদ্দেশ্য,সুতরাং কিরূপে প্রেম মুকুলের মনে ক্রমে ধীরে ধীরে আধিপত্য স্থাপন করিতেছে, তাহা দেখান আবশ্যক। আরও এক কথা, প্রেমের বলে জড়তা দূর করা এই নাটকের মুখ্য উদ্দেশ্য হইলেও,কবি অচ্যুতানন্দকে সকল কার্য্যের কর্ত্তারূপে দাঁড় করাইয়া সমস্ত ঘটনাটি তাঁহারই একটি কৌতুহলের খেলামাত্র করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। নাটকখানি পড়িলে বোধ হয় যে, যদি অচ্যুতানন্দ না থাকিত, তাহা হইলে এ প্রেম-খেলা ঘটিত না বা প্রেমে মুকুলের জড়তা দূর হইতে পারিত না। অচ্যুতের প্রতি-নিমেষের কৌশলে মুকুল-মুঞ্জরা বাধ্য হইয়াই যেন এতবড় খেলাটা দেখাইল! আমরা এরূপ ভাবের ঘটনা সংস্থান অনুমোদন করিতে বা ইহাকে সৎকবিত্ব বলিতে পারি না। আর অচ্যুতানন্দ যিনি নিস্পৃহ যোগী-বৈরাগী, তিনি দুটা যুবক-যুবতীকে লইয়া এত কৌশল, এত মারপেঁচ, এত খেলা খেলিতে গেলেন কেন? যিনি প্রত্যক্ষ দেবতা বলিয়া কেরলী রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত, তাঁহার একমাত্র কথায় জয়ধ্বজ মুকুলকে কন্যাদান করিলেও বীরসেন স্বীয়ভ্রম বুঝিতে পারিতেন, কিন্তু কবি তাঁহার সেই দেবভাব হরণ করিয়া এরূপ একটা কৌতুহলী নায়ক-নায়িকার সংযোজকরূপে চিত্রিত করিয়া ভাল করেন নাই। ইহাতে ঋষিচরিত্রে দোষ স্পর্শিয়াছে। চন্দ্রধ্বজ ও মুঞ্জরা রাজপুত্র ও রাজকন্যা বটে,—তাহারা যে কোন ঘটনাতেই পড়ুক না কেন, তাহারা সকল স্থানেই যুবরাজপুত্র ও রাজ-কন্যাই থাকিবে, তাহাদের সে গাম্ভীর্য্য, পদোচিত গৌরব, সকল স্থলেই বজায় রাখিতে হইবে, কিন্তু তাহা হয় নাই। চন্দ্রধ্বজকে লইয়া সহচরী চামেলী বাগানে 'বউ বউ' খেলা করিল!—একজন রাজপুত্রের একজন যুবরাজের পদোচিত গৌরব নষ্ট করিল। ইহা বড়ই দোষ! রাজা জয়ধ্বজের শেষাঙ্কের ব্যাকুলী, তাঁহার স্বভাবের ঠিক বিপরীত হইয়া গিয়াছে। জয়ধ্বজের জ্ঞান ছিল, বংশ গরিমাই আদরণীয়, গুণগরিমা তত নহে; কিন্তু বীরসেন স্বীয় পুত্রকন্যার পরিচয় দিলে, জয়ধ্বজ যে ভাবে স্বীয় কথার প্রত্যাহার করেন, তাহা অনুমোদন করিতে পারা যায় না। জয়ধ্বজ যে বংশের গরিমা সমধিক মূল্যবান বলিয়া বোধ করেন, সেই বংশের প্রধান পুরুষের সম্মুখে তাহারই পুত্রকন্যাকে নিন্দা করিয়াছেন, বলিয়া তাঁহার একটু লজ্জা বোধ করা উচিত ছিল, নতুবা যেরূপ আছে তাহাতে বীরসেন জয়ধ্বজকে একটা চাটুকার পশুব্যতীত অন্য কিছু ভাবিতে পারেন কি? ইহাতে জয়ধ্বজ-চরিত্র হীন হইয়া পড়িয়াছে। জয়ধ্বজের রাজ-চরিত্র আরও স্থলে নষ্ট হইয়াছে, যখন ভজনরাম মুঞ্জরার পলায়নবার্ত্তা জ্ঞাপন করিল, তখন রাজা পরিপূর্ণ সভাস্থলে "আমার গৃহে গুপ্তপ্রেম" বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন কেন? সভাসদ্‌গণকে বিদায় দিলে রাজোচিত কর্ত্তব্য রক্ষিত হইত। রাজার আকুলতা, রাজবাটীর গুপ্ত কুৎসা সাধারণে প্রচারিত হওয়া অনুচিত, অসম্ভব। তারপর কবি কতকগুলি ঐতিহাসিক ভ্রম ঘটাইয়াছেন, সেগুলি ঘটা কোনমতেই উচিত হয় নাই। কেরলী হিন্দুরাজ্য, রাজ্যে মুসলমানের সংশ্রবও নাই; এমন

কি অচ্যুতানন্দের মত ব্যক্তি যজ্ঞদ্বারা পুত্রোৎপাদনের মত ঘটনা দেখিয়াও বুঝা যায় যে, তখন ভারতেও মুসলমান প্রবেশ করে নাই, সুতরাং তত প্রাচীনকালে কেরলীর অধিবাসীর "বাঁদী", "পরী", "পরী পাওয়া" ইত্যাদি জানিল কিরূপে? উপেন্দ্র বাবু সমালোচনাকালে এ গুলিও দেখাইয়া দিলে দর্শক ও কবির পক্ষে আরও উপকার করিতেন।

যাহা হউক আমরা সুচিন্তাপাঠে সুখী হইয়াছি। ভগবানের কৃপায়, অনুকূল দৈব-সাহায্যে, সুলেখকগণের যত্নে এবং গ্রাহকগণের কৃপাদৃষ্টিতে সুচিন্তা বর্দ্ধিত হউক। এরূপ পত্রিকার আকার আরও বড় ও ক্ষুদ্র অক্ষরে মুদ্রিত হওয়া প্রার্থনীয়।

শিক্ষা-কৌমুদী।—শ্রীরাজেন্দ্রকুমার বসু প্রণীত,—বালকবালিকাগণের পাঠ্যগ্রন্থ। ইহাতে অনেক সৎপ্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে। বালকবালিকারা পাঠে শিক্ষা ও তৃপ্তিলাভ করিতে পারিবে, এই পুস্তকে উদাহরণস্বরূপ পাশ্চাত্য জগতের মহাত্মবৃন্দের কথা উদ্ধৃত হইয়াছে, কিন্তু আমাদের মতে সে গুলির পরিবর্ত্তে দেশীয় ব্যক্তির কথা তুলিলেই ভাল হইত। অবশ্য সর্ব্বদেশীয় মহাত্মাই সকল দেশেই পূজ্য কিন্তু বালকবালিকাকে শিক্ষা দিতে হইলে দেশঘরের জানাশুনা লোকের কথা বলিয়া শিক্ষা দিলে শিখিতে ও শিক্ষা দিতে যেন একটু বেশী সুবিধা হয়। যাহা হউক এখানি বাঙ্গালা স্কুলের ৪র্থ বা ৫ম শ্রেণীর পাঠ্যরূপে ব্যবহার করিলে মন্দ হইবে না।

দারোগার-দপ্তর ১৩নং।—কুলসম; প্রসিদ্ধ ডিটেক্‌টিভ কর্ম্মচারী শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়কর্ত্তৃক লিখিত। ইনি আমাদের সাহিত্য-কল্পদ্রুমের লেখক, সুতরাং ইহাঁর লিখিত বিষয় যে কিরূপ মনোরম ও তৃপ্তিকর তাহা আমাদের পাঠকেরা জানেন। প্রিয়নাথ বাবু স্বীয় কার্য্যের ফলগুলি গল্পাকারে প্রচার করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যে একশ্রেণীর নূতন জিনিষ ভরিয়া দিতেছেন। সিকদার-বাগান বান্ধব পাঠাগার হইতে শ্রীবাণীনাথ নন্দীকর্ত্তৃক প্রতিমাসে এক একটি গল্প প্রকাশিত হইতেছে। ১২টি গল্পের অগ্রিম মূল্য ১৷৷০ মাত্র। আমরা বর্ত্তমান "কুলসম" নামক গল্পটি পাঠ করিয়া পরম প্রীত হইয়াছি। ঘটনাটি পড়িতে পড়িতে হর্ষ, বিস্ময়, দুঃখ, আগ্রহ যুগপৎ উপস্থিত হয়।

বাগবাজারস্থ অল্পবয়স্ক বালকগণের পাঠ-সমাজের দ্বিতীয় বার্ষিক বিবরণী।—অল্পবয়স্ক বালকগণ এই সমাজটির যেরূপ উন্নতি করিয়াছে, তাহা দেখিয়া আমরা পরম পরিতোষ লাভ করিলাম। ইহাতে সংবাদপত্রাদি সবই ক্রয় করিতে হয় দেখিয়া আমরা দুঃখিত হইতেছি। সাধারণে ইহাকে সাহায্য করা উচিত। বালকগণ এরূপ কার্য্যে উন্নতি লাভ করুক ইহাই ইচ্ছা।

তৃতীয় বর্ষ সমাপ্ত।

মিলন।

সাহিত্য কল্পদ্রুম হিন্দুহিতৈষীর সহিত মিলিত হইল, দুই খানিই মাসিকপত্র, দুইখানিরই উদ্দেশ্য এক, সনাতন হিন্দুধর্ম্ম প্রচার উভয়ের ব্রত, সত্ত্বাধিকারী এক, কার্য্যালয় এক সম্পাদক এক, তবে ভিন্ন দেহে বিরাজিত না হইয়া এক দেহে এক যোগে দ্বিগুণ উৎসাহে প্রবল রূপে প্রচারিত না হইবে কেন?

এ মিলনে আমরা বিশেষ সুখী হইয়াছি, আমাদের গুণানুরাগী গ্রাহকগণ অবশ্য সুখী হইবেন আশা আছে।

হিন্দুহিতৈষী ও সাহিত্য-কল্পদ্রুম এই বৈশাখের সংখ্যায় দুই নাম একত্রে যাইবে।

নূতন, পুরাতন সকল গ্রাহকগণের জন্য স্বর্ণ-সুযোগ।

পুরাতন সাহিত্য-কল্পদ্রুমের গ্রাহকগণ এক বৎসরের মূল্য
কেবল ১৲ টাকা মাত্র দিলেই।

১। ইংরাজী বাঙ্গালা অভিধান। English and Bengali Dictionary সচিত্র ১১১২ পৃষ্ঠায় পটেক ডিক্সনারী।
২। কৃষিতত্ত্ব। কৃষি বিষয়ক সরল পুস্তক।
৩। ব্যবহার দর্পণ। আইন আদালত ঘটিত জ্ঞাতব্য পুস্তক।
৪। পাচক। আমিষ নিরামিস, মিষ্টান্ন পাকের এক মাত্র সরল পুস্তক।

এই চারখানি পুস্তক উপহার পাইবেন এবং প্রতিমাসের সংক্রান্তির দিন

হিন্দুহিতৈষী ও সাহিত্য-কল্পদ্রুম।

নিয়মিতরূপে প্রাপ্ত হইবেন।

এখন মূল্য চাহি না—

কেবল পত্র পাঠান, উপহারগুলি অগ্রে পাঠাইয়া পরে মূল্য লইব। উপহার ভ্যালুপেবল ডাকে যাইলেও তাহার মাশুল কি কমিসন কোন খরচই লওয়া হইবে না।

শেষ নিবেদন।

এই পত্রিকা প্রাপ্ত মাত্রেই পুরাতন গ্রাহকগণ স্ব স্ব অভিপ্রায় লিখিবেন, আশা আছে কেহই আমাদের হতাশ করিবেন না।

বিনীত।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,
২ নং হরিমোহন বসুর লেন নূতন কলিকাতা প্রেস ডিপজিটারী।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

১২৯৯ সালের সাহিত্য-কল্পদ্রুম ৫০ সেট আছে।

ইহার সহিত শাস্ত্রশতক উপহার দিতে প্রস্তুত আছি।
১২ মাসের পত্রিকা ও শাস্ত্রশতক ২৲ দুই টাকা মূল্য পড়িবে, যিনি চান পত্র লিখিবেন।